

কুরআন থেকে গল্প শুনি

এভরিডে মুসলিমাহ লার্নিং

প্রকাশকের কথা

"কুরআন থেকে গল্প শুনি" সিরিজ লেখা শুরু হয় এখন থেকে প্রায় ৩ বছর আগের এক রামাদানের দুপুরে। লেখার কোন পরিকল্পনা ছিল না। হঠাৎ একটা আলোচনা সামনে এসেছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু দেখে শোনা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম পীর মাজার বিষয়ক বিষয় চলে এসেছে। আলোচনার শুরু হয়েছিল কুরআন কে কেন্দ্র করে, শেষ পর্যন্ত পীর মাজার তাবিজ ইত্যাদি এর ওসিলা দিয়ে প্রার্থনা করার বিষয়কে প্রচার প্রসারের চেষ্টা করার মাধ্যমে শেষ হলো। তখন মনে হলো এ বিষয় গুলো নিয়ে সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ আছে।

সরাসরি কুরআন থেকে, কুরআন তাফসীর থেকে রেফারেন্স নিয়ে যদি কোন সিরিজ লেখা যায় তাহলে মানুষ সত্য জানতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তারপর থেকে লেখা শুরু করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। রামাদানের সময় লেখা শুরু এবং রামাদানেই লেখা শেষ করার তৌফিক আল্লাহ পাক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। পরে অনেকসময় ধরে বাকী অনেক কাজ করা হয়েছে কিন্তু মূল কাজ রামাদান মাসেই হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। এই সিরিজটি এমন সব মানুষের জন্য উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ যাদের কখনো কোন তাফসীর পড়া হয় নি। বড় তাফসীর শুরুতেই পড়া কষ্টকর। সেক্ষেত্রে ছোট কোন কুরআন বিষয়ক বই গল্প আকারে পড়তে পড়তে অভ্যাস হয়ে গেলে তাফসীর পড়া শুরু করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। সিরিজটি শরয়ী সম্পাদনা করা হয়নি।

বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাফসীর তাওযীহুল কুরআন, তাফসীর আবু বকর যাকারিয়া, তাফসীর আহসানুল বায়ান , তাফসীল ফাতহুল মাজিদ থেকে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরাসরি কুরআন তাফসীর থেকে বিষয় গুলো একত্রিত করা আলহামদুলিল্লাহ।

🔶কুরআন থেকে গল্প শুনিঃ https://t.me/Quran_Theke_Golpo_Shuni

(নারীপুরুষ সবার সাথে শেয়ার করা যাবে "কুরআন থেকে গল্প শুনি" চ্যানেল এর লিংক)

এখানে যদি কোন কিছু ভাল থেকে থাকে সেটা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে। যদি কোন ভুল থাকে সেটা একান্তই আমার দায়, আমার নফস এবং শয়তানের

কুমন্ত্রণা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের তরফ থেকে কুরআনের ঘটনাবলী সহজভাবে তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। আমাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ রাখুন। আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দিন। আমাদের জন্য সাদাকা জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিন। আমরা যখন দুনিয়ায় থাকব না, তখন এই বইটি আমাদের জন্য যেন নূর হয়ে কবরে আলো দেয়ার মাধ্যম হিসেবে দুনিয়ায় থেকে যায়। বারাকাল্লাহু ফিকুম। জাযাকুমুল্লাহু খাইরন ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া আরহামার রাহিমীন। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

🔸 রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম
আরবি:
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

EVERYDAY MUSLIMAH
LEARNING
LET'S LEARN TOGETHER

তারিখ: ১১ সফর, ১৪৪৭ হিজরি

সূচীপত্র

কেন কুরআন পড়ব?

কুরআন তিলাওয়াত : যার প্রতি হরফে রয়েছে দশ নেকী

কুরআন কারীমের তিলাওয়াতে রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা। জাগতিক, পারলৌকিক, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক। পৃথিবীর বুকে কুরআন কারীম একমাত্র কিতাব, যার তিলাওয়াতে রয়েছে হরফে হরফে নেকী।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশ নেকী সমতুল্য। নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। **(জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০)**

অতএব আলিফ লাম মীম তিলাওয়াত করলে কমপক্ষে ত্রিশ নেকী লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ। লক্ষ করার বিষয় হল, নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলিম লাম মীম উল্লেখ করেছেন। আর এটি এমন এক শব্দ, যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কুরআন মাজীদের অর্থ না বুঝে পড়লেও রয়েছে অনেক সওয়াব, অনেক ফায়দা। আর যদি কেউ বুঝে বুঝে উপলব্ধির সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে তাহলে আল্লাহ তাকে আরো কত দেবেন, তা তো আল্লাহ পাকই ভালো জানেন!

- উত্তমভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ থাকবেন সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে: মুমিন হিসাবে সকলের কর্তব্য হচ্ছে সহীহ শুদ্ধভাবে উত্তমরূপে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা। আর এর রয়েছে অনেক বড় ফযীলতও। আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। **(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮)**

- নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসটি একদিকে যেভাবে তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী তেমনি কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয়, মুখে আটকে আটকে যায়, তাদের জন্যও এ বাণী আশা সঞ্চারক এবং উৎসাহব্যঞ্জক। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দ্বিগুণ সওয়াব। তিলাওয়াতের সওয়াব এবং তিলাওয়াতের জন্য যে কষ্ট হয় সেই কষ্টের সওয়াব। তাই যারা এখনো সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শিখিনি, সাবলীল তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি, তাদের হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং দ্বিগুণ সওয়াব প্রাপ্তির আশায় মেহনত ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন তিলাওয়াত

সাবলীল হয়ে যাবে তখন তো কথাই নেই- আল্লাহর নেককার ফিরিশতাদের সঙ্গী হবে, ইনশাআল্লাহ।

🔸 তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে: যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন কারীমকে নিজের সঙ্গী বানাবে কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে ভুলবে না। কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে কুরআন তাকে সঙ্গ দেবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার 'ছাহিবের' জন্য সুপারিশ করবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪)

🔸 কুরআনের ছাহিব কে? মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, 'ছাহিবে কুরআন' বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি কুরআন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকেন। কুরআনের হেদায়েত ও বার্তাগুলো গ্রহণ করেন। কুরআনের বিধানগুলো আমলে নেন। কুরআনের হিফয করেন। মোটকথা কুরআনই থাকে তার জীবনের আরাধনা। (দ্রষ্টব্য : কূতুল মুগতাযী আলা জামিইত তিরমিযী ২/৭৩২)

অতএব আমাদের 'কুরআনের ছাহিব' বা কুরআনওয়ালা হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আর কুরআনের ছাহিব হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হচ্ছে ইহতিমামের সাথে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ আমাদের এমন তিলাওয়াতের তাওফীক দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা 'ছাহিবে কুরআন'-এর মাঝে পরিগণিত হব- আমীন।

কিয়ামতের দিন ছাহিবে কুরআনকে দেওয়া হবে বিশেষ মর্যাদা: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনে যেভাবে ছাহিবে কুরআন বান্দাদের সম্মানিত করে থাকেন তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- (কেয়ামতের দিন) ছাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি তিলাওয়াত করতে থাক এবং (উপরের দিকে) চড়তে থাক। তুমি উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে থাক যেভাবে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে। কেননা তুমি যতটুকু পর্যন্ত পড়বে সেখানে হবে তোমার ঠিকানা। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৭৯৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৪)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন (ছাহিবে কুরআনের সুপারিশের জন্য) কুরআন আগমন করবে। সে বলবে, ইয়া রব! আপনি তার পোশাকের ব্যবস্থা করুন। তখন তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। এরপর কুরআন আবার বলবে, ইয়া রব! তাকে আরো সম্মানিত করুন। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। এরপর কুরআন বলবে, ইয়া রব! আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তখন সেই ছাহিবে কুরআনকে বলা

হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাক আর (জান্নাতের সমুন্নত প্রাসাদে) চড়তে থাক। প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে কল্যাণ দেওয়া হবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৫)

◑ এক প্রতিনিধি দল এল মদীনায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে। নবীজি তাদেরকে এশার পর সময় দিতেন। দীর্ঘ সময় তাদের সাথে কথা বলতেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নবীজি একদিন এশার পর তাদের কাছে আসতে একটু সময় নিলেন। আসার পর জানতে চাওয়া হলো,

-আজ অন্যদিনের তুলনায় একটু পরে বের হয়েছেন যে?

-আমি আজকের 'কুরআনের হিযব' পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা আদায় না করে বাইরে আসতে মন চাইল না। প্রতিদিন পড়ার বা তিলাওয়াতের জন্য যা নির্ধারণ করা হয় সেটাকে 'হিযব' বলা হয়। এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, নবীজিরও নির্দিষ্ট 'হিযব' ছিল। এবং তিনি তা নিয়মিত আদায় করতেন।

◑ এক বুযুর্গের নসীহত, -তুমি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবে। বেশি বেশি তিলাওয়াত করবে। তিলাওয়াত ছাড়বে না। তুমি যত বেশি তিলাওয়াত করবে, তত বেশি বরকত লাভ করবে।

◑ নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ যত বৃদ্ধি করি, তত বেশি বরকত লাভ করি। তিলাওয়াতের পরিমাণ বাড়ালেও সময়ের টান পড়ে না। সময়েরও বরকত বাড়ে। পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এখন প্রতিদিন দশ পারা করে পড়ি (জনৈক নেককার)।

◑ প্রতিদিনের 'হিযব' আমার জন্য নেয়ামতস্বরূপ। বোঝা নয়। বহু মানুষ এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। কারণ তারা এটাকে বোঝা মনে করে। চাপ মনে করে। সময়ের অপচয় মনে করে। অপর দিকে অনেক সৌভাগ্যবান মানুষ নিয়মিত হিযব আদায় করে, সুখের সন্ধান পেয়ে যায়। আল্লাহর দরবারে মাকবুল হয়ে যায়।

◑ একজন শায়খ প্রতিদিন ৭ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

◑ একজনকে চিনি, প্রতিদিন ৩ পারা করে পড়বেই। মাসে ৩ টা খতম তার নিয়মিত। সে বলে, -খুব বেশি সময় লাগে না। সোয়া এক ঘন্টা মাত্র। কত স্বল্প শ্রমে কী বিরাট গনীমত! কল্পনা করা যায়?

◑ কাজের চাপ বেশি এজন্য কুরআন তিলাওয়াত করা যাচ্ছে না! মনে রাখতে হবে, এটা একটা ঠুনকো অজুহাত।

◑ এবার আমাদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখি দৈনিক কত পারা কুরআন তিলাওয়াত করি? জানি অনেকেই বলবেন কাজের চাপে পড়তে পারি না। কাজের চাপ বেশি এজন্য কুরআন তিলাওয়াত করা যাচ্ছে না! মনে রাখতে হবে, এটা একটা ঠুনকো অজুহাত।

প্রতিদিন কুরআন পড়তে পারা বিরাট নিয়ামত এবং সৌভাগ্যের বিষয়।

(১) কুরআনওয়ালারা আল্লাহর বিশেষ লোক!

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষের মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশেষ লোক রয়েছে।" তাঁকে বলা হলো, 'আল্লাহর সেই বিশেষ লোকগুলো কারা?' উত্তরে তিনি বলেন, কুরআনওয়ালারাই (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও সে অনুযায়ী আমলকারী) হলো আল্লাহর বিশেষ লোক।" [ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ: ১২২৭৯; শায়খ আলবানি, সহিহুল জামে': ২১৬৫; হাদিসটি সহিহ]

(২) কুরআনের ছাত্র-শিক্ষক হওয়া:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।" [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ৫০২৭]

(৩) কুরআন সুপারিশকারী হবে।

আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথীর (তিলাওয়াতকারীর) জন্য সুপারিশ করবে।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১৭৫৯]

(৪) কুরআন মুমিনদের অন্তর দৃঢ় করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "বলুন, এটিকে (কুরআনকে) পবিত্র আত্মা (জিবরিল) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি মুমিনদেরকে দৃঢ়-অবিচল রাখেন আর এটি মুসলমানদের জন্য হিদায়াত (সঠিক পথ-নির্দেশ) ও সুসংবাদ।" [সুরা নাহল, আয়াত: ১০২]

(৫) কুরআন শিফা (আরোগ্য) এবং রহমত।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বলেন, "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা মুমিনদের জন্য শিফা (আরোগ্য) এবং রহমত, কিন্তু এটি কেবল জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" [সুরা ইসরা, আয়াত: ৮২]

(৬) কুরআনি মজলিসের মহান মর্যাদা:

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, (আল্লাহর) রহমত তাদের ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন।" [ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান: ১৪৫৫; হাদিসটি সহিহ]

(৭) প্রতিটি হরফ পাঠ করলেই ১০ নেকি!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য রয়েছে একটি নেকি। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মিম' একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মিম একটি হরফ।" [ইমাম তিরমিযি, আস-সুনান: ২৯১০; হাদিসটি সহিহ]

(৮) কুরআন পড়তে কষ্ট হলে ডাবল নেকি!

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল কুরআনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। যে ব্যক্তি তিলাওয়াত করতে গিয়ে আটকে যায় এবং এটি (তিলাওয়াত করা) তার উপর কষ্টকর হয়ে পড়ে, তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে (প্রথমটি তিলাওয়াতের, দ্বিতীয়টি কষ্টের)।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১৭৪৭]

(৯) কুরআন পাঠককে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

নবিজি বলেন, "(কুরআন) সত্যায়নকারী প্রতিবাদী। যে ব্যক্তি তাকে সামনে রাখবে, সেই ব্যক্তিকে সে পথ দেখিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" [ইমাম ইবনু হিব্বান, আস-সহিহ: ১২৪; আলবানি, সহিহুত তারগিব: ১৪২৩; হাদিসটি সহিহ]

(১০) কুরআনওয়ালাকে ঈর্ষা করা যায়:

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে ঈর্ষা করা যায় না। (এক সেই ব্যক্তি) যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিনে ও রাতে তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশী বলে, 'হায়! আমাকে যদি এমন (কুরআনি

ইলম) দেওয়া হতো, যেভাবে অমুককে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মত আমল করতাম!' (আরেক ব্যক্তি হলো সে) যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে সম্পদ সত্যপথে খরচ করে। তাই, (প্রতিবেশী) ব্যক্তি বলে, 'হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো (সম্পদ) দেওয়া হতো, তাহলে সে যা করছে, আমিও তাই করতাম'।" [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ৫০২৬]

(১১) কুরআন পড়া বিরাট লাভের কাজ:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কেউ কি চাও যে, যখন বাড়ি ফিরবে, তখন বাড়িতে গিয়ে ৩ টি বড় বড় মোটাতাজা গর্ভবতী উটনী দেখতে পাবে?" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তোমরা কেউ নামাজে ৩ টি আয়াত পড়লে, তা তার জন্য ৩ টি মোটাতাজা গর্ভবতী উটনীর চেয়ে উত্তম।" [ইমাম মুসলিম, আস-সহিহ: ১৭৫৭]

🔹 কুরআন তিলাওয়াত আমাদের সময়কে সংকুচিত করবে না, বরং সময়কে বরকতময় করে তুলবে। কুরআন কারীম যে বরকতময় কিতাব! এই কিতাব পড়লে কিভাবে জীবন বরকতহীন হয়? সময়ে টান পড়ে? কুরআন আমার ইলমে বরকত নিয়ে আসবে। রুহে বরকত সৃষ্টি করবে। সময়কে বরকতময় করে তুলবে।

কুরআন আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটা চিঠি।যে চিঠিতে আছে দুনিয়া আখিরাতের সব বিষয়ের সমাধান। আমরা কি সমগ্র বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে সেই চিঠি টা একবারও সম্পূর্ন পড়েছি? অন্তত বাংলা অনুবাদ পড়েছি? পড়ার চেষ্টা করেছি? বুঝার চেষ্টা করেছি? কুরআন বিষয়ক বই পড়ার চেষ্টা করেছি? আমাদের তরফ থেকে এজন্য চেষ্টা কতটুকু নিজেদের প্রশ্ন করি।

কোরআন-হাদিসে হাফেজের মর্যাদা

হাফেজরা আল্লাহর পরিজন: পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। আর বেশি পরিমাণে কোরআন তিলাওয়াতকারীদের আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পরিজন বলে সম্বোধন করেছেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোরআন তিলাওয়াতকারীরা আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।'(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২১৫)

কোরআনের জ্ঞান ঈর্ষণীয় সম্পদ: কোরআনের জ্ঞান ও তার তিলাওয়াতের তাওফিক আল্লাহর অনন্য নিয়ামত। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে, যা কখনো ধ্বংস হবে না।' (সুরা ফাতির, আয়াত : ২৯)

কোরআন এমন নিয়ামত, যে নিয়ামতের ব্যাপারে ঈর্ষা করা জায়েজ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদের যদি এমন জ্ঞান দেওয়া হতো, যেমন অমুককে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে, হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদ দেওয়া হতো, তাহলে সে যেমন ব্যয় করছে, আমিও তেমন ব্যয় করতাম।' (বুখারি, হাদিস : ৫০২৬)

কোরআন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে: দুনিয়ায় যারা কোরআন চর্চা করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের জন্য পরকালে মহাপুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই এই কোরআন এমন একটি পথ দেখায়, যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনরা নেক আমল করে তাদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৯)

কোরআনচর্চাকারীকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হবে: যারা দুনিয়াতে কোরআন শিখবে সে মতে আমল করবে, কোরআন হিফজ করবে; কিয়ামতের দিন তাদের বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোরআন কিয়ামত দিবসে হাজির হয়ে বলবে, হে আমার প্রভু, একে (কোরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু, তাকে আরো পোশাক দিন। সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু, তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার ওপর

সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি একেক আয়াত পাঠ করতে থাকো এবং ওপরের দিকে উঠতে থাকো। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব (মর্যাদা) বাড়ানো হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৯১৫)

কোরআন পাঠকারীর মা-বাবাকে বিশেষ সম্মাননা: সাহল ইবনু মুআজ আল-জুহানি (রহ.) থেকে তার পিতা থেকে বর্ণিত, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার মা-বাবাকে এমন মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল হবে। ধরে নাও, যদি সূর্য তোমাদের ঘরে বিদ্যমান থাকে (তাহলে তার আলো কিরূপ হবে?)। তাহলে যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী আমল করে তার ব্যাপারটি কেমন হবে, তোমরা ধারণা করো তো!' (আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৫৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের কুরআনে হাফেজ হিসেবে কবুল করুন, কুরআন অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আল্লাহ পাক আমাদের কুরআনওয়ালা বানিয়ে দিন, জীবন্ত কুরআন বানিয়ে দিন। আমিন। ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম। ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। ইয়া আরহামার রাহীমিন। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা)

কুরআন অন্তরের নূর

কুরআন মানুষকে আলোকিত করে। অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। মহান আল্লাহ এই মহাগ্রন্থটিকে জ্যোতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে, '...আল্লাহর কাছ থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসে গেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এটা দিয়ে তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর তাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ১৫-১৬)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আলোকিত মানুষ তৈরি করা। এ কথা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে, 'তিনিই (আল্লাহ) তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।' (সুরা : হাদিদ, আয়াত : ৯)

কুরআন শিক্ষা আমাদের জন্য ফরজ। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং এটাকে অবশ্য পালনীয় করেছি। আর আমি এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা নূরঃ আয়াত ১)

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে আমাদের জন্য কুরআন পড়া এবং সে অনুযায়ী মেনে চলা ফরজ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে জানতে চাইবেন কুরআন না পড়া, এবং সে অনুযায়ী মেনে না চলার কারন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত এর সময় এক শ্রেনীর মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন।

আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। (সূরা ফুরকানঃআয়াত ৩০)

তিনি আল্লাহর কাছে বলবেন, এই ব্যক্তিরা কুরআন পড়ে নি। কুরআনের প্রতি তারা যত্নবান ছিল না। এদের বিরুদ্ধেই তিনি অভিযোগ করবেন।

আল্লাহ তায়ালা এই অভিযোগ পাওয়ার পর সেসব ব্যক্তিদের জীবনের কোন আমলই গ্রহন করবেন না। আল্লাহ তায়ালা সেসব ব্যক্তির কোন আমল মিযানের দাঁড়িপাল্লাতে পরিমাপ করার কোন ব্যবস্থাও রাখবেন না।

'তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না'। (সূরা কাহফঃ আয়াত ১০৫)

তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি। এ শ্রেনীর মানুষ বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এ শ্রেনীর মানুষকে মারা যাওয়ার সময় ফেরেশতারা তাদের আত্মা টেনে হিঁচড়ে দেহ থেকে বের করে আনবে।

‘এ জন্যই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে’। (সূরা কাহফঃ আয়াত ১০৬)

যারা কুরআন পড়বে, সে অনুযায়ী জীবন যাপন করবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা সম্মানের সাথে তাদের আত্মাকে দেহ থেকে বের করে আনবে।

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। (সূরা ফাজরঃ আয়াত ২৭-২৮)

তাদের জন্য রয়েছে সুসজ্জিত জান্নাত। কবরে কেউ আল কুরআনকে সাথী হিসেবে পাবে। কুরআন মানুষের পক্ষে বা বিপক্ষে দলিল হবে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে;

"কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সনদ বা সাক্ষ্যস্বরূপ। ভোরে উপনীত হয়ে প্রতিটি মানুষ নিজেকে বিক্রয় করে। (এর মাধ্যমে) সে নিজেকে হয় আজাদ করে অথবা ধ্বংস করে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫১৭)

যারা রবকে ভয় করে চলে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।

আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর’। (সূরা যুমারঃ আয়াত ৭৩)

কুরআনের মত এত জোরালো সুপারিশ আল্লাহর সামনে আর কেউ করতে পারবে না। কুরআন যার জন্য সুপারিশ করবে কুরআন তাকে জান্নাতে পৌছানো না পর্যন্ত একা ছেড়ে যাবে না। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে পিছনে ফেলে রাখবে কুরআন তাকে পিছন থেকে ধাওয়া করে নিশ্চিত জাহান্নামে না ফেলা পর্যন্ত তার পিছু ছেড়ে যাবে না।

জাহান্নামের কিনারায় যাওয়ার পরে কুরআনহীন মানুষগুলোকে ফেরেশতাগন বলবে তোমাদের কাছে কি কোন নবী প্রেরন করা হয় নি? উত্তরে তারা বলবে, আমাদের নিকট নবী প্রেরন করা হয়েছিল কিন্তু আমরা গ্রহন করে নেই নি। তখন ফেরেশতাগন বলবেন, তোমাদের তো বলাই হয়েছিল এই পরিনতি সম্পর্কে।

আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সূরা বাকারাঃ আয়াত ৩৯)

তাদেরকে কিভাবে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে আল্লাহ তায়ালা সে কথাও বলেছেন। তাদের গলা থেকে পা পর্যন্ত প্যারালাইজড করে দেয়া হবে। মুখে উপর ভর দিয়ে দিয়ে তারা জাহান্নাম পর্যন্ত যেতে বাধ্য হবে।

কি এক কঠিন অবস্থা?

তখন তারা বারবার বলতে থাকবে, আর একবারের জন্য আমাদের দুনিয়াতে প্রেরন করুন। আমরা অনেক কিছু পড়েছি, অনেক করেছি কিন্তু কুরআন নিয়ে পড়ি নি। জানার চেষ্টা ও করি নি। আমাদের আরেকবার সুযোগ দেয়া হোক। আমরা দুনিয়াতে যদি কুরআন শিখতাম, সে অনুযায়ী মেনে চলতাম তাহলে আজকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনের বাসিন্দা হতাম না।

অপরদিকে যারা কুরআন শিখেছে তাদের জন্য রয়েছে অবারিত সুযোগ। কুরআন তো আল্লাহর কালাম, কালামুল্লাহ। পৃথিবীতে এমন কোন বই নেই যার একটি হরফ তিলাওয়াত করলে দশটি করে নেকি পাওয়া যায়। আল্লাহু আকবর!

আপনি যদি একজন মুসলিম হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে কুরআন পড়তে হবে, জানতে হবে,শিখতে হবে। কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য এই কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে সূরা আল কামার এর ১৭,২২,৩২,৪০ নাম্বার আয়াতে বর্ননা রয়েছে। একই সূরায় আল্লাহ তায়ালা চারবার বলেছেন যে কুরআনকে তিনি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন যেন আমরা কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহন করে নিতে পারি। সুবহানাল্লাহ!

আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (সূরা আল কামারঃ আয়াত ১৭)

কিন্তু আমাদের জন্য কুরআন সহজ হচ্ছে না কেন? কারন, আমাদের চেষ্টায় ঘাটতি আছে। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের মেধা সম্পর্কে অবগত। তিনি আমাদের উপর কখনোই এমন কিছুর ভার চাপিয়ে দিবেন না যা আমরা বহন করতে পারব না।

আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (সূরা বাকারাঃ আয়াত ২৮৬)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দার উপর এমন বোঝা কখনোই চাপিয়ে দিবেন না যার ভার তারা বহন করতে পারবে না। ততটুকুই দিবেন যতটুকু আমরা বহন করতে পারব।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে আমাদের জন্য কঠিন করে দিবেন আর পরকালে এই কুরআনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সেটা তো হতে পারে না।

এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দেয়া যায়। মানুষের জীবন ধারনের জন্য খাবার দরকার, কিন্তু সেটা পানির তুলনায় কম দরকার। এজন্য খাবার তিনবেলা বা প্রয়োজন অনুযায়ী দুএকবার খেলে হবে। খাবার তৈরি করতে অনেক প্রসেসিং এর দরকার। সময়সাপেক্ষ বিষয় ও বটে। এজন্য তার প্রয়োজনীয়তা পানির তুলনায় কম। পিপাসার্ত হলে পানি যেকোন সময় কোন প্রসেসিং এর ঝামেলা ছাড়া পান করা যায়।

অক্সিজেন হল পানির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা এটাকে তো আরো সহজ করে দিয়েছেন। অক্সিজেন চোখে দেখাও যায় না, স্পর্শ ও করা যায় না। আমরা সহজেই অক্সিজেন গ্রহন করি, কার্বন ডাই অক্সাইড আকারে বের করে দেই।

সুতরাং, আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারলাম যে আমাদের জন্য যেটা বেশি প্রয়োজন সেটাকে আল্লাহ তায়ালা বেশি সহজ করে দিয়েছেন।

একজন মানুষ অক্সিজেন ছাড়া কয়েক সেকেন্ড বাঁচতে পারে। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান ছাড়া কোন মানুষ ইমানের উপরে এক সেকেন্ড ও বেঁচে থাকতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বাতাস সৃষ্টি করে বলেন নি যে আমি বাতাস গ্রহনকে তোমাদের জন্য সহজ করেছি। পানি সৃষ্টি করে বলেন নি যে আমি তোমাদের জন্য পানি পান করাকে সহজ করেছি।

কিন্তু কুরআন দিয়ে তিনি আমাদের বলেছেন যে তিনি কুরআনকে আমাদের জন্য সহজ করেছেন যেন আমরা কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহন করতে পারি। এবং আল্লাহ তায়ালা এ

ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদও করবেন। তাহলে তো বাতাস গ্রহন করা যতটা সহজ কুরআনকে গ্রহন করে নেয়া তার চেয়েও বেশি সহজ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন। সুবহানাল্লাহ!

সূরা আর রহমান এর ১-৪ নং আয়াতে এ বিষয়ে বর্ননা রয়েছে।

পরম করুণাময়,

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন,

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ,

তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।

কুরআনের শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আল্লাহ তায়ালা যে আমাদের শিখিয়েছেন সে বিষয়ে কুরআনে বর্ননা রয়েছে।

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আলাকঃ আয়াত ৪)

ফেরেশতা রয়েছেন অগনিত। কুরআনকে বহন করার জন্য যে ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তিনি হলেন ফেরেশতাদের সর্দার; জিব্রাইল (আঃ)। যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে তিনি হলেন সমগ্র মানবজাতির সেরা মানব মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ!

সেরাদের হাত ধরে কুরআন এসেছে। এই বিষয় থেকে আমরা একটা স্পষ্ট ধারনা পাই যে কুরআন শিখতে হবে সেরাদের কাছ থেকে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান/সবচেয়ে যোগ্য যিনি তিনি কুরআন শিখাবেন; সে দায়িত্ব অযোগ্য বা কম জ্ঞান সম্পন্ন কারো উপর অর্পন করলে হবে না। সর্বোত্তম ব্যক্তিকে কুরআনের শিক্ষক হতে হবে।

কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম?

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। ’ (বুখারি, হাদিস নং : ৫০২৭)

শুধু কুরআন শিখে বসে থাকলেই হবে না। সর্বোত্তম হতে হলে কুরআন শিখে অপরকে শিখাতে হবে। যে শিখবে, পরবর্তীতে সেই শিখাবে। এভাবেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা সেটা করি নি, এজন্যই আমরা কুরআন থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। কুরআনের জন্য আমরা পর্যাপ্ত সময় দিতে চাই না। তারপর চিন্তা করি কেন আমরা কুরআন শিখতে পারছি না। এই না শিখতে পারা আমাদের নিজেদের অবহেলা ছাড়া অন্য কিছুই না।

আমরা যদি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানতে চাই,তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাই প্রথমেই আমাদের জানতে হবে। জানার উপায় কি?

পড়া।

কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত হল পড়া নিয়ে। পড় তোমার প্রভুর নামে।

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।
তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে।
পড়, আর তোমার রব মহামহিম।
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাকঃ আয়াত ১- ৫)

সত্যি জানার জন্য পড়ার কোন বিকল্প নেই। পড়তেই হবে। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা জ্ঞান, প্রজ্ঞা দান করেন। আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শিখতে চাই, কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন।

আল্লাহ আমাদের ইলমে, আমলে এবং ঈমানে বারাকাহ দিন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে প্রশান্ত আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে ফেরত যাওয়ার তৌফিক দিন। আল্লাহুম্মা আমীন। (শায়েখ জামাল উদ্দীন এর লেকচার অবলম্বনে লেখা হয়েছে)

পর্ব ১ঃ তাবুতে সাকিনা

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ২৪৮

আর তাদেরকে তাদের নবী বলল, নিশ্চয় তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত* আসবে, যাতে থাকবে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রশান্তি এবং মূসার পরিবার ও হারুনের পরিবার যা রেখে গিয়েছে তার অবশিষ্ট, যা বহন করে আনবে ফেরেশতাগণ। নিশ্চয় তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিদর্শন, যদি তোমরা মুমিন হও।

*তাবুত অর্থ সিন্দুক। এতে বনী ইসরাঈলের কিছু নিদর্শন ছিল। তাই তারা এটিকে পবিত্র মনে করত এবং যুদ্ধের সময় সামনে রাখত।

🔶তাবুতে সাকিনার বিস্তারিত তথ্যঃ

বানী ইসরাঈলের নিকট একটি সিন্দুক ছিল। যার মধ্যে তাদের নবী মূসা ও হারুন (আঃ) এবং তাদের পরিবারের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিল। তারা এটাকে খুবই বরকতময় মনে করত এবং যুদ্ধকালে একে সম্মুখে রাখত।

একবার আমালেকাদের সাথে যুদ্ধের সময় বানী ইসরাঈল পরাজিত হলে আমালেকাদের বাদশা জালূত উক্ত সিন্দুকটি নিয়ে যায়। এক্ষণে যখন বানী ইসরাঈলগণ পুনরায় জিহাদের সংকল্প করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উক্ত সিন্দুক ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। অতঃপর এ সিন্দুকটির মাধ্যমে তাদের মধ্যকার নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়ার নিসরন করেন।

সিন্দুকটি তালূতের বাড়িতে আগমনের ঘটনা এই যে, জালূতের নির্দেশে কাফিররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ শুরু হয়ে যায়। এমনিভাবে তাদের পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে তারা একে তার প্রকৃত মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং গরুর গাড়িতে উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে গরুর গাড়িটি তাড়িয়ে এনে তালূতের ঘরের সম্মুখে রেখে দিল। বানী ইসরাঈল এ দৃশ্য দেখে সবাই একবাক্যে তালূতের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল। অতঃপর তালূত আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি নেন। সকল প্রস্তুতি শেষ হলে কথিত মতে ৮০,০০০ হাজার সেনা নিয়ে রওনা হন।

অল্প বয়স্ক তরুণ দাউদ (আঃ) ছিলেন উক্ত সেনা দলের সদস্য। পথিমধ্যে সেনাপতি তালূত তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। সম্মুখেই ছিল এক নদী। মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের। পিপাসায় ছিল সবাই কাতর। তাই তিনি বললেন,

‘তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন’ এ নদীটি হল জর্ডান ও প্যালেস্টাইনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। বস্তুত নদী পার হওয়া অল্প সংখ্যক ঈমানদার ব্যতীত সকলেই পানি পান করেছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন, যা বদর যুদ্ধে মুসলিম যুদ্ধাদের সংখ্যা ছিল। যারা পানি পান করেছিল তারা আলস্যে ঘুমিয়ে পড়ে। এ স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তালূত শৌর্য-বীর্যের প্রতীক আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চললেন। বস্তুবাদীদের হিসেবে এটা ছিল নিতান্তই আত্মহননের শামিল, একটি অসম যুদ্ধ।

‘আর যখন তারা জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল। জালূত ছিল শত্রুদলের সেনাপতি। তালূত ও তাঁর সঙ্গীরা জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। এরা ছিল আমালিকা জাতি। তৎকালীন সময়ে তারা বড় দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধবাজ ছিল। তাই এ যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে নিল। আল্লাহ তা'আলার সহযোগিতায় তারা সংখ্যায় অল্প হলেও জয় লাভ করল।

‘দাঊদ (আঃ) জালূতকে হত্যা করলেন’ তখন দাঊদ (আঃ) নাবী ছিলেন না। তালূতের একজন সাধারণ সৈন্য ছিলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা তাকে নবুওয়াত ও রাজত্ব উভয়টি দান করলেন।

- এসব ঘটনা বর্ণনা করার দু'টি উদ্দেশ্য:

(১) শিক্ষা গ্রহণ, (২) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ। কেননা; তিনি এ সব ঘটনা কোন কিতাবে পড়েননি এবং কারো কাছে শোনেননি। বরং অতীতের এসব ঘটনা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে ওয়াহীর মাধ্যমে অবগত করেছেন। সেজন্য শেষে আল্লাহ তা'আলা বললেন: “নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্যতম একজন।”(সূরা ইয়াসীন ৩৬:২)

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শরীয়তসম্মত জিহাদের শর্ত হল শরীয়তসম্মত ইমাম থাকতে হবে।
২. রাসূলদের ব্যবহৃত জিনিস দ্বারা বরকত নেয়া জায়েয। তবে কোন পীর-ফকির বাবা ইত্যাদি ব্যক্তির থেকে নয়। এটা শুধু রাসূলদের সাথে সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ের রেফারেন্স ব্যবহার করে কোন শিরকের কার্যক্রম জায়েজ না।কোন পীর,মাজারে মানত এসব গ্রহনযোগ্য না।

৩. ঈমানদার যুদ্ধে গেলে পিছপা হয় না।
৪. মুনাফিকরা যুদ্ধের জন্য খুব আগ্রহ দেখাবে কিন্তু ফরয হলে বা সরাসরি মোকাবেলার সময় হলে পালাবে।

পর্ব ২ঃ জবেহ করার পর জীবিত হওয়া

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ২৬০

আর যখন ইবরাহীম বলল 'হে, আমার রব, আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি'? সে বলল, 'অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়'। তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও। তারপর সেগুলোকে তোমার প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ে সেগুলোর টুকরো অংশ রেখে আস। তারপর সেগুলোকে ডাক, সেগুলো দৌড়ে আসবে তোমার নিকট। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

🔶আয়াতে বর্ণিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'এরূপ আকাংখা ব্যক্ত করার কারণ কী? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি আপনার আস্থা নেই?'

ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন: আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহুর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুরু করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে; এটা কী করে হবে, না জানি এর প্রক্রিয়াটা কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এ কারণেই ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণঃ সংক্রান্ত চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করানোর জন্য একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে মুশরিকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়।

প্রক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে চারটি পাখি ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হল, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ

মেনে যায় এবং ডাকামাত্রই হাতের কাছে চলে আসে। তদুপরি তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন।

পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জবাই করে এগুলোর হাড়-মাংস, পাখা ইত্যাদির সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করুন, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজের পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক-একটি ভাগ রেখে দিন। তারপর এদেরকে ডাকুন। তখন এগুলো আল্লাহ্‌র কুদরতে জীবিত হয়ে উড়ে আপনার কাছে চলে আসবে। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তা-ই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত, রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তার কাছে উড়ে এসে উপস্থিত হল। [তাফসীরে কুরতুবী ৪/৩১৪]

পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ না করানোর মধ্যে ‘ঈমান বিল-গায়েব’ বা গায়েবের উপর ঈমান স্থাপন করার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে।

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানুষের স্বভাবই হল যা জানে না তা জানার চেষ্টা করা, তবে যা অহেতুক তা বর্জনীয়।
২. আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

পর্ব ৩ঃ মারইয়ামের মেহরাব

🔶সূরা আল ইমরান ৩৭-৩৯

তখন তার প্রতিপালক তাকে সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন পালন করলেন এবং যাকারিয়াকে তার তত্ত্বাবধায়ক করলেন। যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের কক্ষে প্রবেশ করত, তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত; জিজ্ঞেস করত- হে মারইয়াম! 'এসব কোত্থেকে তোমার কাছে আসে'? মারইয়াম বলত, 'ওসব আল্লাহর নিকট হতে (আসে)'। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বেহিসাব রিযক দান করেন।

তখন যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিল, সে বলেছিলঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল তখন মালাইকা/ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন - তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহর একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নাবী হবে।

🔶আয়াতে বর্ণিত কাহিনির সারসংক্ষেপ:

ঈসা (আঃ)-এর নানী গর্ভাবস্থায় মানত করেছিলেন যে, আমার গর্ভে যে সন্তান হবে তাকে উপাসনালয়ের জন্য উৎসর্গ করে দেব। তাঁর আশা ছিল নিশ্চয়ই আমার একটি ছেলে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দিলেন একজন কন্যা। তখন তিনি আফসোস করে বললেন, হে আল্লাহ! চাইলাম কী আর হল কী! কেননা কন্যা সন্তান তো উপাসনালয়ে দেয়া যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: কন্যা সন্তানের মত কোন পুত্রই যে হয় না। আমি এ কন্যা সন্তানের নাম রাখলাম মারইয়াম।

আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করার জন্য তার খালু যাকারিয়া (আঃ)-এর তত্ত্বাবধানে দিলেন। মারইয়াম মিহরাবের নিজ কক্ষে থাকতেন। যাকারিয়া (আঃ) যখনই মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর কক্ষে প্রবেশ করতেন তখন তার কাছে বিভিন্ন অমৌসুমী ফল-ফলাদি দেখতে পেতেন।

মিহরাব বলা হয় ছোট একটি কামরাকে। এ ছোট কক্ষে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) থাকতেন। আর মাঝে মধ্যে তার খালু যাকারিয়া (আঃ) তাকে দেখতে যেতেন।

গ্রীষ্মের ফল শীতকালে আর শীতকালের ফল গ্রীষ্মে। এ ফলমূল দেখে জাকারিয়া (আঃ) আশ্চর্য হয়ে যেতেন; কারণ তিনি নিজে এ ফল এনে দিতেন না এবং অন্য কেউও এনে দিত না।

মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) বললেন: এসব ফলাদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে।

মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) এর এরূপ অমৌসুমী ফলমূল দেখে যাকারিয়া (আঃ) বুঝতে পারলেন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন: "হে আল্লাহ! আমাকে একজন সৎ সন্তান দান করুন।"

যাকারিয়া (আঃ) এ দু'আ করার পর যখন সালাতরত অবস্থায় মিহরাবে ছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে সন্তান ইয়াহইয়া (আঃ)-এর শুভ সংবাদ দিলেন। যাকারিয়া (আঃ) বললেন: হে আল্লাহ! আমি বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। কিভাবে আমাদের সন্তান হবে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম।

আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া (عليه السلام)-এর দু'আ কবুল করে সন্তান দিলেন এমনকি সন্তানের নামও রেখে দিলেন যে, তার নাম হবে ইয়াহইয়া।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়া (عليه السلام) এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন;

(১) শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে (২) তাঁকে নরম প্রকৃতি ও কোমলতা দান করেছেন, (৩) তিনি পূত-পবিত্র ছিলেন, (৪) তিনি অতীব তাক্বওয়াশীল, (৫) পিতা-মাতার প্রতি অনুগত এবং (৬) তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য নন।

এছাড়াও সূরা আল ইমরানে তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, (৭) তিনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, (৮) তিনি হবেন নেতা, (৯) তিনি নারীসঙ্গ মুক্ত হবেন, (১০) তিনি একজন সৎ কর্মশীল নাবী হবেন।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানুষের সকল অভাব পূরণ করে থাকেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।
২. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছেন।
৩. সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করতে হবে।
৪. আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় আস্থা ও সৎ আমল করে আহ্বান করলে তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।
৫. আমরা দুআ করব আল্লাহর উপর ভরসা রেখে। নিজেদের যোগ্যতার বিচারে দুআ করব না। আমার পক্ষে অসম্ভব কোন বিষয় সেটা আল্লাহর কাছে অসম্ভব না। কখনোই না।
৬. আমরা নিজেদের আশা ভরসা কমাবো না। বরং দুআ করা বাড়িয়ে দিব।

পর্ব ৪ঃ মাকামে ইবরাহীম

🔶সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ৯৭

তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে (যেমন) মাক্কামে ইবরাহীম(ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)। যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে নিরাপদ হবে। আল্লাহর জন্য উক্ত ঘরের হাজ্ব করা লোকেদের উপর আবশ্যক যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মাকামে ইবরাহীম। যা একটি বড় নিদর্শন হওয়ার কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মাকামে ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপরে দাঁড়িয়েই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এ পাথরের গায়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান।

একটি পাথরের উপর পদচিহ্ন পড়ে যাওয়া আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল।

যখন কুরআনে মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায় করার আদেশ নাযিল হয় তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে সরিয়ে কা'বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কুপের নিকট স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে মাকামে- ইবরাহীমকে সরিয়ে নিয়ে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। তাওয়াফ-পরবর্তী নামায এর আশে পাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মাকামে ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে হারামকেও বুঝায়। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেনঃ মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ পরবর্তী সালাত পড়ে নিলেই তা আদায় হয়ে যাবে।

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ১২৫

এবং স্মরণ কর যখন আমি কা‘বাগৃহকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র এবং নিরাপদস্থল করলাম এবং বললাম, ‘মাকামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর’ এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বলেছিলাম, ‘আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই‘তিকাফকারী এবং রুকূ ও সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে’।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এ আয়াত থেকে মাকামে ইবরাহীম এর মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি বিষয়ে আমার প্রতিপালক আমার সাথে একমত হয়েছেন। (তার মধ্যে ১টি হল: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি “মাকামে ইবরাহীম”কে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করে নিতেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী: ৪৪৮৩)

এছাড়াও এ আয়াতের কয়েকটি শানে নুযূল পাওয়া যায়। (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবে নুযূল পৃঃ ৩০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একটি নিদর্শনের কথা তুলে ধরলেন যা ইবরাহীম (আঃ)-এর ইমামতের ওপর প্রমাণ বহন করে। তা হল বাইতুল্লাহ যা ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। এ ঘরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের প্রত্যাবর্তন স্থল বানিয়েছেন। মানুষ একবার আগমন করে পরিবারে ফিরে যাবে আবার আসবে। এরূপ বারবার মানুষের মন চাইবে আরো যাওয়ার। আরেকটি নিদর্শন হল এ ঘরকে নিরাপদ স্থান করেছেন। যত বড় অপরাধীই এখানে প্রবেশ করুক না কেন কোন প্রকার ঝগড়া, মারামারি, লুণ্ঠন এখানে করা যাবে না। এমনকি পশু পাখি ও বৃক্ষলতাও নিরাপদে থাকবে। জাহিলি যুগের মুশরিকরাও এ ঘরের সম্মান করত। ইসলাম এসে এ সম্মান আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

‘মাকামে ইবরাহীম দ্বারা কোন্ জায়গাকে বোঝানো হয়েছে এ নিয়ে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ দু’টি বর্ণনা হল:

১. সে পাথর যার ওপর পা রেখে ইবরাহীম (আঃ) কাবা নির্মাণ করেছিলেন। (তাফসীর মুয়াসসার, পৃঃ ১৯)
২. হজ্জের সকল মাশ‘আর (স্থানসমূহ)। (তাফসীর সা‘দী পৃঃ ৪৬) তবে প্রথম মত-ই সঠিক।

এ আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে শিয়া ও বিদ'আতী সম্প্রদায় বলে: ওলীদের কবরে সালাত আদায় করা যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বরকত লাভের জন্য মুসল্লী ও হাজীদেরকে মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ আয়াতকে ওলীদের কবরে সালাত আদায়ের সপক্ষে দলীল গ্রহণ করা প্রবৃত্তির মনগড়া চিন্তার অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ মাকামে ইবরাহীম কোন কবর নয় এবং কবর সংশ্লিষ্ট কোন স্থানও নয়। বরং তা বাইতুল্লাহ সংশ্লিষ্ট স্থান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সে স্থানটি বরকতময়। অপরপক্ষে কোন ব্যক্তির কবর শরীয়তে বরকতময় বলে প্রমাণিত নয় এবং কবরকে কেন্দ্র করে সালাত বা অন্য কোন ইবাদতও শরীয়তসম্মত নয়। এমনকি কবরস্থানে সিজদা ও সালাত আদায় করলে আল্লাহ তা'আলার লা'নত প্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানরা তাদের নাবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করায় তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত। (সহীহ বুখারী হা: ১৩৩০, সহীহ মুসলিম হা: ৫৩০)

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-কে ওয়াহী করেছেন এ ঘর অপবিত্রতা ও মূর্তি হতে পবিত্র রাখতে, যাতে সকল ইবাদত পালনে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। এখানে শুধু কাবা ঘর সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল মাসজিদ এ নির্দেশের শামিল। তাই প্রত্যেক মাসজিদ সকল প্রকার অপবিত্রতা ও মূর্তি থেকে পবিত্র রাখা ঈমানি দায়িত্ব।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর মর্যাদা জানা গেল।
২. কোন অবস্থাতেই শিরকের সাথে যুক্ত বিষয়ে বিশ্বাস করা যাবে না। পীর বা মাজারে মানত করা,তাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা আছে মনে করা যাবে না।
৩. সকল মাসজিদকে অপবিত্রতা ও মূর্তি হতে পবিত্র রাখতে হবে।
৪. কোন কবরে সালাত আদায় করা যাবে না, কবরবাসী যদিও নাবী বা ওলী হয়ে থাকেন।

পর্ব ৫: ঈসা (আঃ) এর মুজিজা

🔶সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ৩

আর তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্য রাসূল বানাবেন (সে বলবে) ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানাব, অতঃপর আমি তাতে ফুঁক দেব। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রুগীকে সুস্থ করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা যা আহার কর এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখ তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও’।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী মু'জিযাসমূহ দান করেছিলেন। যাতে তাঁর সত্যতা ও মহত্ব প্রকাশিত হয়।

মূসা (আঃ)-এর যুগে যাদু-বিদ্যার বড়ই চর্চা ছিল। তাই তাঁকে এমন মু'জিযা দান করেছিলেন যে, তাঁর সামনে যাদুকররা নিজেদের যাদুর ভেলকি দেখাতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছিল এবং এ থেকে তাদের নিকট মূসা (আঃ)-এর সত্যতা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল; ফলে তারা ঈমান এনেছিল।

ঈসা (আঃ)-এর যামানায় চিকিৎসা বিদ্যার বেশ চর্চা ছিল। তাই তাঁকে মৃতকে জীবিত করার এবং জন্মান্ধ ও ধবল-কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার মু'জিযা দান করেছিলেন। আর এ কাজ কোন ডাক্তারই তার ডাক্তারী বিদ্যার দ্বারা করতে সক্ষম নয়, তাতে সে যত বড়ই বিশেষজ্ঞ হোক না কেন।

আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় কবিতা, সাহিত্য এবং বাকপটুতার খুবই চর্চা ছিল। তাই তাঁকে এমন মু'জিযাপূর্ণ কুরআন দান করলেন যা ছন্দে-মাধুর্যে এবং সাহিত্যে পরিপূর্ণ। যার নজীর পেশ করতে বিশ্বের বড় বড় সাহিত্যিক ও কবিরা অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে। চ্যালেঞ্জ দেওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত অপারগ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অপরাগই থাকবে। (ইবনে কাসীর)

🔶ঈসা (আঃ) যেসব নিদর্শন নিয়ে বানী ইসরাঈলের কাছে আগমন করেছিলেন:

(১) শিশু ও অপরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করল। তারা বলল: 'যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?' সে বলল: 'আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নাবী করেছেন" (সূরা মারইয়াম ১৯:২৯-৩০)

(২) কাদা-মাটি দ্বারা পাখি তৈরি করা: ঈসা (আঃ) মাটি দ্বারা পাখির মত আকৃতি তৈরি করে আল্লাহ তা'আলার নামে ফুঁক দিতেন; ফলে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে উড়ে যেত। (সূরা আলি ইমরান ৩:৪৯)

(৩) জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করা: জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির চোখে ও গায়ে আল্লাহ তা'আলার নামে হাত বুলিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে ভাল হয়ে যেত। (সূরা আলি ইমরান ৩:৪৯)

(৪) মৃতকে জীবিতকরণ: আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে মৃতকে তিনি জীবিত করতে পারতেন। (সূরা আলি ইমরান ৩:৪৯)

(৫) মানুষ যা আহার করে ও যা সঞ্চয় করে রাখে তা বলে দিতেন। (সূরা আলি ইমরান ৩:৪৯)

(৬) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাত সত্যায়নকারী এবং তাদের ওপর যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছিল (তাদের শাস্তিস্বরূপ বা নিজেরা ইজতিহাদ করে হারাম করে নিয়েছিল) তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হালাল করেছেন। (সূরা আলি ইমরান ৩:৫০)

পর্ব ৬ঃ সর্বপ্রথম হত্যাকারী ও মৃতের গল্প

🔶সূরা মায়িদাঃ আয়াত ২৭-২৯

আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হল, আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হল না। সে বলল, 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব'। অন্যজন বলল, 'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহণ করেন'।

'যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করব না। নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি'।

আমি চাই যে, (আমার দ্বারা কোন পাপ না হোক) তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় তুলে নাও; অনন্তর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে।

🔶আয়াতের ব্যাখা/ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

পৃথিবীতে আগমনের পর হযরত আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:) এর সন্তান জন্ম হতে লাগলো। ধীরে ধীরে মানুষ বাড়তে লাগলো পৃথিবীতে। কিন্তু এখানে দৃশ্যত একটি সীমাবদ্ধতা থেকে গেল। আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) যেহেতু পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী, তাই তাদের পরের প্রজন্মে যত সন্তানের জন্ম হবে তারা সকলেই হবে ভাই-বোন।

ইসলামী নিয়ম অনুসারে, ভাই বোনের মাঝে কখনো বিয়ে হয় না। সে হিসেবে এটিই হতো পৃথিবীর শেষ মানব প্রজন্ম। এরপর মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতো। কিন্তু এখানে তো পুরো মানবজাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন, তাই বিশেষ একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এর সমাধান করা হলো।

বিবি হাওয়ার গর্ভে তখন সন্তান জন্ম নিতো জোড়ায় জোড়ায়। প্রতি জোড়ায় একজন ছেলে আর একজন মেয়ে জন্ম হতো। একই জোড়ার ছেলে ও মেয়েরা পরস্পর বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে করতে হলে ভিন্ন জোড়ার কাউকে করতে হবে। কাবিল ও হাবিল ছিল ভিন্ন জোড়ার, তাই তাদের ব্যাপারটি স্বাভাবিক নিয়মেই সমাধান হয়ে যায়। একজন আরেকজনের জোড়ার মেয়েকে বিয়ে করবে।

কিন্তু এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। হাবিলের জোড়ার মেয়েটি তেমন সুন্দরী ছিল না। সেই তুলনায় কাবিলের জোড়ার মেয়েটি ছিল অনেক বেশি সুন্দরী। নিয়ম অনুসারে হাবিল

অধিক সুন্দরী মেয়েটিকে পায় আর কাবিল পায় কম সুন্দরী মেয়েটিকে। কিন্তু কাবিল বেঁকে বসে, সে হাবিলের জোড়ার মেয়েটিকে বিয়ে করবে না। যেভাবেই হোক, নিজের জোড়ার সুন্দরী মেয়েটিকেই বিয়ে করবে।

এমতাবস্থায় পিতা হযরত আদম (আ:) একটি মীমাংসা করলেন। তাদের দুজনকে আল্লাহর নামে কুরবানি দিতে বললেন। যার কুরবানি আল্লাহ গ্রহণ করবেন, তার ইচ্ছাই জয়ী হবে। কার কুরবানি গৃহীত হলো আর কার কুরবানি গৃহীত হলো না, তা কীভাবে বোঝা যায়? তখনকার কুরবানি এখনকার কুরবানির মতো ছিল না। সে সময়ে কোনো জিনিস কুরবানি দিলে আসমান থেকে আগুন এসে ঐ জিনিসকে পুড়িয়ে দিতো। কুরবানির বস্তুকে ভূমি থেকে উপরে কোনো স্থানে উপস্থাপন করা হতো, আকাশ থেকে আগুন এসে যদি বস্তুকে পুড়িয়ে দিতো, তাহলে বোঝা যেতো আল্লাহ কর্তৃক কুরবানী গৃহীত হয়েছে।

পিতা আদম (আ:) এর দেওয়া মীমাংসা অনুসারে তারা উভয়েই কুরবানির বস্তু উপস্থাপন করলো আল্লাহর কাছে। হাবিল একটি সুস্থ ও মোটাতাজা দুম্বা উৎসর্গ করলো আর কাবিল তার কিছু সবজি ও শস্য উৎসর্গ করলো। তখন সবজি ও শস্যও কুরবানির জন্য উৎসর্গ করা যেতো। কোনো কোনো উৎস থেকে জানা যায়, হাবিল উৎসর্গ করেছিল উৎকৃষ্ট মানের দুম্বা আর কাবিলের শস্য ছিল নিকৃষ্ট মানের।

আল্লাহ হাবিলের কুরবানিকেই কবুল করলেন। উপর থেকে আগুন দিয়ে দুম্বাটিকে পুড়িয়ে নিলেন, কিন্তু কাবিলের শস্যকে কিছুই করলেন না। সে হিসেবে বিয়ের নিয়ম আগের মতোই রইলো, হাবিল বিয়ে করবে কাবিলের জোড়ায় জন্ম নেয়া মেয়েটিকে।

কিন্তু কাবিল এই অপমান সহ্য করতে পারলো না। সে ভাবলো, হাবিলের জন্য তার কুরবানি আল্লাহ গ্রহণ করেননি। কুরবানিতে প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে এবং স্ত্রী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত মেয়েকে না পাওয়াতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। ক্রোধের বশে হাবিলকে সে বললো, তোর ইচ্ছা কোনোভাবেই আমি পূরণ হতে দেবো না। প্রয়োজনে তোকে হত্যা করবো, যেন তুই আমার জোড়ার মেয়েটিকে বিয়ে করতে না পারিস।

কোনো কোনো উৎস থেকে জানা যায়, তাকে এমন সর্বনাশা ভাবনার উস্কানি দিয়েছিল সেই পাপিষ্ঠ ইবলিস শয়তান।

কাবিলের এমন আচরণে হাবিল অনেক সুন্দর উত্তর দিয়েছিল। সে বলেছিল, আল্লাহ তাদের কুরবানিই কবুল করেন যার উদ্দেশ্য সৎ।

আর তুমি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার গায়ে আঘাত করলেও, আমি তোমাকে কিছু করবো না। কারণ আমি আমার প্রতিপালককে ভয় করি।

কিন্তু এই কথায় কাবিলের উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন হলো না। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে হত্যা করলো তার আপন ভাইকে।

এরপরই কাবিলের মন গলে যায় এবং অনুভব করে, আহারে, কত বড় ভুল করে ফেললো সে! নিজের ভাইকে নিজ হাতে মেরে ফেললো, এর চেয়ে বড় ধৃষ্টতা আর কী হতে পারে! ভেতরে ভেতরে সে অনেক অনুতপ্ত হলো এবং নিজের অপকর্ম কীভাবে ঢাকবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো। তখনো মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে কোনো নিয়ম তৈরি হয়নি, কারণ এর আগে কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটেনি। মৃত দেহটিকে নিয়ে কী করবে এ নিয়ে যখন সে চিন্তায় মগ্ন তখন দেখলো, একটি কাক তার ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে একটি গর্ত করলো। তারপর সেই গর্তে একটি মৃত কাককে টেনে এনে কবর দিয়ে দিলো।

এটি দেখে কাবিল ভাবলো, তাকেও হয়তো এভাবে কবর দিতে বলা হচ্ছে। তাই একটি গর্ত করে সে তার ভাইকে কবর দিয়ে দিলো। ইসলামের ইতিহাস অনুসারে এটিই ছিল মানবজাতির প্রথম কবর। কোনো কোনো উৎস থেকে জানা যায়, কাক দুটি ছিল ফেরেশতা এবং এদেরকে আল্লাহই পাঠিয়েছিলেন, যেন এদের দেখে কাবিল শিখতে পারে।

অনেকে দাবি করে থাকেন, হাবিলের কবর এখনো দেখা যায় এবং এটি সিরিয়ার দামেস্কে অবস্থিত। দামেস্কের উত্তরে একটি স্থান আছে, যা মাকতালে হাবিল বা হাবিলের হত্যাস্থল নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে আসাকির একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তার একটি বইয়ে। তিনি উল্লেখ করেন, আহমদ ইবনে কাসির একবার রাসুল (সা:)-কে স্বপ্নে দেখেছিলেন। রাসুলের (সা:) পাশে হাবিলও ছিল। এক প্রশ্নের জবাবে হাবিল তখন কসম করে বললো, এটিই আমার হত্যাস্থল। তখন রাসুল (সা:) হাবিলের দাবিকে সত্য বলে সমর্থন করলেন। তবে এটি শুধুই স্বপ্ন বলে ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একে গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হয় না।

কুরআন শরীফে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলা নেই। এমনকি তাদের দুজনের নামও উল্লেখ নেই। শুধু 'আদমের দুই পুত্র' নামে তাদের কথা উল্লেখ আছে। তবে তৌরাত (বাইবেল) গ্রন্থ ও কিছু হাদিসে তাদের ঘটনার বিস্তারিত বলা আছে। ইবনে কাসিরের লেখা 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'তে এই ঘটনার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণে কাবিল ও হাবিলের ঘটনার তাৎপর্য অনেক। কাবিল ও হাবিলের ঘটনা উল্লেখের পরপরই কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত আছে। সেখানে উল্লেখ আছে,কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকেই রক্ষা করলো।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস আছে। রাসুল (সা:) বলেছেন, পৃথিবীতে যখনই অন্যায়ভাবে কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন পাপের একটি অংশ অবশ্যই আদমের প্রথম পুত্র কাবিলের

উপর পড়ে। কেননা সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে।(আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা সূত্রে মুসনাদে আহমদ)

পর্ব ৭ঃ আসমানী দস্তরখান

🔶সূরা মায়িদাঃ আয়াত ১১৪

মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলল, 'হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাবারপূর্ণ দস্তরখান নাযিল করুন; এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য। আর আপনার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হবে। আর আমাদেরকে রিযক দান করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা'।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)-কে যে-সকল মু'জিযাহ ও অনুগ্রহ দান করেছেন তার মধ্যে এটি অন্যতম যে, আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি মায়িদাহ অবতরণ করা।

হাওয়ারী তথা ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খাদ্যভর্তি মায়িদাহ অবতীর্ণের দাবী জানালে ঈসা (আঃ) প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ভয় দেখালেন। তারপর তারা বলল: আমরা চাচ্ছি আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খাবার নিয়ে আসলে আমরা খেতাম, অর্থাৎ তারা খাবারের মুখাপেক্ষী ছিল এবং আমাদের অন্তরে একটি প্রশান্তি আসতো। কেননা এরূপ প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখতে পেলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অন্তরে প্রশান্তি আসে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে বলেছিলেন:

(رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَي قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَي وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)

–"হে আমার রব! কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে দেখান। আল্লাহ বললেন: তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন হ্যাঁ, (বিশ্বাস করি) তবে আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য।" (সূরা বাক্বারাহ ২:২৬০) অনুসারীরা বলল: আমরা জানি আপনি যে নবুওয়াত নিয়ে এসেছেন তা সত্য ও হক।

আর আমরা এ ব্যাপারে আপনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতাম, ফলে পরবর্তীদের ঈমান আনতে সহজ হবে। ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা খাদ্যভর্তি মায়িদাহ নাযিল করেন। খাদ্য পাওয়ার পর যখন খিয়ানত করল এবং জমা করে রাখল তখন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমন শাস্তি দিলেন যা জগৎবাসীর কাউকে দেননি। তা হল তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করে দিয়েছিলেন।

🔸 হাওয়ারীদের উপর খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

আবু জাফর ইবনে জারীর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেনঃ "তোমরা কি ত্রিশদিন রোযা রাখতে পার? অতঃপর তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট খাঞ্চার জন্যে প্রার্থনা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে তা প্রদান করবেন। কেননা, আমলকারীকে মহান আল্লাহ তার আমলের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। তারা তখন তাই করলো। অতঃপর তারা বললোঃ "হে মঙ্গলের শিক্ষাদানকারী ঈসা (আঃ)! আপনি বলে থাকেন যে, আমলকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করে থাকেন। আপনি আমাদেরকে ত্রিশটি রোযা রাখতে বলেছিলেন, আমরা তা রেখেছি। ত্রিশদিন আমরা কারও চাকরী করলে সে আমাদেরকে খেতে দেয় বা বেতন দেয়। তাহলে এখন কি আপনার প্রভু আমাদের উপর খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করবেন?" তখন হযরত ঈসা (আঃ) বললেনঃ "তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহকে ভয় কর।' হাওয়ারীরা তখন বললোঃ 'আমরা তো শুধু আমাদের মনের প্রশান্তি চাচ্ছি এবং নিজেরা বিশ্বাস করে অন্যদের সামনেও সাক্ষী হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি।' মোটকথা, শেষ পর্যন্ত আকাশ থেকে খাদ্যের খাঞ্চা অবতীর্ণ হলো, যাতে সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি ছিল। খাঞ্চাটি তাদের সামনে এসে থেমে গেলো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোকই তা খেলো।

ইবনে জারীর (রঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাওয়ারীরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে বললোঃ আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের উপর আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তখন ফেরেশতাগণ মায়িদাহ্ বা খাঞ্চা নিয়ে অবতীর্ণ হন। ঐ খাঞ্চায় সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি ছিল। খাঞ্চাটি তারা তাদের সামনে রেখে দেন। তা থেকে তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লোকই ভক্ষণ করে।ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "যে মায়েদাহ বা খাঞ্চাটি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে রুটি ও গোশত ছিল। তাদের উপর নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন খিয়ানত না করে এবং পরবর্তী দিনের জন্যে উঠিয়ে না রাখে। কিন্তু তারা খিয়ানত করেছিল এবং জমা করে রেখেছিল। ফলে তাদের আকৃতি বিকৃত করে দিয়ে তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়েছিল।"

মায়িদাহ্ সম্পর্কীয় যতগুলো হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, উক্ত মায়িদাহ বা খানাভর্তি খাঞ্চা হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগের বানী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং ওটা ছিল আল্লাহর নিকট তাঁর প্রার্থনার ফল। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কেউ অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করলে তাকে আল্লাহ তা'আলার মর্মান্তিক শাস্তির কথা স্মরণ করা উচিত।

২. ইয়াহূদীরা আল্লাহ তা'আলার ও নাবীদের সাথে কতটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিল এ আয়াতগুলো তার প্রমাণ বহণ করছে।

৩. মানুষ যা সহজে পায় সাধারণত তার মূল্যায়ন করে না।

পর্ব ৮ঃ ঈসা (আঃ) এর অবস্থান আসমানে

🔶সূরা নিসাঃ আয়াত ১৫৭

এবং তাদের এ কথার কারণে যে, 'আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি'। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে বলে যে দাবী করে তা মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে পারেনি এবং শুলিতেও চড়াতে পারেনি। বরং একজন লোককে ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ করে দেয়া হয়েছিল। তারা তাকে হত্যা করেছে। তারা নিহত লোকটির ব্যাপারে যে মতানৈক্য করেছে তা ধারণাপ্রসূত।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ঈসা (আঃ) বুঝতে পারলেন ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করছে তখন তিনি বার বা সতেরজন সহচর নিয়ে একত্র হয়ে তাদেরকে লক্ষ করে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছো যাকে আমার সাদৃশ্য প্রদান করা হবে, আর তাকে হত্যা করা হবে। ফলে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। তাদের মধ্যে একজন যুবক বলেন, আমি। এভাবে তিনবার ঈসা (আঃ) বললে যুবকটি তিনবারই দাঁড়ায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি দান করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেন। পরে ইয়াহূদীরা এসে সে যুবকটিকে হত্যা করল এবং ক্রুস বিদ্ধ করল আর মনে করল তারা ঈসা (আঃ)-কেই হত্যা করেছে। (ইবনে কাসীর, ২/ ৫০১ এ বর্ণনা বিভিন্ন শব্দে এসেছে)

ঈসা (আঃ)-এর মত আকৃতিবিশিষ্ট লোকটিকে হত্যা করার পর ইয়াহূদীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। একদল বলল, ঈসাকে হত্যা করা হয়েছে, অন্য দল বলল, ক্রুসবিদ্ধ ব্যক্তি ঈসা (আঃ) নয়। অন্যদল বলল তারা ঈসা (আঃ)-কে আসমানে চড়তে স্বচক্ষে দেখেছে। মোট কথা তারা হত্যার ব্যাপারে মতবিরোধের শিকার।

(بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ)

‘বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন’এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আকাশে তুলে নেন।

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা প্রমাণিত। এ সকল হাদীসে ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নেয়া ছাড়াও পুনরায় কিয়ামত দিবসের প্রাক্কালে পৃথিবীতে তার অবতরণ এবং আরো বহু কথা তার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) উক্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করার পর বললেন, উল্লিখিত হাদীসগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে প্রমাণিত। অনেক সংখ্যক সাহাবী এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত হাদীসে ঈসা (আঃ) কোথায় ও কিভাবে অবতরণ করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দামেশকের মিনারা শারকিয়াতে ফজরের সালাতের ইকামাতের সময় অবতরণ করবেন, তিনি শূকর হত্যা করবেন, ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন ও জিযিয়া কর বাতিল করবেন। তার শাসনামলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুসলিম হয়ে যাবে। তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তার যুগেই ইয়াযুজ-মাযুজ ও তাদের ফেতনা প্রকাশ পাবে এবং তার বদদু‘আয় বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। قبل موته “তার মৃত্যুর পূর্বে” আলোচ্য আয়াতে ه (তার সর্বনামটি কার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।)

একদল মুফাসসীরগণের মতে, খ্রিস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক খ্রিস্টানগণ মৃত্যুর পূর্বে ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু সে মুহূর্তে ঈমান কোন কাজে আসবে না।

আরেক দল মুফাসসিরগণের মতে, (এবং এ ব্যাখ্যাটি সঠিক) ”ہٗ“ সর্বনামটি প্রত্যাবর্তন ঈসা (আঃ)-এর দিকে তিনি দ্বিতীয়বার যখন দুনিয়াতে অবতরণ করবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ইসলাম প্রচারে মগ্ন হবেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণের মধ্যে যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদেরকে হত্যা করবেন এবং সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়িম হবে। অবশিষ্ট আহলে কিতাবরা ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রতি যথাযথ ঈমান আনবে।

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ। সেই সত্তার শপথ! অবশ্যই এমন একদিন আসবে যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা বিন মারইয়াম একজন ন্যায়পরায়ন শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। ক্রুস ভেঙ্গে চুরমার করবেন, শুকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর বাতিল করবেন, মাল-সম্পদ এত বেশি হবে যে, (দান-সদাক্বাহ) গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। সেই সময় একটি সিজদা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম হবে। এ হাদীস বর্ণনার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন: তোমরা ইচ্ছা করলে কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করতে পার:
(وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا)

“আহলে কিতাবীগণের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসা) বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামাতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।”(সূরা নিসা ৪:১৫৯, সহীহ বুখারী হা: ৩৪৪৮)

এ ব্যাপারে আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে, যা প্রমাণ করে ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত রয়েছেন। কিয়ামাতের পূর্বে দুনিয়াতে আসবেন। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বীদাহ।

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ঈসা (আঃ) দুনিয়ার আকাশে জীবিত আছেন। শেষ জামানায় আসবেন।

২. আল্লাহ তা'আলা উপরে আছেন, স্বসত্বায় সর্বত্র বিরাজমান নন। যদি তাই না হতো তাহলে ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়ার কোন অর্থ হয় না।

পর্ব ৯ঃ একটি লাঠির গল্প

🔶সূরা ত্বহাঃ আয়াত ১৭

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ
আর 'হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি'?

সূরা ত্বহার ১৭নং আয়াতে আল্লাহ জানতে চাচ্ছেন মূসা (আঃ) এর কাছে তার হাতে এটা কি? যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের রব তিনি কি জানতেন না তাঁর বান্দার হাতে কি?সামান্য বিষয় এটা। তারপরও এ প্রশ্ন কেন? এখান থেকে আমরা বেশ কিছু চিন্তার খোরাক পেতে পারি। যেমনঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর বান্দার কাছ থেকেই বিস্তারিত জানতে চান। তিনি চান তাঁর বান্দা যেন তাঁর সাথেই মন খুলে সব বিষয় শেয়ার করে।

তিনি সমস্যাও জানেন,সমস্যার সমাধানও। তারপরও তিনি আমাদের থেকে জানতে চান বিস্তারিত। তাঁর সাথে যেন আমরা আমাদের সম্পর্ক মজবুত করি সব শেয়ার করার মাধ্যমে। সবকিছুর জন্য যেন একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করি। আমরা তো দুনিয়ার সবাইকে এটা সেটা বলতে চাই। আল্লাহকে কি সব বলি আমরা? বলতে চাই? অথচ সব সমস্যার সমাধান তো তাঁর কাছেই।

🔶সূরা ত্বহাঃ আয়াত ১৮

মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ফেলে থাকি আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।

🔶আয়াতের ব্যাখাঃ

মূসা (عليه السلام) মাদইয়ানে দশ বছর অবস্থান করার পর যখন মিসরের উদ্দেশ্যে স্ত্রী সহ ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর কথোপকথন, রিসালাত প্রাপ্তি ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যার সারসংক্ষেপ হলো :

মূসা (عليه السلام) সস্ত্রীক মাদইয়ান থেকে আসতে পথিমধ্যে রাত হয়ে গেল, রাস্তাও ছিল অজানা, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, হয়তো কোন দিক নির্দেশনা পেলে রাস্তা পেতেন। কেউ কেউ বলেছেন, স্ত্রীর প্রসবের সময় ছিল আসন্ন, শীতও ছিল কনকনে। সব মিলিয়ে আগুনের প্রয়োজন। যখন তুর পাহাড়ের কাছে আসলেন তখন আগুন দেখতে পেলেন, পরিবারকে

বললেন: তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি ঐখানে আগুন দেখতে পাচ্ছি, আগুন নিয়ে আসলে হয়তো শীত কাটানো যাবে অথবা একটা পথ খুঁজে পাব।

অতঃপর যখন তিনি ঐ আগুনের নিকট পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ এল, হে মূসা! আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতো খুলে ফেল। কারণ তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ। আওয়াজটি এসেছিল গাছের আড়াল থেকে, যেমন সূরা ক্বাসাসের ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। জুতো খোলার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, এতে বিনয় বেশি প্রকাশ পাবে এবং অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হবে। আর আমি তোমাকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোন। আমিই আল্লাহ তা'আলা। আমি ব্যতীত আর কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। অতএব একমাত্র আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।

(وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ)

'আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর' প্রথমে ব্যাপকভাবে ইবাদতের নির্দেশ দেয়ার পর বিশেষভাবে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হল কেন অথচ ইবাদতের মাঝে সালাত শামিল?

কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার যত ইবাদত রয়েছে বা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য হাসিল করার যত ইবাদত রয়েছে সকল ইবাদতের মাঝে সালাত সর্বোত্তম পন্থা। তাছাড়া এভাবে ব্যক্ত করে সালাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তারপর মহান আল্লাহ বলেন: কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফলাফল লাভ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে (কিয়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হতে) নিবৃত্ত না করে। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। মূসা (عليه السلام)-কে ঈমানের মূলনীতির বর্ণনা দেয়ার পর কয়েকটি মু'জিযাহর বর্ণনা দিচ্ছেন যাতে তাঁর অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

এর হাতে কী ছিল তা আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন, তারপরেও জিজ্ঞেস আকারে বলার কারণ হল মূসা (عليه السلام) যেন আল্লাহ তা'আলার কথা মনযোগসহ শুনেন আর তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে নেয়ামত দান করেছেন তার গুরুত্ব তুলে ধরা। মূসা (عليه السلام) ছাগল চরাতেন, ফলে এমন একটি মু'জিযাহ দেয়া হল যা তাঁর ব্যক্তিগত কাজেও উপকারে আসে। তিনি এ লাঠির ওপর প্রয়োজনে ভর দিতেন এবং ছাগলের খাবার পাতা পেড়ে দিতেন।

আল্লাহ তা'আলা মূসা (عليه السلام)-কে কেবল জিজ্ঞেস করেছেন তোমার হাতে কী? কিন্তু মূসা (عليه السلام) এত উত্তর দিলেন কেন! কারণ হল তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার একটি সুযোগ পেলেন, এ সুযোগে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক কথা বলে নিলেন। বিস্তারিত কথা বলার মাধ্যমে আরো একটু বেশি সময় যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে পাওয়া যায়। অথচ আমরা কি করি? নিজেদের এবং আল্লাহর সাথে কথপোকথন (দুআর সময়) এর ক্ষেত্রে আমরা কি স্থির থাকি? নাকি দৌড়ের উপর থাকি?

🔶সূরা ত্বহাঃ আয়াত ৭০

অতঃপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হল, তারা বলল, আমরা হারুন ও মূসার রব-এর প্রতি ঈমান আনলাম।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

মূসা আলাইহিস সালাম-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, এ কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং নিঃসন্দেহে এটা মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহর কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। এ অবস্থায়ই তারা ঘোষণা করলঃ আমরা মূসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনলাম। [ইবন কাসীর]

🔶আমাদের জন্য চিন্তার খোরাকঃ

১) মূসা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান নি। আরো একটু বিস্তারিত বলার মাধ্যমেও যদি আল্লাহর সাথে কথা বলার একটু বেশি সময় পাওয়া যায়। অথচ আমরা কি করি?

২) নিজেদের এবং আল্লাহর সাথে কথপোকথন (দুআর সময়) এর ক্ষেত্রে আমরা কি স্থির থাকি?

৩) আমরা কি দুআ করার সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে বিস্তারিত বলতে চাই? আমাদের কোন সমস্যা বা প্রয়োজনের কথা অন্য কেউ জানার আগে একমাত্র আল্লাহকে কি বলি? যেখানে বলা আছে যে জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও যেন আমরা আল্লাহর কাছে চাই, সেখানে আমরা কি করি?

৪) আল্লাহর প্রতি আমরা কতটুকু নির্ভরশীল? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা যত বাড়বে আল্লাহর সৃষ্ট অন্য সবকিছু থেকে আমাদের নির্ভরশীলতা তত কমবে। এ বিষয় টা কি আমরা বুঝতে পারি?

৫) এরপর থেকে আমাদের যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হবে সেটা যত সামান্যই হোক না কেন, আমরা সবার প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার কাছে চাইব।

৬) জাদুকররা যেভাবে ঈমান এনেছিল, তারা যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস এনেছিল সেভাবে আমরা কি ঈমান আনতে পারি? আমাদের চারপাশের বিষয় নিয়ে আমরা যদি চিন্তা ভাবনা করি আমাদের ঈমান কি বৃদ্ধি পায়? যেমনঃ বৃষ্টির সময় আমরা ছোট একটা চিন্তা করতে পারি, আকাশে কোন ফাটল নেই, তারপরও আকাশ থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। কে এসব সম্ভব করলেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যদি এসব বিষয় সহজ না করতেন আর কারো পক্ষে কি এসব করা সম্ভব হত? কখনোই না। তারপরও কি আমাদের ঈমান শক্ত হয় না আল্লাহর প্রতি?

🔶কেন পর্বটার নাম দেয়া হল একটি লাঠির গল্প? গত পর্বে আমরা দেখেছি মূসা (আঃ) এর লাঠির একটি মুজিজার কারনে কিভাবে জাদুকররা ঈমান এনেছে। সেই লাঠির বিষয় প্রথমে এসেছিল যখন মূসা (আঃ) প্রথমবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সাথে কথা বলেছেন তখন। তিনি বলেছেন এই লাঠি দিয়ে তিনি কি কি করেন।

এই লাঠির মুজিযা ছিল লাঠিটা একটা সত্যিকারের সাপে রূপ নিয়ে জাদুকরদের সব কাল্পনিক সাপগুলোকে গিলে ফেলল। সেটা দেখার সাথে সাথেই জাদুকরেরা সত্যি উপলব্ধি করতে পেরে ঈমান এনেছে। তাদের ঈমান আনার কারনে ফিরাউন তাদের মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়।

এই যে লাঠির মুযিযাকে কেন্দ্র করে এত কিছু হয়ে গেল। এ সম্পূর্ন ঘটনা সহ মূসা (আঃ) এর সাথে তাঁর জীবনের শুরুতে কি কি ঘটেছে সেসব বিস্তারিত বিষয় নিয়েই এই আলোচনা।

🔶মুসা (আঃ) এর সময় যে ফেরাউন ছিল তিনি ১৮তম রাজবংশের, তখন মিসরের সম্রাটের খেতাব ছিল ফেরাউন। ফেরাউন যখন স্বপ্নে দেখলেন যে, বনী ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণকারী এক পুত্র সন্তান কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হবেন। তার রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং তার প্রবর্তিত দ্বীনের পরিবর্তন হবে। তখন তিনি তার পরিষদবর্গকে এ বিষয় অবিহত করলেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

হামান ছিলেন ফেরাউনের মন্ত্রী। তাদের স্বপ্নের ব্যাখার ভিত্তিতে ফেরাউন শঙ্কিত হয় এবং তার প্রতিকার হিসেবে তিনি ফরমান জারি করেন যে, বনী-ইসরাঈলের কোন নবজাতক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই যেন তাকে হত্যা করা হয়।

সে সময়ে মূসা আঃ এর জন্ম হয়। মূসা আঃ কে এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে বাঁচাবেন তার মা?

তখন তার মা আল্লাহ্‌র হুকুমে শিশু মূসাকে স্থাপনপূর্বক চাদরে আবৃত করে একটি ঝুড়িতে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা সূরা আল কাসাসের ৭ নম্বর আয়াতে বলেনঃ “আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব।"

ঝুড়িটি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে থেমে থাকে। ফেরাউনের লোকজন এটিকে উঠিয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে ফেরাউনের স্ত্রী ‘আসিয়া’ (আঃ) এর নিকট নিয়ে এল।

মূসা দেখতে ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর। ফেরাউনের কোনও পুত্র সন্তান ছিলো না, শুধু একটি কন্যা সন্তান ছিলো পরবর্তীতে যে ফেরাউনের সিংহাসনে বসেন। শিশু দর্শনে সবার মন স্নেহসিক্ত হয়ে উঠে। বিশেষ করে, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার কোমল অন্তর মাতৃস্নেহে বিগলিত হয়। বিষয়টি ফেরাউনকে অবহিত করা হলে তিনি শিশুটিকে মেরে ফেরার নির্দেশ দেন, কিন্তু এতে স্ত্রী আসিয়া বাধা দেন।

আল্লাহ্‌ তাআলা কোরআনের সূরা আল কাসাসের ৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেনঃ “ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি।" এসব বিষয় পর্যবেক্ষন করছিল মূসা আঃ এর বোন। তিনি যখন দেখলেন যে শিশু মূসা কারো দুধ পান করছে না তখন তিনি জানালেন যে তিনি এমন কারো সন্ধান দিতে পারেন যে তাদের উপকার করতে পারে। এভাবে মূসা আঃ এর মা কে নিয়ে আসা হয়। মূসা আঃ এর মা দুধ পান করান শিশু মূসা কে।

তিনি বড় হওয়ার পর একজনকে সাহায্য করতে গিয়ে ভুলবশত একটা হত্যাকান্ড ঘটিয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে সে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে নিজের জীবন বাঁচাতে মিশর থেকে মাদইয়ানে চলে আসেন।

মাদইয়ানে আসার পর দুজন তরুনীকে পানি তুলতে সাহায্য করলেন যাদের পিতা ছিলেন একজন বৃদ্ধ। মূসা (আঃ) নিজের এত বিপদের মধ্যেও অন্যকে সাহায্য করেছেন কোন কিছু বিনিময়ের আশা ছাড়াই।

তিনি নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা জানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সে দুআ কবুল করে তাকে পরিবার,স্ত্রী, কাজের এবং থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করেছেন দশ বছর।

হযরত শোয়ায়ব নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসার (আলাইহিস সালাম) বিবাহে দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তার প্রস্তাব ছিল মূসা (আলাইহিস সালাম) তার যে কোন একটি কন্যাকে বিবাহ করতে পারে, বিনিময়ে, তাঁকে কমপক্ষে আট বছর তার পশুচারণের কাজ করতে হবে। অবশ্য তুমি ইচ্ছা করলে দশ বছরও থাকতে পার। সূরা আল কাসাসের ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেনঃ “মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহর উপর ভরসা।”

যখন হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) দশ বছর পূর্ণ করলেন, তারপর তিনি তার পরিবার এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য মিশরের পথে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে তুয়া উপত্যকায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাথে কথপোকথন হয় যার বর্ননা গত পর্বে বর্ননা করা হয়েছে। সেখানে তিনি নবুওত লাভ করেন।

হাতের লাঠিটা সাপ হয়ে যায়। এটা প্রথম মুজিজা।

হযরত মূসা (আঃ) কে দেওয়া আল্লাহ্ তাআলার দ্বিতীয় মু'জেযা হল তার উজ্জ্বল হাত। ইবনে-আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে আল্লাহ্ তাআলা বললেনঃ তোমার হাত বগলের নীচ রেখে যখন বের করবে, তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে।

দু'টি বিরাট মু'জেযা দেয়ার পর তাকে আদেশ করা হয়েছে ফিরাউনকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য। এরপর মূসা (আঃ) ৫ টি দুআ করেছেন।

১) হে আল্লাহ, আমার বক্ষ উম্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়তের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

২) "আমার কাজ সহজ করে দিন।" আল্লাহ্ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্যে কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়।"

৩) "আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বোঝতে পারে।"

এ জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা(আ.) দুগ্ধ পান করার যমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মুসা (আ.)দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মূসা (আ.) ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। স্ত্রী আছিয়া (আ.) বললেনঃ রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল-মন্দের পার্থক্যও বোঝে না।

আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্যে আছিয়া একটি পাত্রে জলন্ত অঙ্গার ও অপর পাত্রে মণিমুক্তা এনে মূসা (আ.) -এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জলন্ত অঙ্গারটির উজ্বল ও সুন্দর মনে করে তা ধারার জন্যে হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফেরাউন বোঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশতঃ করেছে। কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না; ছিলেন আল্লাহ্র ভাবী রসূল যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মূসা (আ.) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু জিবরাঈল তার হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং মূসা (আঃ) তথক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে দিলেন।

ফলে তার জিব্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরাউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আ.) এর এই কর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশতঃ। এই ঘটনা থেকেই মূসা (আ.) -এর জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এটা দূর করার জন্যেই মূসা দোয়া করেন। (মাযহারী,কুরতুবী)

৪) "আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্যে একজন সাহায্যকারী দান করুন।"

৫) মূসা (আ.) তার প্রথম দোয়ায় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, তারপর নির্দিষ্ট করে তার ভাই হারুন (আঃ) এর কথা বলেছেন নবুওয়ত এর জন্য।

ফিরাউন মূসা আঃ এর অনেক মুজিযা প্রত্যক্ষ করেছে। তারপরও সে ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানায়। তার কুফরি আরো বেড়ে গেল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মূসা (عليه السلام)-এর প্রতি ওয়াহী করলেন। মূসা (عليه السلام) বানী-ইসরাঈলদেরকে নিয়ে মিসর থেকে চলে যাওয়ার জন্য রাতের প্রথমাংশে রওনা দিলেন। যখন সকাল হল ফির'আউন জানতে পেরে দলবল নিয়ে মূসা (عليه السلام) ও বানী-ইসরাঈদেরকে ধরার জন্য পেছনে রওনা করল। মূসা (عليه السلام) বানী-ইসরাঈলদের নিয়ে নীল নদের কাছে চলে এসেছেন, পেছনে ফির'আউন ও তার দলবল চলে এসেছে। যখন বানী-ইসরাঈলরা দেখল আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম, কারণ সামনে নদী পেছনে ফির'আউন বাহিনী।

মূসা (عليه السلام) বললেন:
((كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ)) "কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।" (সুরা শু'আরা ২৬:৬২)

তারপর সমুদ্রে পথ বের করে দিলেন, মূসা (عليه السلام) ও বানী-ইসরাঈলরা পার হয়ে গেল। এদিকে ফির'আউন দলবল নিয়ে সমুদ্রে রাস্তা পেয়ে নেমে গেল, অর্ধেক রাস্তা যেতেই নিমজ্জিত হয়ে মারা গেল।

সম্পূর্ন কুরআন জুড়েই বিভিন্ন সূরায় মূসা আঃ এর ঘটনার বর্ননা রয়েছে। বিস্তারিত জানতে মূসা আঃ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত গুলো একত্রে পড়ার কোন বিকল্প নেই।

পর্ব ১০ঃ সূরা ইয়াসিন থেকে আন্তরিকতার শিক্ষা

সূরা ইয়াসীন এর ২০-২৬ নাম্বার আয়াতে একজন ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

লোকটা নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে দৌঁড়ে এসে বলেছে এক আল্লাহর ইবাদত এবং রাসূলদের অনুসরণ করার জন্য। অথচ তার সম্প্রদায় এই লোকটাকে হত্যা করে ফেলেছে।

লোকটাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। মানুষ যখন মারা যায় তখনই জান্নাত জাহান্নামের প্রশ্ন আসবে। লোকটাকে তার সম্প্রদায় মেরে ফেলেছে। অথচ এই সম্প্রদায়ের জন্য লোকটা জান্নাতে গিয়ে আফসোস করছে, “আহা আমি কোথায় আছি যদি তারা দেখত!”

এখানেই আসল টুইস্ট। এবার ফেরত যাই সূরা ইয়াসিন বর্নিত সেই নাম না জানা লোকটার ঘটনায়। যার দৌঁড়ে আসার বিষয়টাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ আমাদের সামান্য একটা পদক্ষেপ সেটা যতই ছোট হোক সেটাও পর্যবেক্ষন করেন। অন্যদের মত ছোট বিষয় গুলোও আল্লাহর নজর এড়িয়ে যায় না। লোকটাকে তার সম্প্রদায়ের লোক হত্যা করে ফেলার পর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করল তখন সে তাদের জন্য আফসোস করল। বিষয়টা কিছুটা এমন, "ইশ ওরা কি জিনিস মিস করে ফেলল। ওদের যদি দেখাতে পারতাম। ওরাও যদি এখানে থাকত!"

লোকটার আন্তরিকতা কোন পর্যায়ের দেখেছেন? সুবহানাল্লাহ! আমাদের সাথে কেউ যদি খুব খারাপ ব্যবহার করে আমরা কি তার জন্য দুআ করতে পারব? অন্তত তার সাথে তার খারাপ ব্যবহারের বিপরীতে ভাল ব্যবহার করতে পারব?

সূরা ইয়াসিনে বর্নিত এ মানুষটার এত আন্তরিকতা, যার দৌঁড়ে এসে তার কওমকে সতর্ক করা, জান্নাতে গিয়েও তার কওমের কথা স্মরণ করা সবকিছু কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এ ঘটনা। অথচ আমরা ভ্রুক্ষেপও করি না।

আমরা যদি আন্তরিক হতাম আমাদের সম্পর্ক উন্নয়ন, পারিবারিক, দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে তাহলে অনেক বিষয় সহজেই সমাধান হয়ে যেত। কেউ খারাপ আচরন করলে, কারো কোন বিষয়ে কষ্ট পেলে তার জন্য, কেউ বিপথে থাকলে তার হিদায়ত এর জন্য অন্তর থেকে আমরা যেন দুআ করতে পারি। আল্লাহ যেন সূরা ইয়াসিন এ বর্নিত এ লোকটার মত আন্তরিকতা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেন। আমিন।

পর্ব ১১ঃ দ্বীনকে আকড়ে ধরুন

আর তুমি দেখতে পেতে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে তা হেলে পড়ছে, আর অস্ত গেলে তাদেরকে বামে রেখে কেটে যাচ্ছে, তখন তারা ছিল তার আঙিনায়। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের কিছু। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর যাকে ভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য পথনির্দেশকারী কোন অভিভাবক পাবে না। (সূরা কাহফঃ আয়াত ১৭)

- সংক্ষিপ্ত ঘটনা:

গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারীরা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা সত্য দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হিদায়াত লাভ করে। এই যুবকরা তাঁদের দীনকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের কওমের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ভয়ে যে, না জানি তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদেরকে তাঁদের দীন থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। সেখানে তাঁরা প্রার্থনা করেছিল যে, হে আল্লাহ তা'আলা! আপনার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করুন। আমাদেরকে আমাদের কওম হতে লুকিয়ে রাখুন এবং আমাদের এই কাজের পরিণতি ভাল করুন। অতঃপর তাঁরা সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে আর এই ঘুমন্ত অবস্থায়ই বহু বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগ্রত করেন। আর তখন তাদের মধ্যে কোন প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তারা ঘুমানোর সময় তাদের দেহ, চুল, চামড়া যেরূপ ছিল ঘুম থেকে ওঠার পরও সেরূপই রয়েছে। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল। আচ্ছা বলত, আমরা কত সময় ঘুমিয়ে ছিলাম? উত্তরে বলা হয়: একদিন বা একদিনেরও কিছু কম। কেননা, সকালে তারা ঘুমিয়ে গিয়েছিল, আর যখন জেগে ওঠে তখন ছিল সন্ধ্যা। তাই তারা সূর্যের ওপর অনুমান করে এ কথা বলেছে। অবশেষে এর সঠিক সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার দিকে ন্যস্ত করে।

অতঃপর তারা তাদের ক্ষুধা মিটানোর জন্য তাদের মধ্য থেকে একজনকে মুদ্রাসহ বাজারে পাঠায় কিছু খাদ্য ক্রয় করে আনার জন্য এবং তাকে বলে দেয়, সে যেন খুব সতর্কতার সাথে কাজ করে। যতদূর সম্ভব জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে কেউ আমাদের খবর জানতে না পারে। কারণ যদি তারা আমাদের খবর জানতে পারে তাহলে কঠিন শাস্তি প্রদান করবে আর আমাদের দীনের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে ফেলবে। কারণ বাদশা দাকইয়ানুস, সে ছিল শির্কী মনোভাবাপন্ন এবং সে মূর্তিপূজা করত। আর তাঁরা এই মূর্তিপূজোকে মানতে পারেনি বলেই তাদের দীন রক্ষার জন্য গুহায় আশ্রয় নেয়, যাতে তাদের দ্বারা কোন শির্ক না হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে তাদের মনকে আরো দৃঢ় চিত্ত করে দিলেন যাতে তারা ভয় না পায়। আল্লাহ তাদের এ গুহায় সূর্যের মাধ্যমে আলো প্রবেশ করাতেন।

মানুষেরা মনে করত যে, তারা জাগ্রত; মূলত তারা জাগ্রত ছিল না, তারা ছিল ঘুমন্ত। আর আল্লাহ এ অবস্থায়ই তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাতেন ডানে ও বামে। আর তাদের সাথে একটি কুকুর ছিল। ঐ কুকুরটি তার সম্মুখের পা দু'টি গুহার দ্বারে প্রসারিত করে রেখেছিল। মানুষেরা এই দৃশ্য দেখলে ভয় পেত। এটি ছিল একটি ভয়ানক দৃশ্য। তারা সে গুহায় ঐ ঘুমন্ত অবস্থায় তিনশত নয় বছর ছিল। আর তাদের সংখ্যা ছিল প্রথমে বলা হয় তিনজন ও চতুর্থজন ছিল তাদের কুকুর। পরবর্তীতে তা খণ্ডন করে বলা হয় পাঁচজন ষষ্ঠজন ছিল তাঁদের কুকুর। তবে তাদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ই ভাল জানেন এবং তারা কত বছর ঐ ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন তা-ও একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এভাবেই আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতার বলে মানুষকে গুহাবাসীদের অবস্থা অবহিত করালেন। যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সত্যতার জ্ঞান লাভ করে।

এ কাহিনীর দুটি অংশ:

১. এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য হল ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জবাব দেয়া ও মুসলিমদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দেয়া।

২. কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পটভূমি উক্ত ঘটনাটি কোন্ কালে, কোন্ স্থানে ও জনপদে ঘটেছিল, কাফির বাদশাটি কে ছিল, তাদের সংখ্যা কত ছিল, তারা কতকাল ঘুমিয়েছিল, তারা কি এখনো জীবিত আছে, না মারা গেছে ইত্যাদি।

কুরআনুল কারীমে একজন নাবীর ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি হলেন ইউসুফ (عليه السلام), সে সাথে মূসা (عليه السلام)-এর অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয় যেমন ইউসুফ (عليه السلام)-এর ঘটনা এসেছে। এ ছাড়া কোন ঘটনার বিশদ বর্ণনা কুরআনে আসেনি। প্রত্যেক কাহিনীর ঐ অংশটুকুই বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যা মানবীয় হিদায়াত ও শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা অনর্থক, কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন থাকলে আল্লাহ তা'আলা নিজে অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা বলে দিতেন।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর:

(أَمْ حَسِبْتَ) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তুমি কি মনে করেছ আসহাবে কাহফ ও রকীমের ঘটনা আশ্চর্য ধরণের কোন নিদর্শন? না, বরং আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ও অন্যান্য বিশাল বিশাল মাখলূক সবই আল্লাহ তা'আলার বড় বড় নিদর্শন যা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্বের ওপর প্রমাণ বহন করে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, তাঁকে কোন জিনিস অক্ষম করতে পারে না।

(وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)

অর্থাৎ নিজেদের দীন রক্ষার্থে গুহায় আশ্রয় নেয়া যুবকরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে বলেছিল: সঠিক পথে পৌঁছার উপকরণ সহজ করে দিন এবং উভয় জগতের সফলতা দান করুন। এ অর্থও হতে পারে যে, আমাদের পরিণতি ভাল করে দিন।

(فَضَرَبْنَا عَلٰي اٰذَانِهِمْ)

অর্থাৎ কানে পর্দা সৃষ্টি করে দিলেন, যাতে বাইরের আওয়াজ তাদের কানে গিয়ে ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। কয়েক বছর বলতে ৩০৯ বছর। (তাফসীর সা'দী)

এ দুটি দল বলতে তাদের মধ্যে যে দুটি দল মত বিরোধ করেছিল। যেমন ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

(وَزِدْنٰهُمْ هُدًي)

অর্থাৎ তারা যখন নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য গুহায় চলে গেল তাদেরকে দীনের ওপর অটল রাখার জন্য ঈমান বাড়িয়ে দিলাম।

(وَّرَبَطْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ)

যেহেতু আত্মীয়-স্বজন, সব কিছু বর্জন করে দেশের বাদশার বিরুদ্ধাচরণ করে চলে যেতে হচ্ছে, তাই জীবন নাশের আশঙ্কা অন্তরে প্রবেশ করতে পারে, তাই তাদের অন্তরকে ঈমানের সাথে বেঁধে দিলাম।

(إِذْ قَامُوْا)
অর্থাৎ এ দাঁড়ানো অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে বাদশার নিকট ছিল। তারা রাজ দরবারে দাঁড়িয়ে তাওহীদের ওয়াজ করছিল। কেউ কেউ বলেছেন, শহর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে একে অপরকে তাওহীদের সে কথা শোনাতে লাগল যা এক এক করে প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা সকলে একত্রিত হয়ে বেরিয়ে আসে।

(تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ)

অর্থাৎ সূর্য ওঠার সময় ডান দিকে এবং অস্ত যাবার সময় বাম দিকে পাশ কেটে চলে যায়। আর এভাবে উভয় সময়ে তাদের ওপর সূর্যের আলো পড়ত না। অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে আরামে অবস্থান করছিল। فَجْوَةٍ অর্থ প্রশস্ত স্থান।

أَيْقَاظًا শব্দটি يقظ এর বহুবচন, অর্থ জাগ্রত। رُقُوْدٌ শব্দটি راقد এর বহুবচন অর্থ ঘুমন্ত। অর্থাৎ তাদেরকে এ জন্য জাগ্রত মনে হচ্ছিল যে, তাদের চোখগুলো জাগ্রত ব্যক্তির মত খোলা ছিল। কেউ বলেছেন: খুব বেশি পার্শ্ব পরিবর্তন করার কারণে তাদরেকে জাগ্রত মনে হচ্ছিল।

(وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ)

অর্থাৎ তাদেরকে যেভাবে আমি নিজ কুদরতে ৩০৯ বছর ঘুমের মধ্যে রেখেছিলাম তেমনি কত কাল অবস্থান করেছে তা জিজ্ঞেস করার জন্য জাগ্রত করেছি।

(لِيَعْلَمُوْآ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ)

অর্থাৎ তাদেরকে আমি যেভাবে ৩০৯ বছর ঘুম পাড়ানোর পর জাগ্রত করেছি তেমনি দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করার পর মৃত্যুর পরে হাজার হাজার বছর অতিত হয়ে গেলেও হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত করতে সক্ষম।

(إِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ)

অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে সে সময় অবগত করালেন যখন তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আপোসে বিতর্কে লিপ্ত ছিল।

(فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا)

‘তাদের ওপর সৌধ নির্মাণ কর।’ এ কথা কে বলেছিল? কেউ বলেছেন, সে যুগের ঈমানদারগণ। কেউ বলেছেন; বাদশা ও তার সাথের লোকেরা যখন সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করল এবং এরপর আল্লাহ তা‘আলা পুনরায় তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। তখন বাদশা ও তার সাথীরা বলল: এদের হেফাযত করার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর।

(الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰي أَمْرِهِمْ)

এ প্রবল দলটি ঈমানদার ছিল, না কাফির মুশরিক ছিল? ইমাম শাওকানী প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনু কাসীর দ্বিতীয় মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ কবরকে মাসজিদে পরিণত করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহ তা‘আলার লা‘নত, তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৩৫) সুতরাং ঈমানদাররা এ কাজ করতে পারে না।

(سَيَقُوْلُوْنَ)

অর্থাৎ আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে মতানৈক্য করেছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের আহলে কিতাবরা। তাই আয়াতের শেষের দিকে তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিষেধ করা হয়েছে।

(وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَىْءٍ)

এখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নির্দেশ দিয়ে উম্মাতের সকলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোন কাজ করতে হলে এ কথা বলা যাবে না: আগামী কাল আমি এ কাজ করব। বরং বলবে: ইনশা-আল্লাহ তা'আলা আগামীকাল এ কাজ করব। কারণ হতে পারে আগামী কাল সে উক্ত কাজ নাও করতে পারে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সুলাইমান ইবনু দাউদ (عليه السلام) বলেছেন: অবশ্যই আমি আজ রাতে (আমার) সত্তরজন স্ত্রীর সাথে সহবাস করব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভ ধারণ করবে। এরা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করবে। সুলাইমান (عليه السلام)-এর এক সাথী বলল: ইনশা-আল্লাহ বলেন। সুলাইমান (عليه السلام) তা বললেন না। অতঃপর একজন স্ত্রী ছাড়া বাকী আর কেউ গর্ভ ধারণ করেনি। সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল এবং তারও একটি অঙ্গ ছিল না। নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি তিনি ইনশা-আল্লাহ বলতেন তাহলে সব স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান জন্ম নিত এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করতো। (সহীহ বুখারী হা: ৩৪২৪, সহীহ মুসলিম হা: ১৬৫৪)

আয়াতের অর্থ বর্ণনায় দু'টি মত রয়েছে। এক, তারা গুহার এক কোনে এমনভাবে আছে যে, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে না। স্বাভাবিক আড়াল তাদেরকে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করছে। কারণ, তাদের গুহার মুখ ছিল উত্তর দিকে। এ কারণে সূর্যের আলো কোন মওসুমেই গুহার মধ্যে পৌঁছুতো না এবং বাহির থেকে কোন পথ অতিক্রমকারী দেখতে পেতো না গুহার মধ্যে কে আছে। দেখুন, ইবন কাসীর]

দুই, তারা একটি প্রশস্ত চত্বরে অবস্থান করা সত্ত্বেও দিনের বেলার আলো সূর্যের উদয় বা অস্ত কোন অবস্থায়ই তাদের কাছে পৌছে না। কেননা, মহান আল্লাহ তাদের সম্মনার্থে এ অলৌকিক ব্যবস্থা করেছেন। প্রশস্ত স্থানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে কোন বাধা না থাকলেও তিনি তার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে সূর্যের আলোর তাপ থেকে রক্ষা করেছেন। এ অর্থের স্বপক্ষে প্রমাণ হলো এর পরে বর্ণিত মহান আল্লাহর বাণী: “এটা তো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম”। যদি স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনা হতো তবে আল্লাহর নিদর্শন বলার প্রয়োজন ছিল না। [ফাতহুল কাদীর] ইবনে আব্বাস বলেন, সূর্যের আলো যদি তাদের গায়ে লাগত। তবে তাদের কাপড় ও শরীর পুড়ে যেতে পারত। [ইবন কাসীর]

🔶আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যদি গুহাবাসীর জন্য সূর্যের আলোর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন, যদি আমরা দ্বীনে অটল থাকতে চাই তিনি কি আমাদের জন্য দ্বীনে অটল থাকা সহজ করে দিতে পারেন না?

নাকি আমরা গুহাবাসীর মত নিজেদের দ্বীনে টিকে থাকার জন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যা আমাদের সমাজের স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মিলে না। নিজেরা নিজেদের অবস্থান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। কিসে আমাকে বাধা দিয়ে রেখেছে, আটকে রেখেছে আল্লাহর দ্বীন মনে চলতে?

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যদি জনসমাজে থাকার ফলে ঈমান হারানোর আশঙ্কা থাকে তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করা জায়েয।
২. আকাশ ও জমিনের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।
৩. হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার হাতে অন্য কেউ হিদায়াতের মালিক নয়।
৪. যা না জানলে দীনের কোন ক্ষতি হবে না তা জানা আবশ্যক নয়।
৫. কিয়ামত অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।
৬. কবরের ওপর মাসজিদ বা সৌধ নির্মাণ করা যাবে না।
৭. কোন অনিশ্চিত বিষয় সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক না করে আল্লাহ তা'আলার দিকে ন্যস্ত করতে হবে।
৮. ভবিষ্যতের কোন কাজের ব্যাপারে অবশ্যই ইনশা-আল্লাহ তা'আলা বলতে হবে।

পর্ব ১২ঃ বিশ্বাসীদের তিনিই রক্ষা করবেন

قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ

আমি বললাম, ‘হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য’। (সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৬৯)

আগুনকে যেভাবে ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্য শীতল করা হয়েছিল একই ভাবে আমাদের জন্য আমাদের পরিস্থিতি শীতল করা, শিথিল করা আল্লাহর জন্য কি সম্ভব না? নাকি আমরাই দুআ করতে কার্পন্য বোধ করি?

আমরা এই আয়াতের রেফারেন্স এনে এভাবে দুআ করতে পারি। ইয়া রব! আপনি আমার জন্য সেভাবেই যথেষ্ট হয়ে যান যেভাবে ইব্রাহিম (আঃ) কে আগুনে ফেলে দেয়ার পর তাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য হয়েছিলেন। যেভাবে আপনি ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্য আগুনকে শীতল করে দিয়েছেন সেভাবে আপনি আমার জন্য দ্বীনে চলার পথের এসব পরিস্থিতি শীতল করে দিন, শিথিল করে দিন তারা যেন আমার দ্বীনে অটল থাকায় কোন বাধা সৃষ্টি না করতে পারে।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ

এটা নিয়ম যে, মানুষ যখন দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে যায় তখন হয় পুণ্য তাকে আকর্ষণ করে, না হয় পাপ তার উপর জয়যুক্ত হয়। এখানে এই লোকগুলিকে তাদের মন্দভাগ্য ঘিরে ফেলে এবং তারা দলীল প্রমাণ পেশ করতে অপারগ হয়ে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) উপর শক্তি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

পরস্পর পরামর্শক্রমে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করা হোক, যাতে তাদের দেবতাদের মর্যাদা রক্ষা পায়। এর উপর তাদের সবাই একমত হয়ে গেল এবং খড়ি জমা করার কাজে লেগে পড়লো। এমন কি তাদের রুগ্না নারীরাও মানত করলো যে, যদি তারা রোগ হতে আরোগ্য লাভ করে তবে তারাও হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) পোড়াবার জন্যে খড়ি আনয়ন করবে। যমীনে একটা বড় ও গভীর গর্ত তারা খনন করলো এবং খড়ি দ্বারা তা পূর্ণ করে দিলো।

খড়ির স্তুপ খাড়া করে তারা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। ভূ-পৃষ্ঠে কখনো এমন ভয়াবহ আগুন দেখা যায় নাই। অগ্নি শিখা যখন আকাশচুম্বী হয়ে উঠলো এবং ওর পার্শ্বে গমন অসম্ব হয়ে পড়লো তখন তারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লো যে, কেমন করে তারা

হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) আগুনে নিক্ষেপ করবে? (শেষ পর্যন্ত পারস্যের কুর্দিস্তানের একজন।

বেদুইনের পরামর্শক্রমে একটি লোহার দোলনা তৈরী করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁকে ওটায় বসিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে এবং এই ভাবে তাকে অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। ঐ বেদুঈন লোকটির নাম ছিল হায়ন। বর্ণিত আছে যে, ঐ লোকটিকে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ যমীনে ধ্বসিয়ে দেন। যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেনঃ حَسْبِىَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ “আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মকর্তা।"

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) কাছে যখন এ খবর পৌঁছে যে, সমস্ত আরব বীর সৈনিকদেরকে নিয়ে তার মুকাবিলার জন্যে আসছে তখন তিনিও উপরোক্ত দুআটি পাঠ করেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, যখন মুশরিকরা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে থাকে তখন তিনি বলেনঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ فِى السَّمَاءِ وَاحِدٌ وَاَنَا فِى الْاَرْضِ وَاحِدٌ اَعْبُدُكَ অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আকাশে আপনি (মাবুদ) একাই এবং যমীনে আমি একাই আপনার ইবাদত করি। (এটা মুসনাদে আবি ইয়ালায় হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে) বর্ণিত আছে যে, যখন কাফিররা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) বাধতে থাকে তখন তিনি পাঠ করেনঃ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ অর্থাৎ “আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, প্রশংসা আপনারই জন্যে, রাজত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।” হযরত শুআইব জুবাঈ (রঃ) বলেন যে, ঐ সময় হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

পূর্ব যুগীয় কোন কোন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময়েই হযরত জিবরাঈল (আঃ) তার সামনে আসমান ও যমীনের মাঝে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে বলেনঃ “আপনার কোন প্রয়েজিন আছে কি? উত্তরে তিনি বলেনঃ “আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার প্রয়োজন আছে আল্লার কাছে।”

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বৃষ্টির ফেরেশতা সব সময় কান খাড়া করে প্রস্তুত ছিলেন যে, কখন আল্লাহর হুকুম হবে এবং তিনি ঐ আগুনে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা ঠাণ্ডা করে দিবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ সরাসরি আগুনকেই হুকুম করলেনঃ “হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের (আঃ) জন্যে ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও।” বর্ণিত আছে যে, এই হুকুমের সাথে সাথেই সারা পৃথিবীর আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) বলেন যে, ঐ দিন সারা দুনিয়ায় কেউই আগুন দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে পারে নাই। হযরত ইবরাহীমের (আঃ) বন্ধনের রশিগুলি আগুনে পুড়ে যায় বটে, কিন্তু তাঁর নিজের শরীরের একটি লোমও পুড়ে নাই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ আগুনকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, যেন হযরত ইবরাহীম খলীলের (আঃ) কোনই ক্ষতি না করে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি আগুনকে শুধু ঠাণ্ডা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো তবে ঠাণ্ডাই তার ক্ষতি করতো। এজন্যেই সাথে সাথেই ওকে নির্দেশ দেনঃ "নিরাপদ হয়ে যাও।'

যহহাক (রাঃ) বলেন যে, মুশরিকরা খুব বড় ও গভীর গর্ত খনন করেছিল। এবং ওটাকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করেছিল। চতুর্দিকে আগুনের শিখা বের হচ্ছিল। তারা ওর মধ্যে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু অগ্নি তাকে স্পর্শও করেনি। শেষ পর্যন্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ ওকে ঠাণ্ডা করে দেন। উল্লিখিত আছে যে, ঐ সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মুখ হতে ঘর্ম মুছতে ছিলেন। সুতরাং এইটুকু ছাড়া আগুন তার আর কোন কষ্ট দেয় নাই।

সুদ্দী (রাঃ) বলেন যে, ছায়াকারী ফেরেশতা ঐ সময় তার সাথে ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ঐ অগ্নিকুণ্ডে চল্লিশ দিন অথবা পঞ্চাশ দিন ছিলেন। তিনি বলতেনঃ "এই দিনগুলিতে আমি যতটা আরাম ও আনন্দবোধ করেছিলাম, ওর থেকে বের হওয়ার পর ততটা আরাম ও শান্তি লাভ করি নাই। যদি আমার সারা জীবনটাই ওর মধ্যে অতিবাহিত হয়ে যেতো তবে কতই না ভাল হতো!"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, হযরত ইবরাহীমের পিতা সবচেয়ে উত্তম যে কথাটি বলে ছিলেন তা এই যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) আগুন হতে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় বের হয়ে আসেন, ঐ সময় তাকে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আসতে দেখে সে তাকে বলেছিলঃ "হে ইবরাহীম (আঃ), তোমার প্রতিপালক বড়ই মহান এবং বড়ই শক্তিশালী।"

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, ঐদিন যতগুলি জীবজন্তু বের হয় সবাই ঐ আগুন নিভিয়ে দিবার চেষ্টা করতে থাকে, একমাত্র গিরগিট (টিকটিকির চেয়ে বড় এক প্রকার বিষাক্ত প্রাণী) এর ব্যতিক্রম। হযরত যুহরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন এবং ওকে ফাসেক বলেছেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে একটি বর্শা দেখে একটি স্ত্রী লোক তাকে জিজ্ঞেস করেঃ "ঘরে এটা কেন রেখেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "গিরগিটকে মারবার জন্যে এটা রেখেছি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে সময় হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় সেই সময় গিরগিট ছাড়া সমস্ত জীবজন্তু ঐ আগুন নিভিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গিরগিট ঐ আগুনে ফু দিচ্ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।" (এ হাদীসটি ইবনু আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন)

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু আমি করে দিলাম তাদের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার দৃশ্য দেখবার জন্যে ঐ কাফিরদের বাদশাহ এসেছিল। একদিকে হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, আর অপরদিকে ঐ আগুনেরই একটি স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে ঐ বাদশাহ বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর পড়ে যায় এবং সেখানেই সবারই সামনে তাকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় যেমন ভাবে তূলা জ্বলে থাকে। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

পর্ব ১৩: মূসা (আঃ) এর দুআ থেকে শিক্ষা

- সূরা ত্বহাঃ ২৫-২৮

সম্ভাব্য উচ্চারনঃ"রব্বিশ রহলি, সদরি, ওয়াস-সিরলী, আমরী, ওয়াহ্লুল উক্বদাতাম মিল-লিসানি, ইয়াফকাহু ক্বউলি।"

অর্থঃ "হে আমার পালনকর্তা আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন,যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে'।"

মূসা (আঃ) এর এ দুআর মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যা আমরা সচারাচর লক্ষ্য করতে পারি না সেগুলো হলঃ

১)এ দুআর প্রথমে লক্ষ্য করি। বক্ষ প্রশস্ত করা। কোন ভাল বিষয়ও আমরা অনেক সময় অপছন্দ করতে পারি, হতে পারে সেটার প্রসেস বা সম্পূর্ন বিষয়টাই আমার ভাল লাগছে না কিন্তু সেটাই কল্যানকর। আমাদের অন্তর/ বক্ষ যদি প্রশস্ত হয়, আমাদের এ বিষয় গুলো গ্রহন করতে সহজ হবে।

২)যে কোন কাজের জন্য সহজতা চাওয়া। আমরা আমাদের সব ধরনের কাজের জন্যই আল্লাহর কাছে সহজতা চাইব। কঠিন কাজ অনেক সময় করতেও ইচ্ছে করে না, কাজের প্রতি বিরক্তি চলে আসে। সহজতা খুব গুরুত্বপূর্ন বিষয়।

৩)আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানা জরুরি। সেটা জানা থাকলে সেটা থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য চাওয়া যাবে।

৪)তারা যেন সহজে আমার কথা বুঝতে পারে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব বেশিরভাগ সমস্যা শুরুই হয় ভুল বুঝাবুঝির কারনে। অপরপক্ষ সঠিক অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে সেখান থেকেই বিপদ শুরু। সহজে কথা বুঝতে ও বুঝাতে পারলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়।

আমরা কোন কাজের শুরুতে, পড়াশুনার শুরুতে,কাজের সহজতার জন্য, সাফল্যের জন্য এ দুআকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিতে পারি ইনশাআল্লাহ।

পর্ব ১৪: সূরা ইউসুফ থেকে শিক্ষা

মা বাবার দুআ যেমন কবুল হয় তেমনি বদ দুআও কবুল হয়। আমরা কথা বলার সময় যেন সতর্ক থাকি। নিজেরা নিজেদের সবর করার অনুশীলন জারি রাখি। আল্লাহর কাছে আমাদের কাজের সহজতার জন্য দুআ করি।

নবী ইয়াকুব (আঃ) এর ১০ জন ছেলে যখন ইউসুফ (আঃ) কে কূপে ফেলে দিয়ে বাবার কাছে ফেরত এসে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা ঘটনার বর্ননা করেছিল তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তারা মিথ্যা বলে যাচ্ছে। এত বড় ঘটনার পর কেমন ছিল একজন বাবার প্রতিক্রিয়া? সূরা ইউসুফ এর ১৮ নাম্বার আয়াতে এর স্পষ্ট বর্ননা আছে।

🔷সূরা ইউসুফ (আয়াত নং - ১৮) অর্থঃ "আর তারা ইউসুফের জামায় মেকি রক্তও মাখিয়ে এনেছিল।তাদের পিতা বলল, (এটা সত্য নয়) বরং তোমাদের মন নিজের পক্ষ থেকে একটা গল্প বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং আমার জন্য ধৈর্যই শ্রেয়। আর তোমরা যেসব কথা তৈরি করছ সে ব্যাপারে আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করি।"

এত বড় ঘটনার পরও তিনি তাদের কোন অভিশাপ দেন নি। শুধু তাদের হিদায়ত এর জন্য দুআ করেছেন। তাঁর কষ্টের কথা কোন মানুষকে বলে বেড়াননি। শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন, আল্লাহর কাছেই নিজের কষ্টগুলোতে সঁপে দিয়েছেন।

বিনিময়ে কি পেয়েছেন? হারানো পুত্র সন্তান ইউসুফ (আঃ) কে ফিরে পেয়েছেন, এবং তাঁর সব সন্তানেরা শেষ পর্যন্ত একত্রিত হয়েছিল। সুবহানাল্লাহ!

আমরা আমাদের কঠিন মুহূর্তে নিজেদের জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করব। আগে থেকেই কিছু কথা নিজেদের মাথায় গেঁথে রাখতে পারি যে এমন পরিস্থিতিতে কি বলব। যেমনঃ আল্লাহ তোমাকে হিদায়ত দিন। আল্লাহ তোমাকে শান্ত করে দিন। আল্লাহ আমার জন্য সহজ করুন। ইত্যাদি।

আমরা কুরআন শুধু রিডিং পড়ে রেখে দিব না, কুরআন থেকে আমাদের জন্য যে বার্তা আছে সেটা নিজেদের অন্তরে ধারন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

🟢আমাদের জন্য চিন্তার খোরাকঃ

১)বিপদের সময় আমরা কি আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজেদের আচরনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি?

২)আমরা কি অভিশাপ/ কটু কথা বলা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারি?

৩)আমরা কি রাগের মূহুর্তেও নিজেদের চিন্তা ভাবনাকে ভালো দিকে নিয়ে যেতে পারি?

৪)অপরপক্ষ মিথ্যা/ অযাচিত কথা বা আচরন করেছে জানার পর আমরা কি শালীনতা বজায় রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারি? নাকি উত্তেজিত হয়ে যাই?

৫)আমরা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি?

পর্ব ১৫: নফসের ধোঁকা

শয়তানকে (ইবলিস) নিয়ে আমাদের সমাজে কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, যার মধ্যে একটি হলো সে একসময় ফেরেশতা ছিল। এই ধারণাটি সঠিক নয়।

শয়তান কখনোই ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফেরেশতারা নূরের তৈরি এবং তাঁরা আল্লাহর প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁদের মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো প্রবণতা নেই। শয়তান ছিল জ্বীন জাতির একজন, যাকে আল্লাহ আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন।

ইবলিস তার ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছিল। আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে তাকে ফেরেশতাদের সাথে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরেশতা হওয়া আর তাদের সাথে থাকার অনুমতি পাওয়া এক কথা নয়। সে তার জ্বীন সত্তা নিয়েই ফেরেশতাদের সাথে থাকত।

আমরা যখন কোনো মন্দ কাজ করি, তখন প্রায়ই শয়তানকে দোষারোপ করে নিজেদের দায়মুক্ত করার চেষ্টা করি। অথচ, এই ধারণাটিও ভুল। শয়তানের কোনো কিছু করিয়ে ফেলার ক্ষমতা নেই। সে কেবল আমাদের মনে ফিসফিস করে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) দিতে পারে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সব সময় আমাদের হাতেই থাকে। আমরা কি শয়তানের প্ররোচনায় সাড়া দেব, নাকি আল্লাহর আদেশ মেনে চলব, তা সম্পূর্ণই আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ কেন শয়তান সৃষ্টি করেছেন? শয়তানের আগে কি কোনো শয়তান ছিল? এবং শয়তান কেন আদম (আ.)-কে সিজদা করল না?

প্রথমত, আল্লাহ তায়ালা শয়তানকে 'শয়তান' হিসেবে সৃষ্টি করেননি। শয়তান জ্বীন জাতিরই একজন সদস্য ছিল, যার নাম ছিল ইবলিস। সে তার নাফসের ধোঁকা ও অহংকারের কারণে আল্লাহর নির্দেশকে অবজ্ঞা করে নিজেই 'শয়তান' হওয়ার পথ বেছে নিয়েছে। অর্থাৎ, তার নিজের কর্মফলই তাকে শয়তানে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয়ত, ইবলিসের আগে কোনো শয়তান ছিল না। সে-ই প্রথম জ্বীন, যে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং তার অহংকারের কারণে অভিশপ্ত হয়।

তৃতীয়ত, শয়তান আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আদম (আ.)-কে সিজদা না করার প্রধান কারণ ছিল তার সীমাহীন অহংকার ও আত্মদম্ভ। আল্লাহ যখন ফেরেশতা ও ইবলিসকে আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন, তখন ইবলিস নিজেকে আদম (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে

এই আদেশ অমান্য করে। সে যুক্তি দেখায়, "আমি আগুনের তৈরি, আর সে (আদম) মাটির তৈরি। আমি কেন তাকে সিজদা করব?"

আদম (আ.) এবং শয়তানের ভুলের ঘটনার তুলনা করলে শয়তানের অহংকার ও ইগোর মাত্রা পরিষ্কার বোঝা যায়:

* আদম (আ.)-এর ভুল: নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আদম (আ.) যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করলেন, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনুতপ্ত হলেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন, তওবা করলেন এবং নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হলেন। তাঁর এই বিনয় ও তওবার কারণে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

* শয়তানের ভুল ও প্রতিক্রিয়া: আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করলেন। ইবলিস তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে সিজদা করতে অস্বীকার করল। আল্লাহ যখন তাকে তার ভুল ধরিয়ে দিলেন এবং তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, তখনও সে তার ভুল স্বীকার করল না। বরং, সে আরও এক ধাপ এগিয়ে আল্লাহর কাছে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ চাইল, যেন সে আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে।

নিজের জন্য জাহান্নাম চেয়ে নেওয়া এবং অন্যদেরও সেই পথে টানার এই ইচ্ছাই তার সীমাহীন ইগো, অহংকার ও গোঁড়ামির চরম বহিঃপ্রকাশ। ভুল করার পর তা স্বীকার করে তওবা করলেই সব শেষ হয়ে যেত, কিন্তু সে তা করেনি।

- শয়তানের ভুলের মূল কারণ ছিল তার অহংকার ও গোঁড়ামি। এর কিছু দিক হলো:

১. আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন: সে আল্লাহর সরাসরি আদেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

২. নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অহংকার: সে নিজেকে আদম (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দাবি করেছিল।

৩. আদেশ অমান্য করার দৃঢ়তা: সে জেনে বুঝেও আল্লাহর আদেশ অমান্য করার সিদ্ধান্তে অটল ছিল।

৪. আল্লাহর সাথে তর্ক: "আমি কেন তাকে সিজদা করব? সে মাটির তৈরি, আমি আগুনের তৈরি?"—এই বলে সে আল্লাহর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

৫. নিজের জন্য জাহান্নাম চাওয়া: "আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন, আমি যেন আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে আমার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারি।"—নিজের জন্য জাহান্নাম চাওয়া তার চূড়ান্ত স্পর্ধা ছিল।

৬. তওবা না করা: ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে তওবা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে তা করেনি।

৭. নাফসের চাহিদা পূরণ: "সে আগুনের তৈরি হয়েও মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করবে কেন?"—তার নাফসের এই অহেতুক প্রশ্নই তাকে বিপথে ঠেলে দিয়েছে।

আমরা কি শয়তানের পথে হাঁটছি?

🔸 শয়তানের এই ভুলগুলো আমাদের নিজেদের জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়। আমরা নিজেদের কিছু প্রশ্ন করতে পারি:

১. আমরা কি আল্লাহর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলছি?

কেন আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ মানতে হবে? কেন সালাত আদায় করতে হবে? কেন সুদ/ঘুষ হারাম? কেন অবৈধ সম্পর্ক জায়েজ নয়? কেন পর্দা করতে হবে? কেন চোখ সংযত রাখতে হবে? কেন রোজা, যাকাত? কেন গীবত করা যাবে না? কেন গালাগালি করা যাবে না? এই "কেন কেন" প্রশ্নগুলো বন্ধ করতে হবে। আল্লাহর সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক করার প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

আল্লাহ যা করতে বলেছেন, আর যা নিষেধ করেছেন, সেটাই আমাদের জন্য চূড়ান্ত। রেফারেন্স হিসেবে কুরআন ও হাদিস আছে। কোনো বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে বিজ্ঞ আলেমদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। নিজেদের অহেতুক কথার প্যাঁচ ও প্রশ্নের ফাঁদে না পড়ে আমাদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত।

২. নাফসের খায়েশ মেটানোর জন্য আমরা কি যাচ্ছে তাই করে যাচ্ছি?

আলমারি ভর্তি পোশাক থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার টাকা দিয়ে নতুন পোশাক না কিনলে মানুষ কী বলবে—এই চিন্তা করে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা? গতবারের পোশাক পরা যাবে না, কারণ এবার নতুন না হলে মান-সম্মান থাকবে না—এসব চিন্তা কি আমাদের মধ্যে কাজ করে?

নিজস্ব আয়োজন বা মেহমানদারিতে দুই একটা ভালো খাবারের আইটেম দিয়েই যদি সহজে কাজ সারা যায়, তাহলে কে কী বলবে সেই ভয়ে বাড়তি দশটা আইটেম তৈরি করা? এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো আমরা সময় থাকতেই পরিহার করা উচিত। অপ্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ই নাফসের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. কোন বিষয় নিয়ে অহংকার বা হিংসা করছি?

"অমুক বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজ পড়তে যায়, তাই আমারও বাসার পাশের মসজিদ ছেড়ে হয়রানি সয়ে সেখানেই যেতে হবে"—এই ধরনের মনোভাব? "অমুকের সন্তান অমুক ভালো স্কুলে পড়ছে, আমাদের সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক, সেখানেই পড়াতে হবে"?

"আরে, ওরা তো নতুন বাসা নিয়ে নিল, ওদের বাসাটা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যাক তো। উফফ, আর সহ্য হচ্ছে না! কীভাবে নিল বাসাটা? অমুকের এত টাকা বেতন? কেন, কেন? এটা মানতেই পারছি না।"

"ওদের বাসায় সোফা নেই, ডাইনিং টেবিল নেই। ওদের বাসায় যাওয়া যাবে না। ওরা টিনশেড বাসায় থাকে। ওদের সাথে মিশে যায় নাকি? ছি ছি! এসব বাসায় মানুষ থাকে নাকি?"—এই ধরনের চিন্তা আমাদের মধ্যে শয়তানি অহংকার ও হিংসার বীজ বপন করে।

৪. সত্যি জানার পরও কি নিজেদের মধ্যকার ইগোকে প্রাধান্য দিচ্ছি?

"ছোট হয়ে জ্ঞান দিতে এসো না তো। তুমি আমার আগে দুনিয়াতে এসেছ নাকি আমি এসেছি?"—এই মনোভাব?

"না না। ইসলাম ধর্ম মানা যাবে না। আমার বাবা-দাদার ধর্ম কীভাবে ছেড়ে দেই? সম্ভব না। সত্যি হলেও সম্ভব না।" "পরিবারের মানুষ কী বলবে? মুখ দেখাব কীভাবে?"

"সারাজীবন পা ধরে সালাম করে আসার পর এখন এসব কী অভদ্রতা শুরু করেছ? আমরা বুঝি ইসলাম জানি না? কিসব মাহরাম-গায়রে মাহরাম শুরু করেছ? এসব ভণ্ডামি বাদ দাও তো। পর্দা করার নামে দুষ্টামি শুরু করেছ। দেখব না কতদিন চলে এসব! হুহ!"—সত্যকে জেনেও নিজের ইগো বা সামাজিকতার দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করা শয়তানি বৈশিষ্ট্য।

৫. নিজেদের মধ্যে গোঁড়ামি আছে? সত্যকে কি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারছি?

"কথা বললেই গীবত কেন হবে? সে তো করেছে এটা। এগুলো গীবত না। আরো শুনো, এত কিছু এসব বানানো কথা।" "কুরআন তো এক পিসই। কিন্তু কেউ কি দেখেছ এটা কে কোথা থেকে লিখেছে? এত কিছু বিশ্বাস করার কী দরকার? কে বলেছে মৃত্যুর পর জীবন আছে? মারা যাওয়ার পর শুধু ঘুমাব আমরা, শান্তির ঘুম।"

"স্মার্ট মানুষজন ধর্ম নিয়ে কথা বলে না। কী সব হুজুরদের মতো শুরু করেছ! বাদ দাও তো। স্মার্ট হতে হলে মদ খেতে হবে, পার্টি করতে হবে, সবার সাথে গ্রুপ ছবি তুলতে হবে, সবার

সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে হবে, সহশিক্ষায় যেতে হবে। সহশিক্ষা ছেড়ে দিলে লোকে কি বলবে। দুদিনের দুনিয়া এত কিছু মেনে চললে হয় নাকি?"

"তাহলে কুরআনে আল্লাহ যেসব বলেছেন সেসব কী? আরে কুরআন মানুষই কেউ লিখেছে।" (নাউজুবিল্লাহ)—এই ধরনের গোঁড়ামি ও সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা শয়তানের পথ।

৬. ভুল করার পর মাফ চেয়ে নিতে পারছি? নাকি আমাদের মধ্যে এমন মনোভাব কাজ করে যে আমরা কোনো ভুল করতেই পারি না, সব ভুল অপরপক্ষের?

"কত বড় সাহস আমার নাকি ভুল হয়েছে বলতে আসে? আমি ফেরেশতার মতো মানুষ! আমি কি ভুল করব নাকি? সব ভুল তারা করেছে। এজন্য তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে এসেছি।"—নিজের ভুল স্বীকার না করে অন্যের ওপর দোষ চাপানো এবং নিজেকে নিষ্পাপ ভাবা শয়তানি বৈশিষ্ট্য।

৭. নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পেরেছি? গুনাহের পর তওবা করতে পেরেছি?

"ওর এত আছে। বাড়ি, গাড়ি সব আছে। অথচ আমাদের কিছু নেই। ফার্নিচারগুলো পুরাতন হয়ে গেল। বছরখানেক আগের গাড়িটা পুরাতন হয়ে গেল। আল্লাহ আমাদের কেন দিলেন না? কেন, কেন?"—আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং অন্যের প্রতি হিংসা করা শয়তানেরই প্ররোচনা।

এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারি। আমরা কি আসলেই মানুষ হিসেবে টিকে আছি, যাদের আল্লাহ এত ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন? নাকি আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য স্বেচ্ছায় শয়তান হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করে নিয়েছি?

🔶তথ্যসূত্র:

১]শয়তান এর উক্তি বিষয়ক রেফারেন্সঃ

৩৬. ইবলিস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।
৩৭. আল্লাহ বলেন, তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।
৩৮. (এই অবকাশ) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (সুরা : হিজর, আয়াত : ৩৬-৩৮)

২]শয়তান তর্ক করে যা বলেছে সে বিষয়ক রেফারেন্সঃ

৬১. স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদা করো। তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করেছে। ইবলিস বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৬১)
সে (শয়তান) বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১২)

৩] শয়তান কোন ফেরেশতা ছিল না, সে ছিল জ্বিনদের মধ্য থেকে একজন।এ বিষয়ে রেফারেন্সঃ

ইবলিস ফেরেশতা ছিল না- এর একটা প্রমাণ হল সে যদি ফেরেশতা হত, তাহলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করতো না। কারণ কুরআনেই ফেরেশতাদের প্রাথমিক গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে- “তারা আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে না, এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।” [সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৬]

৪] ইবলিস যে জ্বীন ছিল এ ব্যাপারে কুরআনে পরিষ্কার আয়াত রয়েছে-

‘‘আমি’ যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, “আদমের প্রতি সিজদা করো’, তারা সবাই করেছিল, ইবলিস ছাড়া—সে ছিল জ্বিনদের একজন।” [সূরা আল-কাহফ ১৮:৫০]

পর্ব ১৬: একশত বছর পর জীবিত হওয়া

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ২৫৯

অথবা সে ব্যক্তির মত, যে কোন জনপদ অতিক্রম করছিল, যা তার ছাদের উপর বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, ‘আল্লাহ একে কিভাবে জীবিত করবেন মরে যাওয়ার পর’? অতঃপর আল্লাহ তাকে এক’শ বছর মৃত রাখলেন। এরপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। বললেন, ‘তুমি কতকাল অবস্থান করেছ’? সে বলল, ‘আমি একদিন অথবা দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছি’। তিনি বললেন, ‘বরং তুমি এক’শ বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সেটি পরিবর্তিত হয়নি এবং তুমি তাকাও তোমরা গাধার দিকে, আর যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে পারি এবং তুমি তাকাও হাড়গুলোর দিকে, কিভাবে আমি তা সংযুক্ত করি, অতঃপর তাকে আবৃত করি গোশ্ত দ্বারা’। পরে যখন তার নিকট স্পষ্ট হল, তখন সে বলল, ‘আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

এই অতিক্রমকারী হয় হযরত উযায়ের (আঃ) ছিলেন যেমন এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে, না হয় তিনি ছিলেন আরমিয়া বিন খালকিয়া এবং এটা হযরত খিযর (আঃ)-এর নাম ছিল। কিংবা ঐ অতিক্রমকারী ছিলেন হযরত হিযকীল বিন বাওয়া (আঃ) অথবা তিনি বানী ইসরাঈলের মধ্যেকার এক ব্যক্তি ছিলেন।

এই জনপদ ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। এই উক্তিটিরই প্রসিদ্ধি রয়েছে। রাজা বখতে নাসর যখন ঐ জনবসতি ধ্বংস করে এবং জনগণকে তরবারির নীচে নিক্ষেপ করে তখন ঐ জনবসতি একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়। এরপর ঐ মহান ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করেন। যখন তিনি দেখেন যে, জনপদটি একেবারে শশ্মান হয়ে গেছে, তথায় না আছে কোন বাড়ীঘর,না আছে কোন মানুষ!

সেখানে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন যে, এমন জাকজমকপূর্ণ শহর যেভাবে ধ্বংস হয়েছে এটা কি আর কোন দিন জনবসতি পূর্ণ হতে পারে! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকেই মৃত্যু দান করেন। তিনি তো ঐ অবস্থাতেই থাকেন। আর এদিকে সত্তর বছর পর বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনবসতিপূর্ণ হয়।

পলাতক বানী ইসরাঈল আবার ফিরে আসে এবং নিমেষের মধ্যে শহর ভরপুর হয়ে যায়। পূর্বের সেই শোভা ও জাঁকজমক পুনরায় পরিলক্ষিত হয়। এবারে একশো বছর পূর্ণ হওয়ার

পর আল্লাহ তাকে পূনর্জীবিত করেন এবং সর্বপ্রথম চক্ষুর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করে যেন তিনি নিজের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন।

অতঃপর যখন ফু দিয়ে সারা দেহে আত্মা প্রবেশ করানো হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কত দিন ধরে মরেছিলে:' উত্তরে তিনি বলেনঃ 'এখনও তো একদিন পুরোই হয়নি।

এটা বলার কারণ ছিল এই যে, সকাল বেলায় তাঁর আত্মা বের হয়েছিল এবং একশো বছর পর যখন তিনি জীবিত হন তখন ছিল সন্ধ্যা। সুতরাং তিনি মনে করেন যে, ঐ দিনই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেনঃ তুমি পূর্ণ একশো বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। এখন আমার ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, পাথেয় হিসাবে যে খাদ্য তোমার নিকট ছিল তা একশো বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও ঐরুপই রয়েছে, পঁচেওনি এবং সামান্য বিকৃতও হয়নি। ঐ খাদ্য ছিল আঙ্গুর, ডুমুর এবং ফলের নির্যাস। ঐ নির্যাস নষ্ট হয়নি, ডুমুর টক হয়নি এবং আরও খারাপ হয়নি। বরং প্রত্যেক জিনিসই স্বীয় আসল অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলেনঃ 'তোমার গাধার যে গলিত অস্থি তোমার সামনে রয়েছে সে দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমার চোখের সামনেই আমি তোমার গাধাকে জীবিত করছি। আমি স্বয়ং তোমাকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শন করতে চাই, যেন কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। অতঃপর তিনি দেখতে দেখতেই অস্থিগুলো স্ব-স্ব জায়গায় সংযুক্ত হয়ে যায়।

মুসতাদরাক-ই-হাকিমে রয়েছে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পঠন نُنْشِزُهَا এর ز 'র সঙ্গেই রয়েছে এবং ওটাকে نُنْشِرُهَا এর ر সঙ্গেও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ 'আমি জীবিত করবো।' মুজাহিদের (রঃ) পঠনও এটাই। সুদ্দী (রঃ) প্রভৃতি বলেন যে, অস্থিগুলো ডানে বামে ছড়িয়ে ছিল এবং পঁচে যাওয়ার ফলে ওগুলোর শুভ্রতা চর্চা করছিল। বাতাসে ঐগুলো একত্রিত হয়ে যায়। পরে ওগুলো নিজ নিজ জায়গায় যুক্ত হয়ে যায় এবং পূর্ণ কাঠামো রুপে দাঁড়িয়ে যায়। ওগুলোতে গোশত মোটেই ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা ওগুলোর উপর গোশত, শিরা ইত্যাদি পরিয়ে দেন। অতঃপর ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁর নাসারন্ধ্রে ফুঁ দেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তৎক্ষণাৎ গাধাটি জীবিত হয়ে উঠে এবং শব্দ করতে থাকে। হযরত উযের (আঃ) দর্শন করতে থাকেন এবং মহান আল্লাহর এই সব কারিগরী তার চোখের সামনেই সংঘটিত হয়।

এই সব কিছু দেখার পর তিনি বলেনঃ 'আমার তো এটা বিশ্বাস ছিলই যে, আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু আজ আমি তা স্বচক্ষে দর্শন করলাম। সুতরাং আমি আমার যুগের সমস্ত লোক অপেক্ষা বেশী জ্ঞান ও বিশ্বাসের অধিকারী। কেউ কেউ আ'লামু শব্দকে ই'লামও পড়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তুমি জেনে রেখো যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপরেই ক্ষমতাবান।'

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর সকলকে জীবিত করতে সক্ষম এবং নির্ধারিত সময়ে করবেন।

২. যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

পর্ব ১৭ হাজার হাজার মৃত জীবত হওয়া

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ২৪৩

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা তাদের গৃহসমূহ থেকে বের হয়েছে মৃত্যুর ভয়ে এবং তারা ছিল হাজার-হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা মরে যাও'! তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তো মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া আদায় করে না।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই লোকগুলো সংখ্যায় চার হাজার ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা ছিল আট হাজার। কেউ বলেন ন'হাজার, কেউ বলেন চল্লিশ হাজার এবং কেউ ত্রিশ হাজারের কিছু বেশী বলে থাকেন। এরা যাওয়ারদান' নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল যা ওয়াসিতের দিকে রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তারা আযরাআত নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল। তারা প্লেগের ভয়ে নিজেদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা একটি গ্রামে এসে উপস্থিত হলে আল্লাহর নির্দেশক্রমে সবাই মারা যায়।

ঘটনাক্রমে একজন নবী সেখান দিয়ে গমন করেন। তাঁর প্রার্থনার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনর্জীবিত করেন। কেউ কেউ বলেন যে, তারা একটি জনশূন্য নির্মল বায়ুযুক্ত খোলা মাঠে অবস্থান করেছিল। অতঃপর তারা দু'জন ফেরেশতার চিৎকারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তাদের অস্থিগুলোও চুনে পরিণত হয়। সেই জায়গায় জনবসতি বসে যায়।

একদা হিযকীল নামে বানী ইসরাঈলের একজন নবী সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাদের পুনর্জীবনের জন্যে প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন : "তুমি বল- "হে গলিত অস্থিগুলো! আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে তোমরা একত্রিত হয়ে যাও। অতঃপর প্রত্যেক শরীরের অস্থির কাঠামো দাঁড়িয়ে গেল। এরপর তার উপর আল্লাহর নির্দেশ হলো : তুমি বল হে অস্থিগুলো! আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তোমরা গোশত, শিরা ইত্যাদিও তোমাদের উপর মিলিয়ে নাও।'

অতঃপর ঐ নবীর (আঃ) চোখের সামনে এটাও হয়ে গেল। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে আত্মাগুলোকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আত্মাসমূহ! তোমরা আল্লাহ তাআলার হুকুমে পূর্বের নিজ নিজ দেহের ভিতর প্রবেশ কর। সঙ্গে সঙ্গে যেমন তারা এক সাথে সব মরে গিয়েছিল তেমনই সবাই এক সাথে জীবিত হয়ে গেল এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাদের মুখে উচ্চারিত হলোঃ

سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ অর্থাৎ আপনি পবিত্র। আপনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই।' কেয়ামতের দিন ঐ দেহের সঙ্গেই দ্বিতীয়বার আত্মার উত্থিত হওয়ার এটা দলীল।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে প্রথমতঃ এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত মৃত্যু থেকে পলায়ন করে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা পুনরায় সৃষ্টি করার ওপর ক্ষমতাবান। তিনি সমস্ত মানুষকে সেভাবে জীবিত করবেন যেমন তাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন।

পর্ব ১৮: যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতা

🔶সূরা কামারঃ আয়াত ৪৫
🔶সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১২৩-১২৬

"এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে।

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, 'তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে তিন হাজার নাযিলকৃত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন'? হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তা কেবল সুসংবাদস্বরূপ নির্ধারণ করেছেন এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

মুসলিমরা কুরাইশদের নিরস্ত্র বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর আক্রমণ করার জন্য বদরের দিকে যাত্রা করেছিল। বদর পৌঁছে তারা জানতে পারল মক্কা থেকে মুশরিকরা একদল সৈন্য নিয়ে আগমন করছে। এ কথা শুনে মুসলিমদের মধ্যে হতবুদ্ধিতা ও অস্থিরতা বিরাজ করে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করলেন। ফলে প্রথমে এক হাজার, পরে তিন হাজার এবং শেষে পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন এ শর্তে যে, যদি ধৈর্য ও তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন।আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ফেরেশতাদেরকে অবতীর্ণ করা এবং তোমাদেরকে এর সুসংবাদ দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও তোমাদের মনে শান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি ফেরেশতা অবতীর্ণ না করেও এবং তোমাদের যুদ্ধ ছাড়াও তোমাদেরকে জয়যুক্ত করতে পারেন। সাহায্য শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই এসে থাকে।

পর্ব ১৯ তীহ ময়দান

🔶সূরা মায়িদাহঃ আয়াত ২৬

তিনি বললেন, 'তাহলে নিশ্চয় তা তাদের জন্য চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ; তারা যমীনে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে। সুতরাং তুমি ফাসিক কওমের জন্য আফসোস করো না'।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মূসা (আঃ)-এর সময়ের কথা স্মরণ করতে বলছেন যখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতিকে ফির'আউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিযার্তন ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলেন। তারা মুক্তি পাবার পর তাদের মাতৃভূমি বাইতুল মুক্কাদ্দাস ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা দখলে আনার জন্য বের হয়েছিল, তাদের মাতৃভূমি থেকে শত্রুদেরকে হটানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর জিহাদ ফরয করে দিলেন। সে সময় মূসা (আঃ) জাতিকে নসিহত করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যাতে তারা জিহাদে বের হয়।

'তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর' অর্থাৎ মূসা (আঃ) বললেন: তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ কর আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করো না। বাণী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ৪৯-৫৭ নং আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে।

'যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে নাবী করেছিলেন'অর্থাৎ বানী ইসরাঈলের যে সকল নেয়ামত দান করা হয়েছে, তার অন্যতম হল ধারাবাহিকভাবে তাদের মধ্য থেকে নাবী রাসূলগণের আগমন। এ সকল নাবী-রাসূল তাদেরকে হিদায়াত ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করতেন এবং অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

বানী ইসরাঈলের মাঝে ধারাবাহিকভাবে নাবীগণ আগমন করেছেন, যখনই কোন নাবী মারা গেছেন তখনই আরেকজন নাবী এসেছেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নাবী আসবে না। তবে অনেক খলীফা হবে। (সহীহ বুখারী হা: ৩৪৫৫) আর তাদেরকে আধিপত্য ও তৎকালীন পৃথিবীর এমন সব জিনিস দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে প্রদান করেননি।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমাদেরকে বাদশা বানিয়েছেন, এর অর্থ হল: একজন খাদেম, স্ত্রী ও বাড়ি দিয়েছেন। কেননা যার খাদেম, স্ত্রী ও বাড়ি আছে তাকে বাদশা বলা হয়। (তাবারী ৯/১০৬)

তাছাড়া যখন ফির'আউনের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেল তখন তাদের সব কিছুর মালিকানা ফিরে পেল, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেল এবং নিজেদের দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি বানী ইসরাঈলকে কিতাব (তাওরাত) বিধান ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক ও বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।" (সূরা জাসিয়া ৪৫:১৬)

এসব নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে পবিত্র ভূমি উদ্ধারের জন্য জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন। পবিত্র ভূমি বলতে কেউ বলেছেন, তুর পাহাড় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, কেউ বলেছেন, আরিহা। তবে অধিকাংশরাই বলেছেন, বাইতুল মুক্কাদ্দাস। বাইতুল মুক্কাদ্দাস ইয়া'কূব (আঃ)-এর আবাসস্থল। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) মিসরের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা সকলেই মিসরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। পরিশেষে মূসা (আঃ) ফির'আউনের কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য গোপনিয়ভাবে রাতারাতি বানী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসরে চলে আসেন।

সে সময় বাইতুল মুক্কাদ্দাস আমালিকা জাতির শাসনে ছিল। যারা বীর বাহাদুর ছিল। যখন মূসা (আঃ) বাইতুল মুক্কাদ্দাস গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন আমালিকা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যোঘণা করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ ফরয করে দিলেন এবং এ জিহাদে পিছপা হতে বারণ করলেন। সাথে সাথে সুসংবাদ দিলেন যে, (الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ) এ ভূমির তোমরাই উত্তরাধিকারী হবে এ ওয়াদা বানী ইসরাঈলেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন। সুতরাং তোমরা বিজয়ী হবে। কিন্তু তারপরেও মূসা (আঃ)-এর সাথে তাঁর সম্প্রদায় এ বেআদবীপূর্ণ আচরণ করল। তারা অবাধ্য হয়ে গেল।

'যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে।' অর্থাৎ তারা বলল: শক্তিশালী আমালিকা জাতি সেখান থেকে বের না হলে আমরা সেখানে প্রবেশ করব না।

'যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল 'ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: তারা হলেন, ইউশা বিন নূন ও কালিব বিন ইউফানা। (ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর) অর্থাৎ তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করল যে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা দিয়েছেন সুতরাং যাও, জিহাদ কর, তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা উচিত।

কারণ, তোমরা কোন্ জাতি বা শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করছ সেটা লক্ষ্য করার বিষয় নয়, বরং ঈমান ও ভরসা নিয়ে জিহাদ করলে অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।

এ উম্মতকেও আল্লাহ তা'আলা সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর তোমরা হীনবল ও দুঃখিত হয়ো না বস্তুত যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে। (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৩৯)

সুতরাং মুসলিমরা যদি সঠিক ঈমান ও আমলের ওপর অটল থাকে তাহলে পৃথিবীর যত বড় পরাশক্তিই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করবেন।

তারপরেও তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে গেল। তারা বলল: 'অতএব তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং দু'জনে লড়াই কর' অর্থাৎ তাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরেও তারা কাপুরুষতা, অবাধ্যতা ও বিদ্রুপ প্রকাশ করে বলল যে, তুমি ও তোমার প্রভু যাও, যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে রইলাম।

কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীরা এরূপ ছিলেন না। বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। আবূ বকর (রাঃ) উত্তম পরামর্শ দিলেন, এভাবে সকল মুহাজির সাহাবী উত্তম পরামর্শ দিলেন। তারপর আনসারদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কারণ আনসারদের সংখ্যা বেশি ছিল।

সা'দ বিন মুয়ায (রাঃ) বললেন: হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! হয়তো আপনি আমাদের মনের ইচ্ছা জানতে চাইছেন। তাহলে শুনুন! যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ করে বলছি: আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা আপনার কথামত নির্দ্বিধায় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনি দেখবেন যে, একজন ব্যক্তিও তীরে দাঁড়িয়ে নেই। আপনি আগ্রহের সাথে আমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলার জন্য নিয়ে চলুন।

আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে স্থির পদে টিকে থাকবো তা আপনি দেখতে পাবেন। আপনি আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে চলুন; আমাদের বীরত্ব ও ধৈর্য দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে ইনশা-আল্লাহ।

আমরা সেরূপ কথা বলব না যেমন বানী ইসলাঈল মূসা (আঃ)-কে বলেছিল যে, "অতএব তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং দু'জনে লড়াই কর, আমরা এখানেই বসে রইলাম।" (ইবনু হিশাম ২/২১৯)

‘তাদের জন্য এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবৈধ করা হল দেশ বলতে তীহ ময়দানকে বুঝানো হয়েছে। তাদের এরূপ আচরণের কারণে তীহ ময়দানে চল্লিশ বছর উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি বদ্ধমূল করে দিলেন। এরপরেও এ ময়দানে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করা হয়।

মূলত তাদেরকে কোন প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করা হয়নি এবং হাত পায়ে শিকল দ্বারা বাধাও ছিল না। বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা নিজ দেশ মিসরে ফিরে আসার জন্য প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ চলত কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত যেখান থেকে রওয়ানা করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মূসা (রহঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এ অবাধ্য জাতির জন্য কোন দুঃখ কর না। এ তীহ প্রান্তরে মূসা ও হারুন (আঃ) ইন্তিকাল করেন। তারপর ইউশা বিন নূনের নেতৃত্বে বায়তুল মুক্বাদ্দাস জয় করে।

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. পূর্ববর্তী নাবীদের সাথে তাদের উম্মাতের লোকেরা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিল।

২. নাবীদের অনুসরণে রয়েছে সফলতা। আর বিরোধীতায় রয়েছে অকল্যাণ।

৩. প্রত্যেক যুগেই সৎ ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল।

৪. পাপাচারীদের ওপর শাস্তি নেমে আসলে তাতে আফসোস করা অনুচিত।

৫. মু'মিনরা ঈমানে ও আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসায় অটল থাকলে যেকোন শক্তিশালী জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করে বিজয়ী হবে ইনশা-আল্লাহ।

পর্ব ২০ একটি গাভীর গল্প

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ৬৭-৭৩

৬৭ থেকে ৭৩ নং আয়াতের তাফসীর:

মুসনাদ ইবনু আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একটি ধনী লোক ছিল, যার কোন সন্তান ছিল না। তার উত্তরাধিকারী ছিল তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র। সত্বর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির আশায় সে তার চাচাকে হত্যা করে ফেলে এবং রাতে তাদের গ্রামের একটি লোকের দরজার ওপরে রেখে আসে এবং সকালে গিয়ে ঐ লোকটির ওপর হত্যার অপবাদ দেয়। অবশেষে এর দলের ও ওর দলের লোকেদের মধ্যে মারামারি ও খুনাখুনি হওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় তাদের জ্ঞানী লোকেরা তাদেরকে বলেন: তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ) বিদ্যমান থাকতে তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে কেন? সুতরাং তারা মূসা (আঃ)-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করে।

তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদেরকে বলেন:
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً)
"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা একটি গরু 'যবেহ'কর।"একথা শুনে তারা বলল:
(أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا)
"তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ?" তখন মূসা (আঃ) বললেন:
(قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ)
"আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আমি মূর্খদের অন্তর্গত না হই।"

তখন যদি তারা যেকোন একটি গরু যবাই করত তাহলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু তারা বিভিন্ন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কাঠিন্য অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তা'আলাও তাদের ওপর তা কঠিন করে দিলেন। তারপর তারা ঐরূপ গরু একটি লোকের নিকট পেল। যা তার কাছে ব্যতীত অন্য কারো নিকট ছিল না। লোকটি বলল: আল্লাহ তা'আলার শপথ! এ গরুর চামড়া পূর্ণ স্বর্ণের কম মূল্যে আমি বিক্রয় করব না। সুতরাং তারা ঐ মূল্যেই তা কিনে নেয় এবং যবেহ করে।

তারপর তারা ঐ যবেহকৃত গরুর একখণ্ড গোশত দ্বারা ঐ মৃত ব্যক্তির ওপর আঘাত করে। তখন মৃতলোকটি দাঁড়িয়ে যায়। লোকগুলো তাকে জিজ্ঞাসা করে: তোমাকে কে হত্যা করেছে? সে বলল: "আমার এ ভ্রাতুষ্পুত্র।" একথা বলেই সে পুনরায় মারা যায়। ফলে তাকে মৃত ব্যক্তির কোন সম্পদ দেয়া হয়নি। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/২৮৫)

এ আয়াতে বানী ইসরাঈলকে লক্ষ করে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার এ নেয়ামতকে ভুলে না যায়, তিনি এমন এক স্বভাব বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটালেন যার ফলে গরুর এক টুকরা গোশতের দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করায় সে জীবিত হয়ে যায় এবং সে তার হত্যাকারীর নাম বলে দেয়। ফলে একটি বড় বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সতর্ক করলেন যে, "এরূপে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।" সুতরাং আমাদের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কর্ম আল্লাহ তা'আলা জানেন ও দেখেন। তাঁকেই ভয় করে আমাদের সকল অপকর্ম বর্জন করা উচিত।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলা যে বিধান দেন তা মাথা পেতে নেয়া অবশ্য কর্তব্য, আর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হারাম।

২. শরয়ী বিধান পাওয়ার পর অহেতুক প্রশ্ন করা নিষেধ, এতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়।

৩. আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উক্ত ব্যক্তিকে যেমন মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন আমাদেরকেও তেমন মৃত্যুর পর জীবিত করবেন।

পর্ব ২১ হাজার হাজার মানুষের বানরে রূপান্তরিত হওয়া

🔶সূরা বারাকাহঃ আয়াত ৬৫

আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকে অবশ্যই তোমরা জান। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও'।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

শনিবারের অবাধ্যতার ঘটনার কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ইয়াহূদীদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করে দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আ'রাফে বিস্তারিতভাবে বলেন:

"তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তারা শনিবারে সীমালংঘন করত, শনিবার উদ্যাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত। কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্যাপন করত না সেদিন তারা তাদের নিকট আসত না।

এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম, যেহেতু তারা সত্যত্যাগ করত। স্মরণ কর, তাদের এক দল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে উপদেশ দাও কেন?'তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এজন্য', যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেটা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎ কার্য হতে নিবৃত্ত হত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা জুলুম করে তারা কুফরী করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেই।

তারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্যসহকারে করতে লাগল তখন তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।"(সূরা আ'রাফ ৭:১৬৩-১৬৬)

ঐ লোকগুলো আইলা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিল। শনিবার দিনের সম্মান করা তাদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। তাদের জন্য ঐদিনে শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। আর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সেই দিনেই নদীর ধারে মাছ খুব বেশি আসত, তাই তারা একটা কৌশল অবলম্বন করত। ঐ অপরাধের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের আকৃতি বদলে দেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যুবকরা বানর হয়েছিল এবং বয়স্করা শূকর হয়েছিল।

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন: নারী-পুরুষ সবাই লেজযুক্ত বানর হয়ে গিয়েছিল। আকাশ থেকে ঘোষণা আসে:

"তোমরা সব বানর হয়ে যাও।" যারা তাদেরকে ঐ কৌশল অবলম্বন করতে নিষেধ করেছিল, তারা তখন তাদের নিকট এসে বলতে থাকে: আমরা কি তোমাদেরকে পূর্বেই নিষেধ করিনি? তখন তারা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: অল্প সময়ের মধ্যে তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়নি। দুনিয়ায় কোন আকার পরিবর্তিত গোত্র তিন দিনের বেশি বাঁচেনি।

এরাও তিন দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। নাক ঘষতে ঘষতে তারা সব মারা যায়। পানাহার ও বংশ বৃদ্ধি সবই বিদায় নেয়।

যে বানরগুলো এখানো আছে এরা তো জন্তু এবং এরা এভাবেই সৃষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যা চান এবং যেভাবে চান তাই সৃষ্টি করেন এবং সেভাবেই সৃষ্টি করেন।

🔶ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা: ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: শুক্রবারের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা তাদের ওপর ফরয করা হয়, কিন্তু তারা শুক্রবারের পরবর্তীতে শনিবারকে পছন্দ করে। ঐ দিনের সম্মানার্থে তাদের জন্য ঐ দিনে মৎস শিকার হারাম করে দেয়া হয়। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা হিসেবে ঐদিনই সমস্ত মাছ নদীর ধারে চলে আসত এবং লাফ-ঝাঁপ দিত। অন্য দিনে ওগুলো দেখাই যেত না। কিছু দিন পর্যন্ত ঐসব লোক নীরবই থাকে এবং শিকার করা হতে বিরত থাকে।

একদিন ওদের মধ্যে একটি লোক এ ফন্দি বের করে শনিবার মাছ ধরে জালের মধ্যে আটকে দেয় এবং ঘাটের কোন জিনিসের সঙ্গে বেঁধে রাখে। তারপর রোববার দিন গিয়ে ওগুলো বের করে নেয় এবং বাড়িতে এনে রেখে দেয়। মাছের সুগন্ধ পেয়ে লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, "আমি তো আজ (রবিবার) মাছ শিকার করেছি। অবশেষে এ রহস্য প্রকাশ হয়ে যায়।

লোকেরাও ঐ কৌশল পছন্দ করে এবং ঐভাবে তারা মাছ শিকার করতে থাকে। এর এক পর্যায়ে দেখা গেল যে, ঐ অবাধ্য লোকেদের নারী-পুরুষ সবাই নিকৃষ্ট বা লাঞ্ছিত বানর হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

আর আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে ঐ সময়কার ও তৎপরবর্তী সকল লোকেদের জন্য উপদেশস্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষ জেনে-শুনে আল্লাহ তা'আলার বিধান অমান্য না করে এবং হালাল ও হারামকে পরিবর্তন করার জন্য কোন রকম কৌশল ও ফন্দির পথ অবলম্বন না করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইয়াহূদীরা যা করেছিল তোমরা তা করো না। ফন্দি করে হারামকে হালালরূপে গ্রহণ করো না। অর্থাৎ শরীয়তের নির্দেশাবলীতে ফন্দি ও কৌশল হতে বেঁচে থাক। (ইরওয়াউল গালীল হা: ১৫৩৫)

সুতরাং আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যাতে মাযহাব বা দলের মতের সাথে না মিলের কারণে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কোন বিধানকে পরিবর্তন করার অপপ্রয়াস না চালাই।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইয়াহূদীরা আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ অমান্য করার অপকৌশল গ্রহণ করার কারণে তাদের ওপর আপতিত শাস্তির কথা জানলাম।
২. শরীয়তের বিধানকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা ইয়াহূদীদের কাজ।
৩. বিজ্ঞানী ডারউনের অভিমত (বানর থেকে মানুষের সৃষ্টি) সঠিক নয়, কারণ এ আয়াত থেকে জানতে পারলাম তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়নি, দুনিয়ায় তারা তিন দিনের বেশি বাঁচেনি।

পর্ব ২২ হযরত ইবরাহিম (আ) এর একত্ববাদের ঘোষনা

🔶সূরা আনআমঃ আয়াত ৭৬-৭৯

তারপর রাত যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি তারকা দেখে বললেন, এ আমার রব। তারপর যখন সেটা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না। অতঃপর যখন সে চাঁদ উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, ‘এ আমার রব’। পরে যখন তা ডুবে গেল, বলল, ‘যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয় আমি পথহারা কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’। অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, ‘এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়’। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা যা শরীক কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত’। আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়, যেমনিভাবে মূর্তি ও প্রতিমা উপাস্যের যোগ্য নয়।

এক রাতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন তিনি স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন, এ নক্ষত্র আমার রব। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের রব।

কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে বললেন, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালোবাসি না। যে বস্তু ইলাহ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোনো রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন, (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার রব। চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার রব আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই নিজের পালনকর্তা এবং উপাস্য মনে করে বসতাম।

কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এটিও আরাধনার যোগ্য নয়। এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার রব অন্য কোনো শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন, (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার রব এবং এটি বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জীবকেই আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত।

বরং সেই সত্তা আমাদের সবার রব, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি আমার চেহারা তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ফিরিয়ে আল্লাহর দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় মুশরিক বা অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

ইবরাহীম (আঃ) "উলুল আযম" বা দৃঢ় প্রত্যয়শীল রাসূলদের একজন, কিন্তু তাঁর পিতা একজন মুশরিক। পিতাকে তিনি খুব শ্রদ্ধা ও নরম ভাষায় তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "স্মরণ কর, এ কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ একজন নাবী। যখন তার পিতাকে বলেছিল: হে আমার পিতা! তুমি কেন এমন বস্তুর ইবাদত কর যা শোনে না, দেখে না আর তোমার কোন কাজে আসে না। যখন সে তার পিতাকে বলল: 'হে আমার পিতা! আমার নিকট এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত কর না, নিশ্চয়ই শয়তান দয়ালু আল্লাহর অবাধ্য। 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে, তখন তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু।' পিতা বলল: 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও।'(সূরা মারইয়াম ১৯:৪১-৪৬)

অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-এর রবের পরিচয় লাভের ঘটনা তুলে ধরেছেন। যখন তিনি প্রকৃত মা'বূদ চিনতে পারেননি তখন বিভিন্ন মাখলুককে রব মনে করেছিলেন তারপর আল্লাহ তা'আলার কৃপায় সঠিক মা'বূদকে চিনতে সক্ষম হয়েছেন।

সুতরাং একজন মানুষ না জেনে ইবাদত করবে তা ইসলামের নির্দেশ নয় বরং প্রথমে জানবে বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার হক কী, কিভাবে সে হক আদায় করতে হবে, তারপর ইবাদত করবে।

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শির্ক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, যদিও নিকটাত্মীয় হয়।
২. আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন, তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে হিদায়াত চাইতে হবে।
৩. সৃষ্ট বস্তু দ্বারা স্রষ্টাকে চেনা যায়।

পর্ব ২৩: ফিরাউনের উপর ৫ টি অনবরত আযাব

🔶সূরা আরাফঃ আয়াত ১৩৩-১৩৬

সুতরাং আমি তাদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত নিদর্শনাবলী হিসাবে পাঠালাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। তার পরেও তারা অহঙ্কার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী কওম।

আর যখন তাদের উপর আযাব পতিত হল তখন তারা বলল, ‘হে মূসা আমাদের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে দুআ কর তিনি যে ওয়াদা তোমার সাথে করেছেন সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং অবশ্যই তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দেব।’

অতঃপর যখনই আমি তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম কিছু কালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, ফলে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং এ সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল ।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

ফিরআউনের জাদুকরদের সাথে সংঘটিত সে ঐতিহাসিক ঘটনার পরও মূসা 'আলাইহিস সালাম দীর্ঘ দিন যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর বাণী শুনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহবান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফিরআউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। আলোচ্য আয়াতে এই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এই নয়টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম দুটি অর্থাৎ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের শুভ্রতা ফিরআউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে মূসা আলাইহিস সালাম জয়লাভ করেন। তারপরের একটি নিদর্শন যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে তা ছিল ফিরআউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন।

যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে

মুক্তিলাভের দোআ করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে, তা হল আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে আরো ছয়টি এমন নিদর্শন দেন যার উদ্দেশ্য ছিল ফিরআউনের সম্প্রদায়কে সৎপথে নিয়ে আসা। আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুন পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এতে ফিরআউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে।

এসব আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই মূসা আলাইহিস সালামের কাছে পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেলে মূসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনবে। মূসা আলাইহিস সালাম দোআ করলেন, ফলে তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহর আযাব চেপে থাকে, তাদের বুদ্ধি বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করল।

এত বড় বড় নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনার জন্য ও গাফিলতির ঘুম হতে জাগার জন্য প্রস্তুত হল না। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হল। যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে।

- আমাদের জন্য চিন্তার খোরাক:

১) আমাদের উপর যখন বিপদ আসে তখন আমরা অনেক বেশি আল্লাহর ইবাদত করতে থাকি, আল্লাহকে ডাকতে থাকি। বিপদ শেষ হয়ে গেলে কেমন হয় আমাদের আচরন?

২) আমাদের সাথে ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কোন মিল কি খুঁজে পাচ্ছি? আল্লাহ মাফ করুন আমাদের। সময় থাকতে আমাদের শুধরানোর তৌফিক দিন। আমিন।

পর্ব ২৪: সালেহ (আঃ) এর উষ্ট্রী

🔶সূরা আরাফঃ আয়াত ৭৩

আর ছামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহকে (পাঠাই)। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও মাবুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল প্রমাণ এসে গেছে। এটা আল্লাহর উটনী, যা তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা এটিকে স্বাধীনভাবে আল্লাহর জমিতে (চরে) খেতে দাও এবং একে কোন মন্দ ইচ্ছায় স্পর্শ করো না। পাছে কোনও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করে।

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

ছামুদও ছিল আদ জাতিরই বংশধর। দৃশ্যত হযরত হুদ আলাইহিস সালাম ও তাঁর যে সকল সঙ্গী আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল, এরা তাদেরই আওলাদ ছিল। ছামুদ তাদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নাম। তাই এ জাতিকে দ্বিতীয় আদও বলা হয়ে থাকে। আরব ও শামের মধ্যবর্তী যে অঞ্চলকে তখন 'হিজর' বলা হত এবং বর্তমানে 'মাদাইনে সালিহ' বলা হয়, এ সম্প্রদায় সেখানেই বাস করত।

এখনও সে অঞ্চলে তাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। ৭৪ নং আয়াতে তাদের পাহাড় কেটে নির্মিত যে ইমারতের কথা বর্ণিত হয়েছে আজও তার ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। আরবের মুশরিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে যখন সিরিয়া অঞ্চলে যেত, এই উপদেশমূলক ধ্বংসাবশেষ তখন তাদের পথে পড়ত। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের ভেতর কালক্রমে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটেছিল এবং এর ফলে তাদের সমাজে নানা রকম অন্যায়-অপরাধ বিস্তার লাভ করেছিল।

হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম ছিলেন এ জাতিরই একজন লোক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর লক্ষ্যে তাকে নবী করে পাঠান। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। কওমের অধিকাংশ লোকই তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম যৌবন থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তাদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করে যেতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত তারা দাবী করল, আপনি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে আপনি এই পাহাড় থেকে কোনও উটনী বের করে আমাদের সামনে উপস্থিত করুন। এটা করতে পারলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়ায় পাহাড় থেকে একটি উটনী বের করে দেখালেন। তা দেখে কিছু লোক তো ঈমান আনল, কিন্তু তাদের বড় বড় সর্দার কথা রাখল না। তারা যে তাদের জেদ বজায় রাখল তাই নয়, বরং অন্য যেসব লোক ঈমান আনতে ইচ্ছুক ছিল তাদেরকেও নিবৃত্ত করল।

হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের আশংকা হল, ওয়াদা ভঙ্গের কারণে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার কোন আযাব এসে যেতে পারে। তাই তাদেরকে বললেন, তোমরা অন্ততপক্ষে এই উটনীটির কোনও ক্ষতি করো না। তাকে স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে খেতে দাও। উটনীটির পূর্ণ এক কুয়া পানি দরকার হত। তাই তিনি পালা বণ্টন করে দিলেন যে, একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন এলাকার লোকে।

কিন্তু কওমের লোক গোপনে চক্রান্ত করল। তারা ঠিক করল উটনীটিকে হত্যা করবে। পরিশেষে 'কুদার' নামক এক ব্যক্তি সেটিকে হত্যা করল। এ অবস্থায় হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, এখন শাস্তি আসতে মাত্র তিন দিন বাকি আছে। অতঃপর তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আরও আছে, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে, এই তিন দিনের প্রতিদিন তাদের চেহারার রং পরিবর্তন হতে থাকবে।

প্রথম দিন চেহারার রং হবে হলুদ, দ্বিতীয় দিন লাল এবং তৃতীয় দিন সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও জেদী সম্প্রদায়টি তাওবা ও ইস্তিগফারে রত হল না; বরং তারা হযরত সালিহ আলাইহিস সালামকেই হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল, যা সূরা নামলে (২৭ : ৪৮) বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পথেই ধ্বংস করে দেন। ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্য দিকে হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম যেমন বলেছিলেন, সেভাবেই তাদের তিন দিন কাটে। এ অবস্থায়ই প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়।

সেই সাথে আসমান থেকে এক ভয়াল শব্দ আসতে থাকে এবং তাতে গোটা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৬১), সূরা শুআরা (২৬ : ১৪১), সূরা নামল (২৭ : ৪৫) ও সূরা কামারে (৫৪ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সূরা হিজর, সূরা যারিয়াত, সূরা নাজম, সূরা হাক্কা ও সূরা শামসেও তাদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

পর্ব ২৫: আদ সম্প্রদায়ের উপর ঝড় তুফান

🔶সূরা হাক্কাহঃ আয়াত ৬-৮

আর আদ জাতি (এর বৃত্তান্ত হল), তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।

তিনি তাদের উপর তা সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে সেখানে লুটিয়ে পড়া অবস্থায় দেখতে পেতে যেন তারা সারশূন্য খেজুর গাছের মত।

তারপর তুমি কি তাদের জন্য অবশিষ্ট কিছু দেখতে পাও?

🔶আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় এরূপ বর্ণিত আছে- "তাদের উপর আমি এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু প্রেরণ করলাম এবং যাদের উপর দিয়ে ওটা বয়ে গেল তাদের সবকেই তছনছ করে দিলো।"

যেমন অন্য একটি আয়াতে আছে- "আর আ'দ সম্প্রদায়কে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছে। যে বায়ুকে আল্লাহ সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত তাদের উপর একাধারে চাপিয়ে রেখেছিলেন, অতএব, তুমি ঐ সম্প্রদায়কে ওতে এমনভাবে ভূপতিত দেখতে পেতে, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ। সুতরাং তাদের কাউকেও কি তুমি অবশিষ্ট দেখতে পাও?"

তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের উপর এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তা প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ঐ বায়ু তাদেরকে আকাশে নিয়ে উড়তেছিল এবং পরে মাথার ভরে যমীনে নিক্ষেপ করে দিচ্ছিলো। ফলে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলো।

এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তারা সেই খেজুর গাছের কাণ্ডের মত হয়ে গিয়েছিল যেগুলো সম্পূর্ণরূপে ডাল-পাতা শূন্য ছিল। ঐ লোকগুলো ইয়ামানে আম্মান ও হারামাউতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো। তাছাড়া তারা সারা দুনিয়ায় দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা শক্তির দাপটে জনগণের উপর অত্যাচার চালাতো।

তারা মূর্তিপূজা করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হূদ (আঃ)-কে পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে নেয় এবং তার সাথে কাউকে শরীক না করে। আর তারা যেন লোকদের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতঃ বলে- "আমাদের অপেক্ষা বড় শক্তিশালী আর কে আছে?"

অন্যান্য লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে। হুদ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। যখন আ'দ সম্প্রদায় এরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে শুরু করে, আর বিনা প্রয়োজনে বড় বড় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে, তখন হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমরা সব জায়গায় বিনা প্রয়োজনে ঘরবাড়ী নির্মাণ করছে এবং ওগুলোকে এতো মজবুত করে তৈরী করছো যে, মনে হচ্ছে তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে!

যখন তোমরা কারো উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হচ্ছে তখন তার সাথে অত্যন্ত কঠোরতাপূর্ণ ব্যবহার করছো! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।" তারা তখন তাকে বললোঃ "হে হূদ (আঃ)! তুমি প্রমাণবিহীন কথা বলছো। তোমার কথায় আমরা আমাদের মাবুদদের ছেড়ে দিতে পারি না এবং তোমার উপর ঈমানও আনব না। আমাদের তো ধারণা হচ্ছে যে, তোমার উপর আমাদের কোন মা'বুদের গযব পতিত হয়েছে, ফলে তুমি পাগল হয়ে গেছো।"

হুদ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমি তোমাদের শিরকযুক্ত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখন তোমরা সবাই মিলে আমার সাথে যা কিছু ছল-চাতুরী করতে চাও কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না।

আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করছি। তিনি আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমার প্রতিপালক যা কিছু বলেন ঠিকই বলেন।"

ঐ লোকগুলো যখন কুফরীর উপর অটল থাকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তিন বছর পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ রাখলেন। তারা তখন কঠিন বিপদে পতিত হলো। যখন তারা কোন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতো তখন সেই বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা জানাতো।

ঐ সময় তারা কাউকে বায়তুল্লাহ শরীফে পাঠিয়ে দিতো। ঐ যুগে তাদের গোত্রের আমলীক নামে পরিচিত কতকগুলো লোক মক্কায় বসবাস করছিল। তারা ছিল আমালীক ইবনে লাও ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধর।

মুআবিয়া ইবনে বকর নামক একটি পোর্ক ছিল তাদের নেতা। তার মা ছিল আ'দ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তার নাম ছিল জুলহিয়া । সে ছিল খাবীরীর কন্যা। যা হাক, আ'দ

সম্প্রদায় সত্তরজন লোকের এক প্রতিনিধি দলকে হারাম শরীফের দিকে পাঠিয়ে দিলো, যেন তারা কা'বাতুল্লাহয় গিয়ে পানি বর্ষণের জন্যে প্রার্থনা করে। ঐ লোকগুলো মক্কার বাইরে তাদের গোত্রীয় লোক মুআবিয়ার নিকট অবস্থান করে। এক মাস পর্যন্ত তারা তার কাছেই অবস্থান করতে থাকে।

তারা সেখানে মদ্যপান করতে এবং মুআবিয়ার দু'জন গায়িকা দাসীর গান শুনতো। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে তাদের অবস্থান মুআবিয়ার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অতিথিদেরকে বিদায় হয়ে যাওয়ার কথা বলতে সে লজ্জাবোধ করছিল। অবশেষে সে কতকগুলো ছন্দ রচনা করলো এবং ওগুলো তাদের সামনে গায়িকাদেরকে গাইতে বললো। ছন্দগুলোর অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"হে কায়েল! তোমার উপর আফসোস! যাও, প্রার্থনা কর। হয়তো আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণের জন্যে মেঘ পাঠাবেন। ফলে আ'দ সম্প্রদায়ের ভূমি অদ্র ও সতেজ হয়ে উঠবে।

কেননা, আ'দ সম্প্রদায়ের অবস্থা তো এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা ভালভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। পিপাসায় এখন তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ। বুড়ো ও যুবক কারো জীবনের আশা নেই। তাদের মহিলাদেরও অবস্থা ভাল নয়। ক্ষুধা ও পিপাসায় এখন তাদের চলৎশক্তি রহিত। বন্য জন্তু গুলো অতি সহজেই তাদের বস্তিতে ঢুকে পড়েছে।

কেননা, আ'দ সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের এখন কোন ভয় নেই যে, তারা ওদেরকে তীর মেরে হত্যা করবে। কারণ, এখন তাদের তীর চালাবার শক্তিও নেই। সুতরাং জেনে রেখো যে, তাদের এখন দিবস ও রজনী শেষ হয়েই গেছে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল তোমাদের ন্যায় এতো নিষ্ঠুর হতে পারে না।

তোমাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হাক!" একথা শুনে ঐ প্রতিনিধি দলের লোকদের চৈতন্য ফিরলো। তারা কাবা ঘরে গিয়ে কওমের জন্যে প্রার্থনা করতে শুরু করলো। ঐ প্রতিনিধি দলের নেতার নাম ছিল কায়েল। আল্লাহর হুকুমে তিন খণ্ড মেঘ প্রকাশিত হলো। এক খণ্ড সাদা, এক খণ্ড কালো এবং এক খণ্ড লাল। আকাশ থেকে একটা শব্দ শোনা গেল- "নিজের কওমের জন্যে এই তিন খণ্ড মেঘের যে কোন একখণ্ড পছন্দ করে নাও।"

কায়েল বললোঃ "আমি কালো মেঘখণ্ডই পছন্দ করলাম। কালো মেঘ থেকেই অধিক বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে।" পুনরায় শব্দ আসলো-"তুমি তো ভষ্ম ও মাটিকে পছন্দ করলে। আ'দ সম্প্রদায়ের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

এ মেঘ তো পিতাকে ছাড়বে না এবং পুত্রকেও ছাড়বে না, বরং সবকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আ'দ সম্প্রদায়ের বানী আযিয়া গোত্র নিরাপত্তা লাভ করবে।" আ'দ সম্প্রদায়ের এ

গোত্রটি মক্কায় অবস্থান করছিল। তারা শাস্তির কিছুই টের পায়নি। আ'দ সম্প্রদায়ের সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যারা রক্ষা পেয়েছিল তারা ছিল এই বানী আযিয়া গোত্রেরই লোক। এর বংশ ও সন্তানদের মধ্য থেকে ঐ কওম অবশিষ্ট থাকে যাদেরকে আ'দে সানী' বা দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়।

কথিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটা কলো মেঘখণ্ড পাঠিয়েছিলেন যাকে কায়েল পছন্দ করেছিল এবং এটাই ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। ঐ মেঘখণ্ডটি মুগীস নামক একটি উপত্যকা হতে উঠেছিল। জনগণ ওটা দেখে খুব খুশী হয় এবং বলে- "এটা তো বর্ষণকারী মেঘ।" আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "প্রবল ঝটিকা এই মেঘ বয়ে নিয়ে আসে। এরই মধ্যে ছিল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যা সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেয়। এই মেঘের মধ্যে একটি জিনিস সর্বপ্রথম যে দেখেছিল, সে ছিল একটি মহিলা। তার নাম ছিল মুমীদ।

সে মেঘের মধ্যে যা দেখেছিল তা দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে সে বলেঃ "এই মেঘের মধ্যে আগুনের শিখা ছিল। কতকগুলো লোককে দেখা যাচ্ছিল যারা ঐ শিখাগুলো টেনে আনছিল।" সাতরাত ও আটদিন পর্যন্ত ঐ মেঘ হতে পানি বর্ষিতে থাকে। আ'দ সম্প্রদায়ের এমন লোক অবশিষ্ট ছিল না যে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

হূদ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ এখান থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং একটি শস্যক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিলেন। ঠাণ্ডা বায়ু তাদের দেহ স্পর্শ করছিল এবং তাদের আত্মাকে সতেজ ও পরিতৃপ্ত রাখছিল। কিন্তু আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি ঐ মেঘ ঝটিকা পাথর বর্ষণ করছিল। তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ ঘটনার বর্ণনা খুবই দীর্ঘ এবং এর রচনাভঙ্গীও বেশ বিস্ময়কর। এর থেকে কয়েকটি ফলাফলও বের হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার আযাব যখন এসে পৌঁছেই গেল তখন আমি হূদ (আঃ)-কে এবং তার সঙ্গীয় মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তারা নিরাপদে থাকলো।"

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শির্ক, অন্যায়-অবিচার ও অহংকার প্রদর্শন করাই হল আল্লাহ তা'আলার গযবের প্রধান কারণ।

২. আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত গযব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; তা মোকাবেলা করার কেউ নেই। অনেকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকেই উপেক্ষা করা হয় যা ঈমানের পরিপন্থী।

পর্ব ২৬: উল্টে যাওয়া শহরের গল্প

লূত (আঃ) এর কওম সমকামী ছিল। তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা লূত (আঃ) কে তাদের নিকট প্রেরন করেন। তারা অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। তারপর আল্লাহ তাদের আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন। তাদের জমিন সহ পুরো উল্টে দেন। এ ঘটনা কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এসেছে।

🔶সূরা শুআরা ১৬৫-১৭৫ নং আয়াতের তাফসীরঃ

হযরত লূত (আঃ) তাঁর কওমকে এই বিশেষ নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে গিয়ে বলেনঃ “তোমরা তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পুষদের নিকট যেয়ো না। বরং তোমরা তোমাদের হালাল স্ত্রীদের কাছে গিয়ে তোমাদের কাম বাসনা চরিতার্থ কর, যাদেরকে মহান আল্লাহ তোমাদের জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর এ কথার উত্তরে তাঁর কওমের লোকেরা তাঁকে বললোঃ ‘হে লূত (আঃ)! তুমি যদি এ কাজ হতে বিরত না হও তবে অবশ্যই তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ “উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বললোঃ তোমরা লুত (আঃ) ও তার অনুসারীদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, তারা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।” (২৭:৫৬) তাদের এ অবস্থা দেখে হযরত লুত (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, “আমি তোমাদের এ জঘন্য কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি এ কাজ মোটেই পছন্দ করি না। আমি মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে এসব কাজ হতে মুক্তরূপে প্রকাশ করছি।'

অতঃপর হযরত লূত (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট বদদু'আ করেন এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্যে মুক্তির প্রার্থনা করেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর কওমের সাথে যোগ দিয়েছিল। তাই সেও তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যেমন সূরা আ'রাফ, সূরা হুদ এবং সূরায়ে হিজরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।লূত (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং লুত (আঃ)-এর স্ত্রীকে-সহ পাথর বৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস করে দেন। কেননা লূত (আঃ)-এর স্ত্রী ঈমান আনেনি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: “অতঃপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে ওপর নিচ করে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর কঙ্কর, যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। এটা জালিমদের হতে দূরে নয়।” (সূরা হূদ ১১:৮২-৮৩)

হযরত লূত (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে ঐ জনপদ হতে সরে পড়লেন। নির্দেশ ছিল যে, তাঁদের সেখান হতে চলে যাওয়ার পরই তাঁর কওমের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হবে, ঐ সময় তাদের দিকে ফিরেও তাকানো যাবে না। অতঃপর তাদের সবারই উপর আযাব এসে পড়ে এবং তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়।

তাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হয়। তাদের জন্যে এই প্রস্তর বৃষ্টি ছিল কতই না নিকৃষ্ট! তাদের এ ঘটনাটিও একটি শিক্ষামূলক বিষয়। এতে সবারই জন্যে উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তবে আল্লাহ যে মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

পর্ব ২৭ সামেরীর গোবৎস

🔶সূরা আরাফঃ আয়াত ১৪৮
🔶সূরা ত্বহাঃ আয়াত ৮৫

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলসহ সমুদ্র অতিক্রম করেন তখন তাদেরকে নিয়ে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে দেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি এমন এক জায়গায় পৌঁছেন যেখানে লোকেরা প্রতিমা সমূহের খাদেম হয়ে বসেছিল।

তা দেখে বানী ইসরাঈল হযরত মূসাকে(আঃ) বলেঃ "হে মূসা(আঃ) ! এদের মত আমাদের জন্যেও আপনি কোন মাবুদ নির্ধারণ করে দিন ।!"

উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তো খুবই অজ্ঞলোক। এরা তো ধ্বংস প্রাপ্ত লোক এবং তাদের ইবাদতও বাতিল।"

অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসাকে (আঃ) ৩০ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তারপর তা বাড়িয়ে দিয়ে ৪০ দিন করা হয়। তিনি দিন রাত রোযার অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর তাড়াতাড়ি তিনি তূর পর্বতের দিকে গমন করেন এবং বানী ইসরাঈলের উপর তার ভাই হারুণকে (আঃ) প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করলো কিসে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এই তো আমার পশ্চাতে তারা রয়েছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তাড়াতাড়ি করে আপনার নিকট আসলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এই জন্যে।"

তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তোমার চলে আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা গো-বংসের পূজা শুরু করে দিয়েছে। ইসরাঈলী পুস্তক সমূহে আছে যে, সামেরীর নামও হারুণ ছিল। হযরত মূসাকে (আঃ) দান করার জন্যে তাওরাতের ফলক লিখে নেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "আমি তার জন্যে ফলকে সর্ববিষয়ের বর্ণনা এবং সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলামঃ ওটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তোমার কওমকেও বলে দাও যে, তারা যেন উত্তমরূপে ওর উপর আমল করে; আমি তোমাদেরকে সত্বরই ফাসেকদের পরিণাম প্রদর্শন করবো।" (৭:১৪৫)

হযরত মূসা (আঃ) যখন নিজ কওমের শিরক পূর্ণ কাজের খবর পেলেন তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ক্রোধ ও ক্ষোভের অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসলেন। তিনি দেখতে চান যে, তার কওমের লোকেরা আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামত রাশি লাভ করার পরেও এরূপ কঠিন অজ্ঞতাপূর্ণ ও শিরকজনিত কাজ করেছে?

অতঃপর তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাঁর কওমের কাছে এসে বললেনঃ “হে আমার সম্প্রদায় তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তোমাদেরকে কি তিনি বড় বড় নিয়ামত দান করেন নাই? কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা তার নিয়ামতসমূহ ভুলে বসলে? তবে কি তোমরা চাচ্ছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে?” তার কওম তখন তার কাছে ওজর পেশ করে বললোঃ “আমরা এই কাজ নিজেদের ইচ্ছায় করি নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ফিরাউনীদের যে সব অলংকার আমাদের নিকট ছিল সেগুলি নিক্ষেপ করাই আমরা ভাল মনে করলাম। সুতরাং আমরা সবকিছুই আল্লাহর ভয়ে নিক্ষেপ করে দিলাম।”

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, স্বয়ং হযরত হারূণ (আঃ) একটি গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেন এবং বানী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন সমস্ত অলংকার ঐ গর্তে নিক্ষেপ করে। হযরত হারুণের (আঃ) ইচ্ছা ছিল যে, সমস্ত অলংকার এক জায়গায় জমা হয়ে যাবে এবং গলে গিয়ে একটা জমাট পাথরের রূপ ধারণ করবে। তারপর যখন হযরত মূসা (আঃ) ফিরে আসবেন তখন তিনি যা বলবেন তাই করা হবে।

সামেরী তাতে ঐ মুষ্টিও নিক্ষেপ করেছিল যা সে আল্লাহর দূতের নিদর্শন হতে পূর্ণ করে নিয়েছিল এবং হযরত হারূণকে (আঃ) বলেছিলঃ “আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। হযরত হারূণ (আঃ) তো আর তার মনের কথা জানতেন না, তাই তিনি প্রার্থনা করেন। সে ইচ্ছা করে যে, ওর থেকে যেন একটা গো-বৎস নির্মিত হয়ে যায় এবং ওর থেকে যেন বাছুরের মত শব্দও বের হয়। ওটা তাই হয়ে যায় এবং বানী ইসরাঈলের পরীক্ষার কারণ হয়ে দাড়ায়। এ কারণেই মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের কথা উদ্ধৃত করে বলেনঃ “সামেরীও তা নিক্ষেপ করে।

একবার হযরত হারুন (আঃ) সামেরীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। ঐ সময় সে ঐ গো-বৎসটি ঠিকঠাক করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “ওটা কি করছো?” সে উত্তরে বলেঃ “এমন জিনিস তৈরী করছি যা ক্ষতি সাধন করে, কিন্তু উপকার করে না। তিনি দুআ করেনঃ “হে আল্লাহ! তাকে আপনি এরূপই করে দিন।” অতঃপর তিনি সেখান হতে চলে যান। সামেরীর দুআ'য় ওটা গো-বৎস হয়ে যায় এবং ওর থেকে শব্দও বের হতে থাকে। বানী ইসরাঈল বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। এবং ওর পূজা করতে শুরু করে। ওর একটি শব্দের সময় তারা ওর সামনে সিজদায় পড়ে যেতো এবং আর একটি শব্দের সময় সিজদা হতে মাথা উঠাতো।

এই দলটি অন্যান্য মুসলমানদেরকেও পথ ভ্রষ্ট করতে থাকে। তারা তাদেরকে বলেঃ “আসল মা’বুদ এটাই। হযরত মূসা (আঃ) ভুল করে তার অনুসন্ধানে অন্য জায়গায় চলে গেছেন। তিনি এটা বলতে ভুলে গেছেন যে, এটাই তোমাদের মাবূ’দ।”

এ লোকগুলি খাদেমরূপে ওর সামনে বসে পড়ে। তাদের অন্তরে এর মুহব্বত জমে ওঠে। অর্থ এও হতে পারে যে, সামেরী নিজের সত্য ও সঠিক মাবুদকে এবং নিজের পবিত্র দ্বীন ইসলামকে ভুলে বসেছিল। সে এতো নির্বোধ যে, ঐ বাছুর যে একেবারে নির্জীব এটুকুও সে বুঝতে পারে নাই। ওটা তো তাদেরকে কোন কথার জবাব দিতে পারে না এবং কিছু শুনতেও পায় না। দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কাজের তার অধিকার নেই এবং লাভ ও ক্ষতি করারও তার কোন ক্ষমতা নেই।

তার থেকে যে শব্দ বের হয় ওর একমাত্র কারণ তো এই যে, তার পিছনের ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে এবং সামনের ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। ওটারই শব্দ হয়। তারা ছিল কতো নির্বোধ যে, ছোট পাপ হতে বাঁচবার জন্যে তারা বড় পাপ করে বসলো। ফিরাউনীদের আমানত হতে মুক্ত হতে গিয়ে তারা শিরক করে বসলো।

এর দৃষ্টান্ত তো এটাই হলো যে, কোন এক ইরাকবাসী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেঃ “কাপড়ে যদি মশার রক্ত লেগে যায় তবে নামায হবে কি হবে না?” তিনি উত্তরে জনগণকে বলেনঃ “তোমরা ইরাকবাসীদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা রাসূলুল্লাহর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমার (রাঃ) কলেজার টুকরা হযরত হুসাইনকে (রাঃ) হত্যা করেছে, অথচ আজ মশার রক্তের মাসআলা জিজ্ঞেস করছে!”(তাফসীর ইবন কাসীর)

পর্ব ২৮ জিহবা ঝুলে যাওয়া ব্যক্তি

🔶সূরা আরাফঃ আয়াত ১৭৫-১৭৬

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

১৭৫-১৭৭ নং আয়াতের তাফসীর:

এটা ছিল বানী ইসরাঈলের মধ্যকার একটি লোক। তার নাম ছিল বালআম ইবনে বাউর। (এটা আব্দুর রাযযাক (রঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন) কাতাদা (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার নাম ছিল সায়ফী ইবনে রাহিব। কা'ব (রঃ) বলেন যে, সে ছিল বালকাবাসী এক লোক। সে ইসমে আ'যম জানতো। সে ইয়াহূদী আলিমদের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন। যে, সে ছিল ইয়ামনের অধিবাসী। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় নিদর্শনাবলী ও কারামাত দান করেছিলেন। কিন্তু সে ঐগুলোর মর্যাদা দেয়নি। তার প্রার্থনা কবুল করা হতো। জনগণ বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনার জন্যে তাকেই আগে বাড়িয়ে দিতো।

আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ) দ্বীনের তাবলীগের জন্যে তাকে মাদইয়ান দেশে প্রেরণ করেন। সেখানকার বাদশাহ্ তাকে নিজের পক্ষে করে নেয় এবং বহু উপঢৌকন প্রদান করে। সে বাদশাহর দ্বীন কবুল করে নেয় এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বীন পরিত্যাগ করে। তার নাম ছিল বালআ'ম। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, সে হচ্ছে উমাইয়া ইবনে আবি সালাত। খুব সম্ভব এটা বলার উদ্দেশ্য এই হবে যে, এই উমাইয়াও ঐ লোকটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। এই লোকটিও পূর্ববর্তী শরীয়তের জ্ঞান রাখতো। কিন্তু ওটা থেকে সে উপকার গ্রহণ করেনি। সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগও পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স:)-এর নিদর্শনগুলো সে স্বচক্ষে দেখেছিল এবং তার মু'জিযাগুলো অবলোকন করেছিল। সে হাজার হাজার লোককে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছে। কিন্তু মুশরিকদের সাথে মেলামেশা, তাদের মধ্যে তার সম্মান ও মর্যাদা এবং নেতৃত্ব লাভ তাকে ইসলাম ও সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের জন্যে বড় বড় শাক গাঁথা সে রচনা করেছিল। তার মুখ তো ঈমান এনেছিল, কিন্তু তার অন্তর মুমিন হয়নি। খুব সম্ভব এই সমুদয় ঘটনা উমাইয়া ইবনে আবি সালাতের সাথেই সম্পর্কযুক্ত, বালআ'মের সাথে নয়।

বালআমের বর্ণনা কুরআন কারীমের মধ্যে এইভাবে হচ্ছে- 'আমি তাকে আমার নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ কারামাত দান করেছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে সরে পড়ে অর্থাৎ বঞ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি দুআর অধিকার দিয়েছিলেন যে, সেগুলো কবুল হবে। তার একটি স্ত্রী ও একটি পুত্র ছিল। তার স্ত্রী তাকে বললোঃ "তুমি আমার জন্যে একটি দু'আ নির্দিষ্ট করে নাও"। সে বললো, "আচ্ছা, কি দুআ বল।" স্ত্রী বললোঃ "আল্লাহর নিকট দু'আ কর যে, আল্লাহ

তা'আলা যেন আমাকে বানী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী করে দেন।" সে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ দু'আই করলো।

ফলে তার স্ত্রী সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীতে পরিণত হয়ে গেল। তার স্ত্রী যখন অনুভব করলো যে, তার মত সুন্দরী নারী আর নেই তখন সে তার স্বামীকে অগ্রাহ্য করে বসলো এবং তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করলো। আর তার ধারণা ও কার্যাবলী অন্যরূপ হয়ে গেল। তখন বালআম দুআ করলো যে, যেন তার স্ত্রী কুকুরী হয়ে যায় । সুতরাং সে কুকুরী হয়ে গেল। এভাবে দু'টি দুআ শেষ হয়ে গেল। তার ছেলেটি তখন তাকে বললোঃ "আব্বা! আমার মা কুকুরী হয়ে থাকবে এটাতো আমাদের জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়। জনগণ আমাদের নিন্দা করছে। সুতরাং আপনি দুআ করুন যেন আমার মা পূর্বাবস্থায় চলে আসে। সে তখন দুআ করলো। ফলে তার স্ত্রী পূর্বে যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। এখন তিনটি দুআ'ই শেষ হয়ে গেল। এই বর্ণনাটি গারীব।

এই আয়াতটির প্রসিদ্ধ শানে নুযূল এই যে, বানী ইসরাঈলের যুগে একটি লোক ছিল। সে জাব্বারীন ইয়াহূদীদের শহরে বাস করতো। সে ইসমে আযম জানতো। কথিত আছে যে, তার দুআ আল্লাহর পক্ষ থেকে গৃহীত হতো। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা, যা কোন কোন লোক বলে থাকে তা এই যে, সে নবী ছিল, কিন্তু নবুওয়াত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। ইবনে জারীর (রঃ)-এর এরূপ উক্তি রয়েছে। কিন্তু এটা মোটেই সঠিক নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন জাব্বারীনদের শহরে আগমন করেন তখন বালআ'মের কাছে তার লোকেরা এসে বলেঃ "মূসা (আঃ) একজন লৌহমানব। তার সাথে বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে। যদি তিনি আমাদের উপর জয়যুক্ত হন তবে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবো। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করুন যেন মূসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিপদ আমাদের থেকে দূরীভূত হয়।" সে বললোঃ "যদি আমি এই দুআ করি তবে আমার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট হয়ে যাবে।" কিন্তু জনগণ পীড়াপীড়ি করায় সে ঐরূপ দুআ করলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার বুযুর্গী ও কারামাত ছিনিয়ে নেন। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ অর্থাৎ সে কারামাত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং শয়তান তার পিছনে লেগে পড়লো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যখন মূসা (আঃ)-এর জন্যে তীহের ময়দানে চল্লিশ বছরের চক্র শেষ হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-কে নবী করে পাঠালেন।

তিনি বানী ইসরাঈলকে নিজের নবী হওয়ার সংবাদ দিলেন এবং এ খবরও দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাব্বারীনদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জাব্বারীনরা হযরত ইউশা (আঃ)-এর বায়আত গ্রহণ করে এবং তার সত্যতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বানী ইসরাঈলের বালআম নামক একটি লোক অবাধ্যাচরণ করতঃ জাব্বারীনদের কাছে গমন করে এবং তাদেরকে বলেঃ "ভয় করো না। যখন তোমরা যুদ্ধের জন্যে বের হবে তখন আমি বদ দুআ'র হাতিয়ার কাজে লাগাবো এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।" জাব্বারীনদের

কাছে বালআমের পার্থিব সুখ-সম্ভোগের সব কিছুই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে কোনই উপকার লাভ করতে পারতো না। কেননা, ঐ স্ত্রীলোকদের শ্রেষ্ঠত্ব তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে শুধুমাত্র নিজের গর্দভী অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখতো। এখন শয়তান তার পিছনে লেগে গেল। অর্থাৎ সে শয়তানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো। সুতরাং সে শয়তানের আদেশ পালন করতে শুরু করলো।

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে সিয়ার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে ঐ ভূ-খণ্ডের অভিমুখে রওয়ানা হন যেখানে বালআম বাস করতো অথবা তিনি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। হযরত মূসা (আঃ) ও তার সেনাবাহিনীর আগমন বার্তায় তথাকার লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বালআমের কাছে এসে বলেঃ “মূসা (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনীর জন্যে বদ দুআ করুন।” তখন সে বলেঃ “তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আমার প্রতিপালকের সাথে পরামর্শ করে নেই।” অতঃপর সে পরামর্শ করলে তাকে বলা হয়ঃ “না বদ দুআ করো না। কেননা, তারা আমার বান্দা। তাছাড়া তাদের মধ্যে আমার নবীও বিদ্যমান রয়েছে। তখন সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললোঃ “আমি আমার প্রভুর সাথে পরামর্শ করেছি। তিনি আমাকে বদ দুআ করতে নিষেধ করেছেন।

এরপর জনগণ তার কাছে বহু উপঢৌকন পাঠিয়ে দেয়। তার উচিত ছিল ঐগুলো গ্রহণ না করা। কিন্তু সে ওগুলো গ্রহণ করে নেয়। তারপর লোকেরা আবার তাকে বদ দুআ করার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয়। সে বলেঃ “আচ্ছা, পুনরায় আমি পরামর্শ করে দেখি।” এবার কিন্তু তাকে কোনই পরামর্শ দেয়া হলো না। সে জনগণকে বললোঃ “এবার তো আমাকে কোনই পরামর্শ দেয়া হয়নি। কাজেই আমি বদ দুআ করতে পারি না।”

কিন্তু জনগণ তাকে বিভ্রান্ত করে ফেললো। তারা তাকে বললোঃ “যদি এতে আল্লাহর সম্মতি না থাকতো তবে পূর্বের ন্যায় এবারও বদ দুআ করতে আপনাকে নিষেধ করে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা যখন নীরব রয়েছেন তখন বুঝা যাচ্ছে যে, এতে তাঁর সম্মতি আছে। তাদের এ কথায় বালআম প্রতারিত হয়ে পড়লো।

সুতরাং সে মূসা (আঃ) ও তার সেনাবাহিনীর উপর বদ দুআ করতে শুরু করলো। যখনই সে বদ দুআ'র শব্দ মূসা (আঃ)-এর জন্যে বের করতে চাইতো তখনই তার মুখ দিয়ে তার নিজের কওমের জন্যে বদদুআ'র শব্দ বেরিয়ে পড়তো। নিজের কওমের জন্যে বিজয়ের শব্দ বের করতে চাইলে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিজয়ের শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো। অথবা দুআ'র শেষে। ইনশাআল্লাহ শব্দটি বেরিয়ে পড়তো।

কাজেই বদ দুআ শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে ব্যর্থ হয়ে যেতো। লোকেরা তখন তাকে বললোঃ “আপনি যে মূসা (আঃ)-এর পরিবর্তে আমাদের উপরই বদ দুআ করছেন।” সে বললোঃ “আমি করবো কি? অনিচ্ছাকৃত ভাবেই আমার মুখ দিয়ে এগুলো বেরিয়ে পড়ছে। আমার এখন পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আমি বদ দুআ করলেও তা কবুল হবে না। এখন আমি তোমাদেরকে

একটি তদবীর শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা করলে এ লোকগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দেখো! আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। তিনি ব্যভিচার কার্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। যদি এ লোকগুলোকে কোন রকমে ব্যভিচারে জড়িত করে দেয়া যায় তবে অবশ্যই তাদের ধ্বংসের আশা রয়েছে। অতএব তোমরা এই কাজ কর যে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে মূসা (আঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে পাঠিয়ে দাও। এরা তো স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে বিদেশে পড়ে আছে, সুতরাং তারা যে ব্যভিচারে জড়িত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।”

তার কথামত লোকগুলো ঐ কাজই করলো। তারা তাদের স্ত্রীদেরকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সেনাবাহিনীর নিকট পাঠিয়ে দিলো। এমন কি তাদের বাদশাহর কন্যাও ছাড়া পড়লো না। শাহজাদীকে তার পিতা অথবা বালআম বলে দিলো যে, সে যেন হযরত মূসা (আঃ) ছাড়া আর কারো ব্যবহারে না আসে। কথিত আছে যে, সত্যিই লোকগুলো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

শাহজাদীর কাছে বানী ইসরাঈলের একজন সর্দার এসে গেল এবং তার থেকে কাম বাসনা পূর্ণ করতে চাইলো। বাদশাহর কন্যা তাকে বললো যে, সে মূসা (আঃ) ছাড়া আর কাউকেও তার সাথে জড়িত হতে দেবে না। সর্দার বললোঃ “আমি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছি এবং আমার এই শান-শওকত রয়েছে।” কন্যা তখন তার পিতাকে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলো, পিতা তাকে অনুমতি দিলো। তারা দু'জন তখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়লো।

এমতাবস্থায় হযরত হারুন (আঃ)-এর এক ছেলে তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে একটি বর্শা ছিল। তিনি তাদের উপর এমন জোরে বর্শা মেরে দিলেন যে তারা দু'জনই একই বর্শায় গেঁথে গেল। তিনি সেই বর্শাকে উচু করে ধরে জনগণের সামনে আসলেন এবং তারা ঐ দু'জনকে ঐ অবস্থায় স্বচক্ষে দেখে নিলো। আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর মহামারীর শাস্তি নাযিল করলেন। ফলে সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

ইবনে সিয়ার (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বালআম স্বীয় গর্দভীর ওপর সওয়ার হয়ে মা'লী নামক জায়গা পর্যন্ত আসলো। এখান থেকে তার সওয়ারী আর আগে বাড়ে না। সে ওকে মারতে শুরু করলো, কিন্তু ওটা বসেই যাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা ওকে বাকশক্তি দান করলেন। গর্দভীটি তখন বালআমকে বললোঃ “তুমি আমাকে মারছো কেন? সামনে দেখো কে আছে?” সে দেখলো যে শয়তান দাড়িয়ে আছে। সে নেমে গিয়ে শয়তানকে সিজদা করলো।

এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ فَانْسَلَخَ مِنْهَا

সালিম (রঃ) আবূ নযর (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন সিরিয়া হতে বানী কিনআ'নে আসেন তখন বালআমকে তার কওমের লোকেরা বলেঃ “মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়সহ আমাদের দেশে আসছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের

এখানে তার লোকদেরকে বসিয়ে দেয়া। আমরা আপনার কওমেরই লোক। আমাদের অন্য কোন বাসস্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা আপনার দুআ কবুল করে থাকেন।

সুতরাং আপনি তাদের জন্যে মহান আল্লাহর নিকট বদ দুআ করুন।” সে বললোঃ “তোমরা নিপাত যাও! মূসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নবী। তার সাহায্যার্থে ফেরেশতারাও রয়েছেন। এবং মুমিনরাও রয়েছেন। সুতরাং আমি তাঁদের উপর কিরূপে বদ দুআ করতে পারি? আমি যা জানি তা জানিই।” তার লোকেরা তখন বললোঃ “তাহলে আমরা থাকবো কোথায়?” এভাবে সব সময় তারা তার উপর চাপ দিতে থাকে এবং বিনীতভাবে বদ দুআ করার জন্যে তার কাছে আবেদন জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। সে স্বীয় গর্দভীর উপর সওয়ার হয়ে একটি পাহাড় অভিমুখে গমন করে, যে পাহাড়ের উপর চড়ে সে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনীকে দেখতে পাবে। ঐ পাহাড়টিকে হাসান পাহাড় বলা হয়। কিছু দূর গিয়ে তার গর্দভীটি বসে পড়ে। সে তখন নেমে গর্দভীকে মারতে শুরু করে। কিছুদূর গিয়ে আবার সে বসে পড়ে।

বার বার যখন তাকে মারতে থাকে তখন আল্লাহ তাকে বাশক্তি দান করেন। সে বলে ওঠে- “হে বালআ'ম! তুমি আমাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছ? তুমি কি দেখছো না যে, ফেরেশতা আমার সামনে রয়েছেন? তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিচ্ছেন। তুমি আল্লাহর নবী ও মুমিনদের উপর বদ দুআ করতে যাচ্ছ!” সে কিন্তু তবুও বিরত হলো না। পুনরায় সে গর্দভীকে মারতে শুরু করলো। এবার আল্লাহর নির্দেশক্রমে সে হাসবান নামক পাহাড়ের উপর উঠে গেল। ওখানে পৌছে বালআম হযরত মূসা (আঃ) ও মুমিনদের উপর বদ দুআ করতে শুরু করে দিলো। কিন্তু তার জিহ্বা উল্টে যাচ্ছিল।

তার মুখ দিয়ে তার কওমের জন্যে বদ দুআ' এবং মূসা (আঃ)-এর জন্যে ভাল দুআ বের হচ্ছিল।

কথিত আছে যে, বদ দুআ করার সময় তার জিহ্বা বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল এবং তার বক্ষের উপর লম্বা হয়ে লটকে গিয়েছিল।

তখন সে বলে উঠেছিলঃ “আমার দুনিয়াও গেল, দ্বীনও গেল।” কওমের লোককে সে বললোঃ “এখন শুধু প্রতারণা ও কৌশল দ্বারা কাজ নেয়া যেতে পারে। তোমরা নিজেদের মেয়েদেরকে সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত করে বানী ইসরাঈলের সৈন্যদের মধ্যে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন ঐ পুরুষ লোকদেরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে নেয়। যদি একটি লোকও ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে তবে জেনে রেখো যে, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।” তার কথামত নারীদেরকে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনীর মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

কিনআ'নবাসীর একটি স্ত্রীলোকের নাম ছিল কাসবতী। সুর নামক একটি লোক ছিল কওমের সর্দার ও বাদশাহ্। কাসবতী ছিল তারই কন্যা। এই কাসবতীর মিলন ঘটে যামরী ইবনে

শালুম নামক বানী ইসরাঈলের এক সর্দারের সাথে। এই যামরী ছিল শামউন ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের পৌত্র। সে ছিল কওমের সর্দার। সে কাসবতীকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে তার হাত ধরে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট নিয়ে গেল এবং তাকে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনি হয়তো এ কথাই বলবেন যে, এ মেয়েটি তোমার জন্যে হারাম। সুতরাং তুমি তার কাছে যেয়ো না।" হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "হ্যা! এ নারী তোমার জন্যে হারাম।" সে তখন বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আল্লাহর কসম! এখানে তো আমি আপনার কথা মানবো না।" অতঃপর সে মেয়েটিকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল এবং তাকে নিয়ে একই বিছানায় রাত্রি কাটালো।

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে দিলেন। ফানহাস ইবনে আনীরার ইবনে হারুন নামক কওমের সর্দার যামরী ইবনে শালুমের এই কাজের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল না। যামরীর এই দুষ্কার্যের ফলে বানী ইসরাঈলের সমস্ত কওমের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফানহাস এই সমুদয় ঘটনা অবগত হয়। সে স্বীয় লৌহ-বর্শাটি উঠিয়ে নিয়ে যামরীর তাঁবুতে প্রবেশ করে। ঐ সময় তারা দু'জন শায়িত অবস্থায় ছিল। দু'জনকেই সে একই বর্শায় গেঁথে নেয় এবং ঐ অবস্থাতেই বর্শাটিকে মাথায় উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফানহাস ছিল যুবক ও শক্তিশালী লোক। সে বলতে বলতে যাচ্ছিলঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নাফরমান বান্দার সাথে এই ব্যবহার করলাম। সুতরাং আপনি মহামারী দূর করে দিন!" আল্লাহ পাক মহামারী দুর করলেন। ঐ মহামারীতে বানী ইসরাঈলের সত্তর হাজার লোক অথবা কমপক্ষে বিশ হাজার লোক মারা যায়। (এটা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) সালিম (রঃ) ও আবু নযর (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর (রঃ) অনুরূপভাবে এটা তাখরীজ করেছেন এবং তাতে রয়েছে যে, কিছু সংখ্যক সৈন্য কর্তৃক ব্যভিচার কার্য সংঘটিত হয় যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ছিল।

আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে মহামারী দ্বারা আক্রান্ত করেন। তাতে সত্তর হাজার লোক মারা যায়। ফানহাসের এই কার্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বানী ইসরাঈল যখনই কিছু যবেহ করতো তখন ওর মাথা ও সামনের পা এবং নিজেদের ফলমূলের প্রথম জিনিস তার (ফানহাসের) সন্তানদেরকে নানা স্বরূপ প্রদান করতো। আল্লাহ পাক স্বীয় নবী হযরত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! তুমি জনগণকে এ ঘটনাগুলো শুনিয়ে দাও, যাতে তারা বানী ইসরাঈলের অবস্থা অবহিত হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করতঃ আল্লাহর পথে এসে যায় এবং চিন্তা করে যে, বালআ'মের অবস্থা কি হয়েছিল। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান রূপ মহামূল্যবান সম্পদকে সে দুনিয়ার নগণ্য আরাম ও বিলাসিতার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। শেষে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলে।

অনুরূপভাবে এই ইয়াহূদী আলেমরা যারা তাদের কিতাবসমূহে আল্লাহর হিদায়াত পাঠ করছে এবং তোমার গুণাবলী তাতে লিপিবদ্ধ দেখছে, তাদের উচিত হবে দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত হয়ে শিষ্যদেরকে ভুল পথে চালিত না করা। নতুবা তারাও ইহকাল ও পরকাল দু-ই হারাবে।

তাদের কর্তব্য হবে যে, তারা যেন তাদের জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ করে এবং তোমার আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর অন্যদের কাছেও যেন সত্য কথা প্রকাশ করে দেয়। দেখো! কাফিরদের দৃষ্টান্ত কতই না জঘন্য যে, তারা কুকুরের মত শুধু খাদ্য ভক্ষণ ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে! সুতরাং যে কেউই ইলম ও হিদায়াতকে ছেড়ে দিয়ে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে লেগে পড়বে সে-ই হবে কুকুরের মত।

যেমন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "জঘন্য দৃষ্টান্ত যেন আমাদের উপর প্রয়োগ করা না হয়। অর্থাৎ কাউকে দেয়ার পর তা যে ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা খেয়ে নেয়।" (এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে) ইরশাদ হচ্ছে। তারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। কেননা, তারা হিদায়াতের অনুসরণ করেনি। তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মধ্যে পতিত হয়েছে। এটা আল্লাহর অত্যাচার নয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

🔶'যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন' মুফাসসিরগণ এ আয়াতগুলোকে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কিতাবের জ্ঞান রাখত, কিন্তু পরে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও শয়তানের পিছে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

পর্ব ২৯: হযরত ইউসুফ আঃ এর জামা

🔶সূরা ইউসুফঃ আয়াত ৯৩

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

৯৩-৯৫ নং আয়াতের তাফসীর

আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফের (আঃ) শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বললেনঃ "আমার এই জামাটি নিয়ে আমাদের পিতার কাছে গমন করুন এবং এটা তার মুখের উপর রেখে দেবেন, ইনশা আল্লাহ তিনি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর আপনারা তাঁকে এবং আপনাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে আসবেন।"

এদিকে এই যাত্রীদল মিসর থেকে যাত্রা শুরু করেছেন, আর ও দিকে আল্লাহ তাআ'লা হযরত ইয়াকুবের (আঃ) কাছে হযরত ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

তখন তিনি তাঁর কাছে অবস্থিত সন্তানদের বললেনঃ "আমার কাছে তো আমার প্রিয় পুত্র ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ আসছে। কিন্তু তোমরা তো আমাকে জ্ঞান শূন্য অতি বৃদ্ধ বলে আমার কথার প্রতি কোনই গুরুত্ব দেবে না।" ঐ সময় যাত্রীদল কিনআন থেকে ৮ (আট) দিনের পথের দূরত্বে ছিল।

সেখান থেকেই আল্লাহর হুকুমে বাতাস হযরত ইয়াকুবকে (আঃ) হযরত ইউসুফের (আঃ) জামাটির সুগন্ধি পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ঐ সময় হযরত ইউসুফের (আঃ) হারিয়ে যাওয়ার সময় কাল ৮০ (আশি) বছরে পৌঁছেছিল এবং যাত্রীদল তার নিকট থেকে ৮০ (আশি) 'ফারসাখ' দূরে ছিল। কিন্তু পিতার পার্শ্বে অবস্থানকারী ইউসুফের (আঃ) ভ্রাতাগণ পিতাকে বললো: "আপনি ইউসুফের (আঃ) প্রতি ভালবাসার কারণে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে রয়েছেন।

সে কোন সময় আপনার মন হতে দূর হয় না এবং কোন সময় আপনি সান্ত্বনাও লাভ করতে পারছেন না।" হযরত ইয়াকুবের (আঃ) কাছে এই ভাষাটি বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠোর ছিল। কোন যোগ্য সন্তানের পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, নিজের পিতার নামে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করে এবং উম্মতের জন্যেও এটা শোভা পায় না যে, তারা তাদের নবীকে সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ কথা বলে! সুদ্দী (রঃ) প্রভৃতি গুরুজন একথাই বলেছেন।

পর্ব ৩০ চার মাস বয়সী শিশুর সাক্ষ্য

🔶সূরা ইউসুফঃ আয়াত ২৭

‘আর তার জামা যদি পেছন থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে (মহিলা) মিথ্যা বলেছে এবং সে (পুরুষ) হচ্ছে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’।

🔶২৩-২৯ নং আয়াতের তাফসীর:

আযীযে মিসর (মিসরের মন্ত্রীর) স্ত্রী (যুলাইখা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইউসুফ (عليه السلام)-এর যত্ন ও সুন্দর বাসস্থানসহ সম্মানের সাথে রাখার জন্য, কিন্তু সে স্ত্রী ইউসুফ (عليه السلام) এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়ে, ক্রমে ক্রমে তাঁকে ফুসলাতে থাকে তার সাথে অপকর্ম করার জন্য। এমনকি ঐ মহিলা ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিল (বলা হয় সে ঘরের সাতটি দরজা ছিল) এবং ইউসুফ (عليه السلام)-কে বলল: এসো আমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি। তখন ইউসুফ (عليه السلام) তার এই রকম কামনা-বাসনা দেখে তাকে বললেন: আমি আপনার এই রকম অসৎ উদ্দেশ্য থেকে আল্লাহ তা‘আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং বললেন, দেখুন! আপনার স্বামী আমাকে উত্তমরূপে রেখেছেন এবং আমার সাথে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন।

সুতরাং যিনি আমার সাথে এত ভাল আচরণ করেন ও আমাকে সম্মান করেন তার সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না, এটি সম্ভব নয়। আর বিশ্বাসঘাতক কখনো সফলকাম হয়না, বরং সে কল্যাণ লাভে বঞ্চিত হয়। স্ত্রীলোকটি তাঁর এসব কথা-বার্তায় কান না দিয়ে বরং নিজের কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মত্ত ছিল। সে তাঁকে আহ্বান জানালো।

মহিলার এসব কথা বার্তা ও আসক্তি দেখে ইউসুফও সে মহিলার প্রতি ঝুঁকে পড়তেন যদি না তাঁর রবের নিদর্শন দেখতেন।

‘এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত।’

এই নিদর্শনের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও সঠিক কথা হল, আল্লাহ তা‘আলার ভয়, যে মনিব তাঁকে আশ্রয় দান করেছেন তার মর্যাদা রক্ষা এবং নিজেকে জুলুম করা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি এরূপ কাম চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকলেন। এভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর থেকে মন্দ এবং অশ্লীলতাকে দূরীভূত করলেন এজন্য যে, তিনি একজন

সৎ বান্দা এবং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তি অর্থাৎ নাবী। (তাফসীর সা'দী, অত্র আয়াতের তাফসীর)

ইউসুফ (عليه السلام) ঐ মহিলার ডাকে সাড়া না দিয়ে বের হবার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন তখন মহিলাটিও তাকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে ছুটল এবং ইউসুফ (عليه السلام) এর জামাটি পিছন দিক থেকে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল। এই অবস্থায় উভয়ে দরজার নিকট পৌঁছে যান। দরজায় পৌঁছতেই দেখেন যে, ঐ মহিলার স্বামী দরজার নিকট বিদ্যমান। স্বামীকে দেখা মাত্রই সে বলে: 'যে আপনার স্ত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে চায় তার জন্য কারগারে প্রেরণ বা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কী হতে পারে?'

ইউসুফ (عليه السلام) যখন দেখলেন যে, মহিলাটি সমস্ত দোষ তাঁর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে তখন তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বলেন: প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, আপনার স্ত্রীই আমাকে অপকর্মের জন্য আহ্বান করছিল কিন্তু আমি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে দরজার দিকে ছুটে আসছিলাম তখন সেও আমার পিছনে ছুটে আসল। তখন মহিলার স্বামী বলল: তুমি যে এ দোষ থেকে মুক্ত তার প্রমাণ কী? যদি প্রমাণ না নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

তখন আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মহিলার বাড়ির একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ফয়সালা দিল যে, যদি ইউসুফের জামা পেছন দিক দিয়ে ছেঁড়া থাকে তাহলে ইউসুফ সত্যবাদী মহিলাটি মিথ্যাবাদী আর যদি সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি সত্যবাদী, ইউসুফ মিথ্যাবাদী। এখানে ফায়সালাকে شَهِدَ (সাক্ষ্য দিল) শব্দে এ জন্য বুঝানো হয়েছে যে, তখনও বিষয়টি যাচাই করার প্রয়োজন ছিল।

অতঃপর যখন মহিলার স্বামী দেখলেন যে, ইউসুফের জামা পেছন দিক দিয়ে ছেঁড়া তখন আযীয অর্থাৎ মহিলার স্বামী বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফই সত্যবাদী এবং ঐ মহিলা ইউসুফকে অপবাদ দিয়েছে। তখন মহিলার স্বামী বললেন: তোমাদের চক্রান্ত খুবই কঠিন। তুমি যেভাবে ব্যক্ত করেছিলে মনে হয় যেন তুমিই পবিত্র, সে অপরাধী। এখানে নিজ স্ত্রীর কুস্বভাব দেখে নারী জাতি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে "নিশ্চয়ই এটা তোমাদের চক্রান্ত"। তবে এ মন্তব্য সকল নারী জাতির ক্ষেত্রে সঠিক নয়।

সুতরাং তা সকল নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এবং এর ভিত্তিতে নারী মাত্রই সকলকে চক্রান্তকারী বলা কুরআনের উদ্দেশ্য নয়। যেমন অনেকে উক্ত বাক্য দ্বারা নারীদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলে থাকে। আযীয ইউসুফ (عليه السلام) কে সান্ত্বনা দিলেন এবং এ কথা প্রচার করতে বারণ করলেন। তার স্ত্রীকে অপরাধের কারণে তাওবাহ করার নির্দেশ দিলেন।

🔶 আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কেউ কোন পাপ কাজের দিকে আহ্বান করলে তাতে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাইতে হবে এবং অন্যায়কারীকে সদুপোদেশ দিতে হবে।
২. ন্যায় ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে আল্লাহ তা'আলা বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এটা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি।
৩. কিয়ামতের দিন সে যুবক আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে যে যুবককে সুন্দরী রমণী অপকর্ম করার আহ্বান করলে বলে আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি।
৪. যুবকদেরকে অন্যায় কাজে জড়িত করার জন্য কতক নারীরাই অগ্রগামী।
৫. যারা পাপ থেকে বিরত থাকতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেন।
৬. যে কোন বিষয় যাচাই বাছাই করে ফায়সালা করা উচিত।
৭. বেগানা মহিলার সাথে একাকিত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হলাম।

পর্ব ৩১ মাছের পেটে হযরত ইউনুস

🔶সূরা ইউনুসঃ আয়াত ৯৮
🔶সূরা সফফাতঃ আয়াত ১৩৯-১৪৮

ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ
১৩৯-১৪৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

অত্র আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের ৬টি সূরার ১৮টি আয়াতে বর্ণনা এসেছে। সূরা ইউনুসের ৯৮ নম্বর আয়াতে তাঁর নাম ইউনুস, সূরা আম্বিয়ার ৮৭ নম্বর আয়াতে যুন-নূন (ذو النون) এবং সূরা কালামের ৪৮ নম্বর আয়াতে তাঁকে সাহেবুল হূত (صاحب الحوت) বলা হয়েছে। 'নূন' ও 'হূত' উভয় শব্দের অর্থ মাছ। যুন-নূন ও সাহেবুল হূত অর্থ মাছওয়ালা। একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা : আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আঃ)-কে ইরাকের নীনাওয়া (বর্তমান মুসেল) নামক শহরের নিকটবর্তী জনপদের অধিবাসীদের প্রতি নাবী হিসেবে প্রেরণ করেন। এখানে আশুরীদের শাসন ছিল, যারা এক লক্ষ্য বানী ইসরাঈলকে বন্দী করে রেখেছিল, সুতরাং তাদের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য ইউনুস (আঃ)-কে নাবী করে প্রেরণ করা হয়। তিনি যথারীতি তাঁর সম্প্রদায়কে তাওহীদের দিকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না এবং ঈমানও আনল না।

বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতোমধ্যে তাঁর জাতির ওপর আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। তিনি জনপদ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, তিনদিন পর তোমাদের ওপর আযাব আসতে পারে। তারা ভাবল নাবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে তাঁর জাতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শির্ক হতে তাওবা করে এবং সকলকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে আসন্ন গযব হতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করেন এবং আযাব তুলে নেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"অতএব কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যে, তারা এমন সময় ঈমান আনত যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত। তারা যখন ঈমান আনল তখন আমি তাদের হতে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি তুলে নিলাম এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিলাম।" (সূরা ইউনুস ১০ : ৮৬)

ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তাঁর জাতি আল্লাহ তা'আলার গজবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব আসেনি। তখন তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, এখন তাঁর জাতি তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসেবে তৎকালীন প্রথানুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে এমনকি আল্লাহ তা'আলার হুকুমেরও অপেক্ষা না করে রাগান্বিত হয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ কথাই অত্র সূরার ১৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

মাছের পেটে ইউনুস (আঃ) : হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হলে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে।

سَاهَمَ অর্থ লটারী করা। অর্থাৎ কাকে নদীতে ফেলবে এ জন্য লটারী করা হয়। লটারীতে পরপর তিনবার ইউনুস (আঃ) এর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। নদীতে ফেলে দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে একটি বিরাটকার মাছ তাঁকে গলধঃকরণ করে। কিন্তু তিনি মাছের পেটে হযম হননি বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা। মাওয়ার্দী বলেন : মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল।

যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকে। (কুরতুবী, সূরা আম্বিয়ার ৮৭ নম্বর আয়াতের তাফসীর)

ইউনুস (আঃ)-এর মুক্তি :

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যদি মাছের পেটে যাওয়ার পূর্ব থেকেই তাঁর অধিক ইবাদত ও সৎ আমল না থাকত এবং মাছের পেটে যাওয়ার পর তাওবা ইস্তিগফার ও তাসবীহ পাঠ না করত তাহলে মাছের পেটেই থেকে যেতো, সেখানেই তার কবর হতো এবং সেখান হতেই কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান হতো।

🔶তাওবাহ-ইস্তিগফার ও তাসবীহ দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় এবং তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকাবস্থায় বিশেষভাবে এ কালেমা পাঠ করতেন-
(لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ)
'তুমি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আম্বিয়া ২১ : ৮৭)

তাঁর অধিক পরিমাণ ইবাদত ও সৎ আমল এবং তাওবা ইস্তিগফারের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওবা কবুল করত মাছের পেট থেকে জীবিত অবস্থায় নদীর তীরে তরুলতাহীন শূন্য এলাকায় রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :
(فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَاۤءِ) العراء
অর্থ গাছ-পালা তরুলতা শূন্য এলাকা। অর্থাৎ মাছের পেট থেকে নিক্ষেপিত হয়ে এক মরু এলাকায় পতিত হলেন, যেখানে কোন গাছ পালা কিছুই ছিল না। তখন ইউনুস (আঃ) স্বাভাবিকভাবেই রুগ্ন ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন যা পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ছিল।

يَّقْطِيْنٌ ঐ সকল গাছকে বলা হয়, যা নিজ কান্ডের ওপর দাঁড়াতে পারে না। যেমন লাউ, কুমড়া ইত্যাদি গাছ। কোন বর্ণনাতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ রয়েছে। ছায়া ও অন্য উপকার নেয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অতঃপর সুস্থ হয়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে নিজ জাতির কাছে ফিরে আসেন। জাতির লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করতে লাগল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার সুখসম্পদ ভোগ করার সুযোগ করে দেন।

(وَأَرْسَلْنٰهُ إِلٰي مِائَةِ) এখান থেকে কোন কোন মুফাসসিরগণ বলতে চেয়েছেন যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যাওয়ার পর নবুওয়াত পেয়েছেন। আল্লামা বাগাভী (রহঃ) বলেন : এ ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক জাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কুরআন ও হাদীস থেকে এ উক্তির কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই ইউনুস (আঃ)-এর রিসালাত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, মাছের ঘটনা নাবী হওয়ার পর ঘটেছে। অতঃপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও ওপরে।

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নাবীদের দাওয়াত কবুল করে নেয়া। তাহলে দুনিয়ার শাস্তি হতে রক্ষা ও পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আর ইউনুস (আঃ)-এর উক্ত দু'আ দু'আয়ে ইউনুস নামে পরিচিত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : বিপদগ্রস্ত কোন মুসলিম যদি (নেক মকসূদ হাসিলে নিয়তে) (لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ـ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) দু'আ পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা কবুল করবেন। (তিরমিযী হা. ৩৫০৫, মিশকাত হা. ২২৯২, সহীহ)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : কোন মানুষের জন্য এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, সে বলবে : আমি "ইউনুস ইবনু মাত্তা" থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী হা.

৩৩৯৫-৩৪১৩, সহীহ মুসলিম হা. ১৬৭) অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন নাবীর মর্যাদার ওপর নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা যাবে না, সমষ্টিগতভাবে বর্ণনা করা যাবে।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. বিভ্রান্ত জাতির দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া কোন সমাজ সংস্কারকের উচিত নয়।
২. কঠিন মুহূর্তেও কেবল আল্লাহ তা‘আলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।
৩. খালেস তাওবা ও সৎ আমলের কারণে অনেক সময় আল্লাহ তা‘আলা গযব উঠিয়ে নেন।
৪. আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশনা ব্যতীত যেহেতু কোন নাবীর জন্যও কোন কিছু করা সমীচীন নয় অতএব সাধারণ মানুষের উচিত আল্লাহ তা‘আলার বিধান যথাযথভাবে পালন করা।

পর্ব ৩২ মক্কা মুকররমায় জনবসতি গড়ে উঠা

🔶সূরা ইব্রাহিমঃ আয়াত ৩৫-৪১
'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে'।

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ
মক্কার নিরাপত্তা ও শির্ক থেকে নিজে ও সন্তানদেরকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (عليه السلام) যে দু'আ করেছিলেন সে কথা তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত আয়াতে هذا البلد দ্বারা মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। ইবরাহীম (عليه السلام) প্রথমেই নিরাপত্তার দু'আ করলেন এজন্য যে, কোন স্থানে নিরাপত্তা না থাকলে সে স্থান যতই মূল্যবান হোক আর যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক তাতে কেউ যেতে চাইবে না।আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করলেন যার ফলে আজও সেখানে নিরাপত্তা বিরাজ করছে, কোন হত্যা, খুন, রাহাজানি, বিবাদ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি; এমনকি পশুপাখি পর্যন্তও নিরাপদে থাকে। তিনি আরো দু'আ করলেন তাঁর জন্য এবং তাঁর সন্তানদের জন্য যেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মূর্তি পূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। সন্তানের ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করে সব পিতা-মাতাই দু'আ করে থাকে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে শির্ক থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা যেমন ইবরাহীম (عليه السلام) করেছেন।

হাজেরার ঘরে যখন ইসমাঈল (عليه السلام) জন্ম নিলেন তখন ইবরাহীম (عليه السلام) কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন তিনি যেন হাজেরা ও সন্তান ইসমাঈলকে নির্জন মরুভূমি মক্কায় রেখে আসে। বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তান পেলেন তাও নিজের কাছে রাখার সুযোগ পেলেন না। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পেতে দেরী, পালন করতে দেরী নয়। সকল মায়া মমতা বর্জন করে স্ত্রী হাজেরা ও কলিজার টুকরা ইসমাঈলকে রেখে আসলেন। যখন রেখে চলে আসেন তখন হাজেরা বললেন: আপনি কি নিজের পক্ষ থেকে রেখে যাচ্ছেন, না কি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে? ইবরাহীম ভারাক্রান্ত মনে কথা বলতে পারছেন না, হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। তখন হাজেরা বললেন: তাহলে কোন চিন্তা নেই, যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রেখে যাচ্ছেন সে আল্লাহ তা'আলাই আমাদের ব্যবস্থা করবেন। তখন ইবরাহীম (عليه السلام) এ দু'আ করলেন 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসতি করলাম অনুর্বর (চাষাবাদহীন) উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা যেন সালাত কায়েম করে।'

مِنْ এখানে تبعضية বা আংশিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ কিছু লোক, উদ্দেশ্য হল মুসলিমগণ। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (عليه السلام) এর দু'আ কবুল করে নিলেন, ফলে সারা পৃথিবী থেকে মুসলিমরা দলে দলে হজ্জের মওসুমে উপস্থিত হয়, হজ্জের মওসুম ছাড়াও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এমনকি যাদের হজ্ব করার সামর্থ্য নেই তাদের মনে আগ্রহ থাকে, যদি একবার সেখানে যেতে পারতাম। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মনে মক্কার প্রতি একটি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

(وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ)
এ দু'আরও প্রভাব লক্ষ্যণীয়, মক্কার মত বৃক্ষ-লতাহীন মরুভূমি, যেখানে কোন ফলফলাদি আবাদ হয় না সেখানে আজ বিভিন্ন রকমের ফলফলাদি সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায়, যদিও মওসুম না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর স্মরণ কর! যখন ইবরাহীম বললেন: হে আমার রব! এ স্থানকে তুমি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে জীবিকার জন্য ফল-শস্য প্রদান কর। আল্লাহ বলেন, যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমি অল্পদিন ভোগ করতে দেব। পরে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, এটি নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল! " (সূরা বাক্বারাহ ২:১২৬)

বৃদ্ধ বয়সে সন্তান ইসমাঈল ও ইসহাককে পেয়ে ইবরাহীম (عليه السلام) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন, আর তিনি প্রার্থনা করলেন যেন তিনি সালাত কায়েম করতে পারেন এবং তার উত্তরসূরীগন।

🔶 আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. পিতা-মাতার উচিত সন্তানের জন্য ভাল দু'আ করা।
২. মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাই ইসলাম সন্ন্যাসী জীবন পছন্দ করে না।
৩. ভালো কাজ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার তাওফীক কামনা করতে হবে।
৪. সন্তান পিতা-মাতার জন্য উত্তম দু'আ করবে। (সূরা ইব্রাহিমঃ ৪১)
৫. মক্কা ও পার্শ্ববর্তী হারাম এলাকা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। সেখানে কোন মারামারি, হানাহানি ইত্যাদি কিছুই হবে না।

পর্ব ৩৩: আসহাবে কাহফ

🔶সূরা কাহফ(আয়াত ৯-২৬) অবলম্বনে ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

আল কাহফ الكهف সূরাটি কুরআনে পাকের ১৮ তম সূরা। কাহাফ মানে গুহা। আর আসহাবে কাহাফ মানে গুহাবাসী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা যে সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন,তার প্রত্যেকটি ঘটনাতেই রয়েছে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। সূরাটিতে বিস্ময়কর কিছু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যে কাহিনীগুলো আল্লাহ তায়ালা এ জন্য উল্লেখ করেছেন,যেন তার বান্দারা এইগুলো বারবার পড়ে এবং পার্থিব জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো উপমা ও উদাহরণসহ উপলব্ধি করে পরকালমুখী জীবন যাপন করতে পারে। আসহাফে কাহাফ বা গুহাবাসীর আশ্চর্যজনক ঘটনাও পবিত্র কুরআনের শিক্ষণীয় ঘটনাসমূহের অন্যতম একটি ঘটনা। এ সূরাটিতে কোরাইশদের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহ হযরত মুসা এবং হযরত খিযির (আঃ) এর ঘটনাটিও বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূরা কাহফ সম্পূর্ণটুকু এক সময় নাযিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। (রুহুল-মা'আনী)

ঘটনার শুরু যেভাবে হয়।নবুওয়তের পর ইসলামের প্রথম দিকে সায়্যাদুল মুরসালীন নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যখন জাহেলিয়াতের যুগে মানবজাতীর মুক্তির জন্যে ইসলামের ছায়াতলে আহ্বান করা শুরু করলেন তখন মক্কার কোরাইশদের মাঝে এক অনাকাঙ্খিত ভয় কাজ করতে লাগলো।

ইমাম ইবনে জরীর তাবারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে,মক্কায় যখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের দাওয়াত শুরু হয় কোরাইশরা তাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে,তখন তারা নযর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ী'তকে মদীনার ইহুদী পন্ডিতদের কাছে প্রেরণ করে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা কি বলে, জানার জন্যে। ইহুদী পন্ডিতরা তাদেরকে বলে দেয় যে,তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করো। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নেবে যে,তিনি আল্লাহ্র রসূল। অন্যথায় বোঝবে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী রসূল নন।

(১) তাঁকে ঐসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞাস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা।

(২) তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর,যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তার ঘটনা কি?

(প্রশ্নের উত্তরটি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করলাম, এ সূরার ৮৩-১০১ অংশে জুলকারনাইন সম্পর্কিত বর্ণনা আছে, জুলকারনইন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন নির্যাতীত, বঞ্চিত, শাসকের হাতে শোসিত লোকদের মুক্তি দিতেন। পবিত্র কুরআনের বর্ননা অনুযায়ী অরুণাচলে, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেখানে ইয়াজুজ, মাজুজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন জুলকারনাইন)

(৩) তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি? (তার উত্তরটি সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে)
উভয় কোরাইশী মক্কায় ফিরে এসে ভ্রাতৃসমাজকে বললঃ আমরা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহুদী আলেমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরাইশরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাযির হল। তিনি শুনে বললেনঃ আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলেন। কোরাইশরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর আলোকে জওয়াব দেবার জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে ওহী আসার অপেক্ষায় রইলেন।

কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পর দিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল না; বরং পনের দিন এ অবস্থায় কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈল(আঃ)ও এলেন না এবং কোন ওহীও নাযিল হল না। অবস্থাদৃষ্টে কোরাইশরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।পনের দিন পর জিবরাঈল(আঃ) সূরা কাহফ নিয়ে অবতর করলেন। এতে ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলা উচিত। কোরাইশদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল যুবদের সম্পর্কে।

সূরা আল-কাহফ এ যুবকদের ঘটনা পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। যাদেরকে "আসহাবে কাহফ" বা গুহাবাসী বলা হয়।

🔶এবার আসুন সংক্ষেপে যুবকদের ঘটনাটি সম্পর্কে জানি।

একদল ধর্মপরায়ণ যুবক যারা এক মূর্তিপূজক অত্যাচারী রোমান সম্রাট যে কিনা ধর্মের ব্যাপারে মানুষের ওপর জোরদারি চালাত। কেউ যদি তখনকার সত্য দ্বীনের অনুসারী হতো, তাকে ডেকে সে দুইটি বিকল্পের একটি গ্রহণের কথা বলত।

প্রথম বিকল্প হলো, তার মতো মূর্তিপূজারি হয়ে সত্য ধর্মকে ত্যাগ করা।

অথবা দ্বিতীয় বিকল্প হলো, তার জল্লাদের হাতেই প্রাণ দেয়া। আর এ দুইটি বিকল্পের যে কোনো একটিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতে হয়। চিন্তাভাবনা করার সময় দেয়া হয় না।

এমন অবস্থায় সে রাজ্যের কয়েকজন যুবককে রাজদরবারে ডেকে আনা হলো, তাদের সামনে দুইটি বিকল্প পেশ করা হলো। তবে তাদের বয়সের দিকে খেয়াল করে রাজা তাদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হলো। তাদের কয়েক দিন চিন্তাভাবনা করার সুযোগ দেয়া হলো,যা অন্যদের দেয়া হয় না। তারা রাজদরবার থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর অনেক চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত করল তারা এ দুই বিকল্পের একটিকেও গ্রহণ করতে চায় না।

বরং তারা অন্য কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করবে এবং সত্য ধর্মে থেকে আল্লাহর ইবাদত করবে।পরে রাজার উৎপীড়ন থেকে নিজেদের ঈমান ও জীবন রক্ষার জন্য পাহাড়ের একটি গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গুহার ভেতর প্রায় ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে রেখেছিলেন। যখন তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হল, তাদের একজন সাথীকে একটি মুদ্রা দিয়ে খাবার কিনে আনার জন্য পাঠাল। যখন সে শহরে প্রবেশ করল, দেখতে পেল পুরো শহর সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। দোকানী এত প্রাচীন মুদ্রা দেখে হতবিহ্বল হয়ে গেল। সে মনে করল, এই যুবক কোনো ধরনের ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে এবং সে এই মুদ্রার উৎস সম্পর্কে জানতে চাইল। যুবকটি এমন বিপত্তির মুখে পড়ে আরও অধিক বিস্মিত হল।

বিষয়টি শেষ পর্যন্ত রাজ দরবার পর্যন্ত গড়াল। রাজা যুবকটির কাহিনী শুনে বিস্মিত হলেন। অতঃপর তার সভাসদদের সঙ্গে নিয়ে সেই গুহার কাছে গেলেন এবং যুবকদেরকে তাদের জন্য দুআ করতে বললেন। পরবর্তীতে তারা সেই একই গুহার মধ্যেই বসবাস করতে লাগল এবং মৃত্যু বরণকরল।একটি কুকুরও তাদের সাথে ছিল।কুকুরসহ এদেরকে আসহাবে কাহফ বা গুহাবাসী বলা হয়।

🔶এ ঘটনা থেকে কতিপয় শিক্ষা:

১) ভবিষ্যতে কোন কাজ করতে ইচ্ছা করলে আমাদের প্রথমে ইনশা-আল্লাহ্ বলা উচিৎ।
২) একত্ববাদের এবাদত করা এবং তাঁর এবাদতে অন্য কিছুকে শরীক না করা।
৩) যুবকদের সাহসের সাথে আল্লাহর বাণী প্রচার করা জরুরী।
৪) চিন্তা ও গবেষণা করে কুরআন ও কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলো অধ্যয়ন করা।
৫) বিপদাপদে আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর দয়া কামনা করা জরুরী।
৬)প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সত্যের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব অপরিসীম।
৭) তিন শত নয় বছর পর তাদেরকে জীবিত করা এটাই প্রমাণ করে যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য, কিয়ামত সত্য। এতে কোন সন্দেহ নেই।রুহ এবং দেহ উভয়েরই পুনরুত্থান হবে। কেননা আসহাবে কাহাফগণ এভাবেই জীবিত হয়েছিলেন।
৮) হেদায়াত আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বান্দার প্রতি বিরাট একটি নেয়ামত। বান্দার উচিত সর্ব অবস্থায় আল্লাহর কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করা।

৯) আসহাবে কাহাফের ঘটনা, পরকাল বিশ্বাসের সত্যতার এক উজ্জ্বল ও অকাট্ট প্রমাণ বিশেষ। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে আসহাবে কাহাফকে এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত মৃত্যুর মহানিদ্রায় নিমজ্জিত রাখার পরও পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন, অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন দান করাও তাঁর কুদরতে সামান্যতমও অসম্ভব নয়।এছাড়াও আরও অসংখ্য শিক্ষণীয় দিক আছে উক্ত ঘটনায়।

পর্ব ৩৪ নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া

🔶সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার পর এ ঘটনা ঘটেঃ

আল্লাহ তাআলা এ সূরায় বলছেনঃ আবু লাহাবের দুই হস্ত ধ্বংস হোক! না তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে এসেছে, না তার উপার্জন তার কোন উপকার করেছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার স্বজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানালেন তখন আবু লাহাব বলতে লাগলোঃ "যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয় তবে আমি কিয়ামতের দিন আমার ধন সম্পদ আল্লাহকে ফিদিয়া হিসেবে দিয়ে তার আযাব থেকে আত্মরক্ষা করবো।" আল্লাহ তাআলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।

এরপর আল্লাহ বলেনঃ অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও। অর্থাৎ আবু লাহাব তার স্ত্রীসহ জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে প্রবেশ করবে। আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরায়েশ নারীদের নেত্রী। তার কুনিয়াত ছিল উম্মু জামীল, নাম ছিল আরওয়া বিনতু হারব ইবনে উমাইয়া। সে আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর বোন ছিল। তার স্বামীর কুফরী, হঠকারিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল সহকারিণী, সহযোগিণী। এ কারণে কিয়ামতের দিন সেও স্বামীর সঙ্গে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। কাঠ বহন করে নিয়ে সে তা ঐ আগুনে নিক্ষেপ করবে যে আগুনে তার স্বামী জ্বলবে। তার গলায় থাকবে আগুনের পাকানো রশি।আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকানো রজ্জু। অর্থাৎ সে স্বামীর ইন্ধন সংগ্রহ করতে থাকবে।

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর 'গীবতকারিণী' অর্থও করা হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ অর্থই পছন্দ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বর্ণনা করেছেন যে, আবু লাহাবের স্ত্রী জঙ্গল থেকে কাঁটাযুক্ত কাঠ কুড়িয়ে আনতে এবং ঐ কাঠ রাসূলুল্লাহর চলার পথে বিছিয়ে দিতো। এটাও বলা হয়েছে যে, এ নারী রাসুলুল্লাহকে ভিক্ষুক বলে তিরস্কার করতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মু জামীল বিনতু হারব নিজের হাতে কারুকার্য খচিত, রং করা পাথর নিয়ে কবিতা আবৃত্তির সূরে নিম্নলিখিত কথাগুলো বলতে বলতে রাসূলুল্লাহর নিকট আগমন করেঃ

"আমি মুযাম্মামের (নিন্দনীয় ব্যক্তির) অস্বীকারকারিণী, তার দ্বীনের দুশমন এবং তার হুকুম অমান্যকারিণী।"

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সময় কা'বা গৃহে বসেছিলেন। তাঁর সাথে আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। আমার আব্বা তাকে এ অবস্থায় দেখে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! সে আসছে, আপনাকে আবার দেখে না ফেলে!" রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেনঃ "হে আবু বকর (রাঃ)! নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমাকে দেখতে পাবেই না। তারপর তিনি ঐ দুষ্টা নারীকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

অর্থাৎ 'যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার মধ্যে এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে গোপন পর্দা টেনে দিই।" (সূরা বনী ইসরাইলঃ আয়াত ৪৫)

এ নারী হযরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে এসে দাড়ালো। রাসূলুল্লাহও সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পাশেই ছিলেন। কিন্তু কুদরতী পর্দা তার চোখের সামনে পড়ে গেল। সুতরাং সে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতে পেলো না।

এ নারী হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বললোঃ "আমি শুনেছি যে, তোমার সাথী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুর্নাম করেছে অর্থাৎ কবিতার ভাষায় আমার বদনাম ও নিন্দে করেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ "কা'বার প্রতিপালকের শপথ! রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কোন নিন্দে করেননি।" আবু লাহাবের স্ত্রী তখন ফিরে যেতে যেতে বললোঃ "কুরায়েশরা জানে যে, আমি তাদের সর্দারের মেয়ে।"

একবার এ দুষ্টা রমনী নিজের লম্বা চাদর গায়ে জড়িয়ে তাওয়াফ করছিল, হঠাৎ পায়ে চাদর জড়িয়ে পিছনে পড়ে গেল। তখন বললোঃ "মুযাম্মাম ধ্বংস হোক।" তখন উম্ম হাকীম বিনতু আবদিল মুত্তালিব বললোঃ "আমি একজন পবিত্র রমনী। আমি মুখের ভাষা খারাপ করবো না। আমি বন্ধুত্ব স্থাপনকারিণী, কাজেই আমি কলঙ্কিনী হবো না এবং আমরা সবাই একই দাদার সন্তান, আর কুরায়েশরাই এটা সবচেয়ে বেশী জানে।"

আবু বকর বার (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যখন تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। তখন আবু লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন এবং তার সাথে হযরত আবু বকরও (রাঃ) ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! ঐ যে সে আসছে, আপনাকে সে কষ্ট দেয়। না কি!" তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমাকে দেখতে পাবে না।" অতঃপর আবু লাহাবের স্ত্রী হযরত আবু বকর (রাঃ)

কে বললোঃ “তোমার সাথী (কবিতার ভাষায়) আমার দুর্নাম রটনা করেছে।” হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন কসম করে বললেমঃ “রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাব্য চর্চা করতে জানেন না এবং তিনি কবিতা কখনো বলেননি।”দুষ্টা নারী চলে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “তার চলে যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে, উম্মু জামীলের গলায় আগুনের রশি লাগিয়ে দেয়া হবে এবং ঐ রশি ধরে টেনে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর রশি ঢিলে করে তাকে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে এ শাস্তিই তাকে ক্রমাগতভাবে দেয়া হবে।

পর্ব ৩৫: দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে সফর

🔶সূরা কাহফঃ আয়াত ৬২-৮২

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (عليه السلام)-এর দু' সমুদ্রের মিলনস্থলে খাজির (عليه السلام)-এর সাথে যে সাক্ষাত হয়েছিল এবং তাদের মাঝে যে ঘটনা ঘটেছিল সে ঘটনা আলোচনা করেছেন। এ ঘটনা অত্র সূরার এ আয়াতগুলোসহ সহীহ বুখারীর ৩০৪১ ও ৪৭২৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

🔶সংক্ষিপ্ত ঘটনা:

উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: একদা মূসা (عليه السلام) জনসম্মুখে ভাষণ প্রদান করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলল: আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে বলে আপনি জানেন? মূসা (عليه السلام) বললেন: না। এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিরস্কার করলেন, কেন এ ব্যাপারের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার দিকে সোপর্দ করেনি।

আল্লাহ তা'আলা বললেন: হ্যাঁ, আমার বান্দা খাজির তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মূসা (عليه السلام) বললেন: হে আল্লাহ তা'আলা তাকে কোথায় পাব? আল্লাহ তা'আলা বললেন: (مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) দু'সাগরের মধ্যস্থলে। তখন মূসা (عليه السلام) বললেন: 'দু' সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌঁছিয়ে আমি থামব না অথবা আমি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকব।' মূসা (عليه السلام) ও যুবক ইউশা বিন নূন এ দু'জন খাজির (عليه السلام)-এর কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য সাগরের দিকে ভ্রমণ করলেন।

(আযওয়াউল বায়ান) খাজির (عليه السلام)-কে সন্ধানের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি নিদর্শন দিলেন। তা হল সাথে একটি মাছ নেয়ার নির্দেশ দিলেন, যেখানে মাছ হারিয়ে যাবে সেখানেই তাঁকে পাওয়া যাবে। তারা উভয়ে থলের ভেতর মাছ নিয়ে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখন্ডের ওপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। আল্লাহ তা'আলা সেপথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা মাছটিকে সমুদ্রে যেতে দেখেন কিন্তু মূসা (عليه السلام) কে বলতে ভুলে যান। মূসা (عليه السلام) ঘুম থেকে উঠে রওনা দিলেন। একদিন এক রাত অনেক রাস্তা অতিক্রম করার পর যখন খুব ক্ষুধা অনুভব করলেন তখন মূসা (عليه السلام) বললেন: 'আমাদের সকালের খাবার আন, আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

তখন ইউশা বললেন: যেখানে আমরা পাথরের ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আর আপনি ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে মাছটি থলে থেকে বের হয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমি আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। আসলে শয়তানই আমাকে ভুলিয়েছে।

মূসা (عليه السلام) বললেন: যেখানে মাছটি সুড়ঙ্গ করে চলে গেছে সেখানেই তো আমাদের গন্তব্য। তাই নিজের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে প্রত্যাবর্তন করে আসলেন এবং দু' সমুদ্রের মিলনস্থলে ফিরে গেলেন। قَصَصًا অর্থ পদাঙ্ক অনুসরণ করে পেছনে ফিরে আসা। তারা উভয়ে দু' সমুদ্রের মিলনস্থলে এসে খাজির (عليه السلام) কে পায়। (عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ) দ্বারা উদ্দেশ্য খাজির (عليه السلام), খাজির অর্থ সবুজ-শ্যামল। তিনি একদা সাদা জমিনের ওপর বসলে জমিনের সে অংশটুকু সবুজ হয়ে যায়। এ কারণেই তাকে খাজির বলা হয়। (সহীহ বুখারী, সূরা কাহফের তাফসীর)

আল্লাহ তা'আলা খাজির (عليه السلام) কে رَحمةً তথা নবুওয়াত দান করেছেন। যখন তারা তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি মাথা ঢাকা অবস্থায় ছিলেন। মূসা (عليه السلام) সালাম দিলে তিনি মাথা তুলে তাকালেন এবং বললেন: আমি তোমার সালামে সন্তুষ্ট। তিনি বললেন: তুমি কে? মূসা (عليه السلام) বললেন: আমি মূসা। খাজির (عليه السلام) বললেন: বানী ইসলাঈলের মূসা? মূসা (عليه السلام) বললেন: হ্যাঁ। খাজির (عليه السلام) বললেন: কেন এসেছ? তিনি বললেন: আপনার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছি। খাজির (عليه السلام) বললেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে তাওরাত প্রদান করেছেন তা কি যথেষ্ট নয়? এ ঘটনা প্রমাণ করে মানুষ যত বড় জ্ঞানী হোক সে আরো অধিক জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا) "বল: 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।" (সূরা ত্বা-হা ২০:১১৪)

মূসা (عليه السلام) একজন সম্মানিত নাবী, শুধু নাবী নন, উলূল আযম বা শ্রেষ্ঠ রাসূলদের অন্যতম একজন। এতদসত্ত্বেও তিনি অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ করেছেন। আর খাজির (عليه السلام) শুধু নিজের শরীয়তেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। যখন মূসা (عليه السلام) বললেন: আমি আপনার কাছে জ্ঞানার্জনের জন্য এসেছি। খাজির (عليه السلام) বললেন: (আমার কাছে থেকে জ্ঞানার্জন করতে) তুমি সক্ষম হবে না। মূসা (عليه السلام) বললেন: ইনশা-আল্লাহ তা'আলা আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। খাজির (عليه السلام) বললেন: তুমি যদি তাই চাও, তাহলে তোমাকে কিছু না বলা পর্যন্ত আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু এমন কিছু দেখতে পাবে যাতে তুমি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে না। মূসা (عليه السلام) বললেন: ইনশা-আল্লাহ তা'আলা আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

তাঁরা সমুদ্র উপকূল দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। একদা তাদের পাশ দিয়ে নৌকা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। খাজির (عليه السلام) ইশারায় নৌকা থামাতে বললে মাঝিরা নৌকা থামাল। কারণ তারা খাজির ও মূসা (عليه السلام) উভয়কে চিনত। ফলে বিনা ভাড়ায় নৌকার মালিক তাদের উভয়কে আরোহন করাল। (পথ অতিক্রমের পর) খাজির (عليه السلام) একটি কুড়াল

নিয়ে নৌকা ছিদ্র করে দিলেন এমনকি নৌকাতে পানি উঠতে লাগল। মূসা (عليه السلام) বিস্মিত হলেন, ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ, তারা আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করল, বিনা ভাড়ায় নৌকায় আরোহন করাল, আর আপনি নৌকাটি নষ্ট করে দিলেন। আপনি এক গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন। (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا) আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!' (সূরা কাহফ ১৮:৭১) মূসা (عليه السلام) তাকে তিরস্কার করলেন। খাজির (عليه السلام) বললেন:'আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না?' (সূরা কাহফ ১৮:৭২)

মূসা (عليه السلام) বললেন: 'আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না ও আমার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' (সূরা কাহফ ১৮:৭৩)

অতঃপর তারা কোন একটি এলাকায় অবতরণ করে হাঁটতে লাগলেন এবং একটি ছোট বালককে হাঁটতে দেখলেন। খাজির (عليه السلام) তাকে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করলেন। মূসা (عليه السلام) খুব বিরক্তবোধ করলেন এবং বললেন: সুবহানাল্লাহ, অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করলেন। আপনি এক গুরুতর অপরাধ করেছেন। (সূরা কাহফ ১৮:৭৪)

প্রথম ও দ্বিতীয়বার খাজির (عليه السلام) মূসা (عليه السلام) কে বললেন: 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? (সূরা কাহফ ১৮:৭৫)

মূসা (عليه السلام) বললেন: এটাই সর্বশেষ, এরপর আপনাকে জিজ্ঞেস করলে আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এরপর তারা কোন এক গ্রাম বা শহরবাসীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। তাদের কাছে তারা আপ্যায়নের আবেদন জানালেন। কিন্তু তারা আপ্যায়নের পরিবর্তে তিরস্কার করল এবং তাড়িয়ে দিল। মেহমানের অধিকার আদায় করল না। তারা উভয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম একটি দেয়াল দেখতে পেল। খাজির (عليه السلام) তা মেরামত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং বললেন: এটা অবশ্যই স্থাপন করা আবশ্যক। মূসা (عليه السلام) বললেন: সুবহানাল্লাহ, মানুষেরা আমাদের তিরস্কার করল, মেহমানদারী করল না এতদসত্ত্বেও তাদের কাজ করে দিলেন? খাজির (عليه السلام) বললেন: এখানেই আপনার ও আমার মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটল। (সূরা কাহফ ১৮:৭৮)

এরপর খাজির (عليه السلام) এ বিষয়গুলোর তাৎপর্য বর্ণনা করে দিলেন। যে নৌকা তিনি ছিদ্র করে নষ্ট করে দিয়েছেন তা কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির ছিল যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। তাদের একজন বাদশা ছিল যে বল প্রয়োগ করে ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত। আমি চাচ্ছিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে যাতে নৌকাটি ঐ দরিদ্র ব্যক্তিদের থেকে যায়।

যে ছিদ্র আমি করেছিলাম তা বন্ধ করে দেবে ফলে নৌকা ভালই থেকে যাবে। কেননা যে নৌকাতে ত্রুটি থাকে জালিম বাদশা তা নেয় না। আর বালক (যাকে মেরেছি) যদি সে বেঁচে

থাকত তাহলে কাফির হত। সে বড় হয়ে পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করত ও তাদেরকে কুফরীর দিকে নিয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর চেয়ে উত্তম সন্তান দান করবেন। আর দেয়াল, (যা আমি মেরামত করেছি) তা ছিল শহরের দু' ইয়াতীম বালকের। এ দেয়ালের নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল। তাদের পিতা একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

যদি দেয়ালটি এভাবে রেখে দেয়া হতো ফলে ভেঙ্গে পড়ে যেত, এতে তাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আমি তা মেরামত করে দিয়েছি যাতে তাদের সম্পদ হেফাযতে থাকে এবং তারা সম্পদের জায়গা চিনে নিতে পারে।খাজির (عليه السلام) এখনো বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন? এ বিষয়ে সঠিক কথা হল তিনি মারা গেছেন। আল্লামা শানকিতী এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (তাফসীর (আযওয়াউল বায়ান)

অর্থাৎ খাজির (عليه السلام)-এর কাছে এমন জ্ঞান ছিল যা মূসা (عليه السلام)-এর কাছে ছিল না। এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে সুফিবাদীরা দাবী করে থাকে নাবী নয় এমন কতক লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইলমে লাদুন্নী (বিশেষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান) দান করে থাকেন। যেমন এ হাদীসেও বলা হয়েছে: খাজির বললেন: হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়নি, আর আপনাকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে যা আমাকে দেয়া হয়নি। সুতরাং ইলমে লাদুন্নী বা বাতেনী জ্ঞান বলতে কিছু রয়েছে যা বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দেয়া হয়। এ জ্ঞান শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুফীবাদের এ দাবী সঠিক নয়; বরং এটা তাদের অজ্ঞতা ও কুপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। কারণ মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় আল্লাহ শরীয়তের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন

((ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ))

"এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের সঠিক ও শরীয়তের ওপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না।" (সূরা জাসিয়া ৪৫:১৮)

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা খাজির (عليه السلام) কে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন সে কথা পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন, অথচ অন্য কারো সম্পর্কে এ ধরণের কথা বলা হয়নি। যদি এটাকে ব্যাপক করে দেয়া হয় তাহলে জাদুকর ও ভেল্কিবাজ এ ধরনের দাবী করতে পারে। সুতরাং তাদের এ দাবী অযৌক্তিক।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. বান্দা যতই জ্ঞানী হোক, তার জন্য অহঙ্কার করা শোভা পায় না।
২. বড় জুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য কারো ওপরে ছোট-খাট জুলুম করা বৈধ।
৩. ছোটদের কাছেও বড়দের শিক্ষণীয় বিষয় থাকতে পারে।

৪. নাবীরা অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না, যেমন মূসা (عليه السلام) পারছিলেন না।

৫. শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য দূরে ভ্রমণ করা বৈধ।
৬. কোন বিষয় না জানলে আল্লাহ তা'আলার দিকে সোপর্দ করা উচিত।
৭. যে বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা প্রথমে শুরু করা উচিত, যেমন মূসা (عليه السلام) যখন জানতে পারলেন তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী রয়েছে তখন তিনি সেটাই আগে জানার জন্য গুরুত্ব দিলেন।
৮. খারাপ কাজ ঘটে গেলে শয়তানের দিকে সোপর্দ করা যায়, যেহেতু সে কুমন্ত্রণা দিয়ে করিয়েছে।
৯. ইলম অর্জনের জন্য উস্তাদের কাছে বিনয়ী হওয়া আবশ্যক।

পর্ব ৩৬: মাথার উপর পাহাড়

🔶সূরা আরাফঃ আয়াত ১৭১
🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ৬৩

এবং (সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের থেকে (তাওরাতের অনুসরণ সম্পর্কে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর উত্তোলন করে ধরেছিলাম (আর বলেছিলাম যে,) আমি তোমাদেরকে যা (যে কিতাব) দিয়েছি, তা শক্ত করে ধর ৫৪ এবং তাতে যা (লেখা) আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাওরাত নিয়ে আসলে বনী ইসরাঈল লক্ষ্য করে দেখল তার কোনও কোনও বিধান বেশ কঠিন। তাই তারা তা থেকে বাঁচার অজুহাত খুঁজতে শুরু করল। প্রথমে তারা বলল, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাদের বলে দিন যে, তাওরাত মানা আমাদের জন্য অপরিহার্য। তাদের এ দাবী যদিও অযৌক্তিক ছিল, তথাপি প্রমাণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এটা মেনে নেওয়া হল। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোককে বাছাই করে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তূর পাহাড়ে পাঠানো হল (যেমন সূরা আরাফের (৭ : ১৫৫) নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)।

আল্লাহ তাআলা সরাসরি তাদেরকে তাওরাত মেনে চলার হুকুম দিলেন। অতঃপর তারা যখন ফিরে আসল, তখন নিজ সম্প্রদায়ের সামনে আল্লাহ তাআলার সে হুকুমের কথা তো স্বীকার করল, কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে একটা কথা যোগ করে দিল। তারা বলল, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু মেনে চলবে; যা পারবে না আমি তা ক্ষমা করে দেব।

সুতরাং তাওরাতের যে নির্দেশই তাদের দৃষ্টিতে কিছুটা কঠিন মনে হত, তারা বাহানা তৈরি করে বলত, এটাও সেই ছাড় দেওয়া নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরে বললেন, তাওরাতের সমুদয় বিধান মেনে নাও। তাদের যখন আশংকা হল, পাহাড়টিকে তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হতে পারে, তখন তারা তাওরাত মানার ও সে অনুযায়ী আমল করার প্রতিশ্রুতি দিল। এ আয়াতে সে ঘটনার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরাটা প্রকৃত ও বাচ্যার্থেও সম্ভব। অর্থাৎ পাহাড়টিকে তার স্থান থেকে উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপরে ঝুলিয়ে ধরা হয়েছিল।

হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) বহু তাবিঈ হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা হিসেবে এটা কিছু কঠিন কাজ নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, এমন কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল, যদ্দরুণ তাদের মনে হয়েছিল পাহাড়টি বুঝি তাদের উপর পতিত হবে, যেমন হয়ত তখন প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল। ফলে তাদের ধারণা হয়েছিল পাহাড়টি উৎপাটিত হয়ে তাদের উপর পড়বে।

সুতরাং এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوْا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ আরাফ (৭ : ১৭১)। এতে نتق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার এক অর্থ সজোরে নাড়ানো (দেখুন আল-কামূস ও মুফরাদাতুল কুরআন)। সুতরাং আয়াতটির এরূপ অর্থও করা যেতে পারে যে, ‘যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপর সজোরে এমনভাবে নাড়াতে থাকি যে, তাদের মনে হচ্ছিল সেটি তাদের উপর পতিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কাউকে চাপ সৃষ্টি করে ঈমান আনতে বাধ্য করা যায় না বটে, কিন্তু কেউ যদি ঈমান আনার পর নাফরমানী করে, তবে সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া এবং হুমকি-ধমকি দিয়ে হুকুম মানতে প্রস্তুত করা মোটেই অসঙ্গত নয়।

বনী ইসরাঈল যেহেতু আগেই ঈমান এনেছিল, তাই আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

পর্ব ৩৭: পরীক্ষা হোক এমন

🔶সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৮৩

এবং স্মরণ করুন আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান।

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোআ করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবাই উধাও হয়ে গিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করেন।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর নবী আইয়ুব আলাইহিস সালাম আঠারো বছর মুসীবত ভোগ করেছিলেন। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাকে তার ভাই বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে দু'জন ব্যতীত সবাই ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। এ দু'জন সকাল বিকাল তার কাছে আসত।

তাদের একজন অপরজনকে বললঃ জেনে নাও আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আইয়ুব এমন কোন গোনাহ করেছে যার মত গোনাহ সৃষ্টিজগতের কেউ করেনি। তার সাথী বললঃ এটা কেন বললে? জবাবে সে বললঃ আঠারো বছর থেকে সে এমন কঠিন রোগে ভুগছে অথচ আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে তা থেকে মুক্তি দিচ্ছে না। এ কথা শোনার পর সাথীটি আইয়ুব আলাইহিস সালামের সাথে দেখা করতে গিয়ে ব্যথিত হয়ে কথাটি তাকে জানিয়ে দিল।

তখন আইয়ুব আলাইহিস সালাম তাকে বললেনঃ আমি জানি না তুমি কি বলছ, তবে আল্লাহ্ জানেন পূর্বে আমি কখনও কখনও ঝগড়ায় লিপ্ত দু'জনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এটাও শুনতাম যে, তারা আল্লাহর কথা বলে বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তখন আমি বাড়ী ফিরে তাদের পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করতাম এই ভয়ে যে, তারা হক ছাড়া অন্য কোন ভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনি তো?

ঘটনা বর্ণনা করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আইয়ুব আলাইহিস সালাম তার প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হতেন। কাজ সারার পর তার স্ত্রী তার হাত ধরে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি তাঁর প্রাকৃতিক কাজ সারার পর তার স্ত্রীর কাছে

ফিরতে দেরী করছিলেন এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ুব আলাইহিস সালামের কাছে ওহী পাঠালেন যে, "আপনি আপনার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করুন, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।" [সূরা সোয়াদ: ৪২]

তার স্ত্রী তার আগমনে দেরী দেখে নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌছলেন। তখন আইয়ুব আলাইহিস সালামের যাবতীয় মুসিবত দূর হয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় সুন্দর হয়ে গেলেন। তার স্ত্রী তাকে দেখে বললেনঃ হে মানুষ! আল্লাহ আপনার উপর বরকত দিন, আপনি কি ঐ বিপদগ্রস্ত আল্লাহর নবীকে দেখেছেন? আল্লাহর শপথ, যখন সে সুস্থ ছিল তখন সে ছিল আপনার মতই দেখতে। তখন আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেন যে, আমিই সেই ব্যক্তি।

আইয়ুব আলাইহিস সালামের দুটি উঠান ছিল। একটি গম শুকানোর অপরটি যব শুকানোর। আল্লাহ্ তা'আলা সে দু'টির উপর দুখণ্ড মেঘ পাঠালেন। এক খণ্ড মেঘ সে গমের উঠোনে এমনভাবে স্বর্ণ ফেললো যে, সেটি পূর্ণ হয়ে গেল। অপর মেঘ খণ্ডটি সেটির উপর এমনভাবে রৌপ্য বর্ষণ করল যে, সেটাও পূর্ণ হয়ে গেল। [সহীহ ইবন হিব্বান: ৭/১৫৭, হাদীস নং ২৮৯৮, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৬৩৫, ৪১১৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একবার আইয়ুব আলাইহিস সালাম কাপড় খুলে গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ঝাক স্বর্ণের টিড্ডি (পঙ্গপাল) তার উপর পড়তে আরম্ভ করল, তিনি সেগুলো মুঠি মুঠি তার কাপড়ে জমা করছিলেন।

তখন তার প্রভু তাকে ডেকে বললেনঃ হে আইয়ুব, আমি কি আপনাকে যা দেখছেন তা থেকেও বেশী প্রদান করে ধনী করে দেইনি? উত্তরে আইয়ুব আলাইহিস সালাম বললেনঃ অবশ্যই হে প্রভু! তবে আপনার দেয়া বরকত থেকে আমি কখনো অমুখাপেক্ষী হবো না। [বুখারী: ৩৩৯১, ২৭৯]

এ ছাড়া আইয়ুব আলাইহিস সালাম সংক্রান্ত আরো কিছু কাহিনী বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে এসেছে কিন্তু সেগুলো খুব বেশী গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি বিধায় এখানে উল্লেখ করা গেল না।

দো'আর ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন- "আপনি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" পরে কোন অভিযোগ ও নালিশ নেই, কোন জিনিসের দাবী নেই। তাতেই আল্লাহ খুশী হয়ে তার দোআ কবুল করলেন। পরবর্তী আয়াতে দোআ কবুল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর]

পর্ব ৩৮: সুলাইমান আঃ ও পিঁপড়া

🔶সূরা নামলঃ আয়াত ১৬-১৯
🔶সূরা সাবাঃ আয়াত ১২-১৩

🔶পিপীলিকার ঘটনা: একদা সুলাইমান (عليه السلام) তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীসহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ ও পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির টিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলাইমান (عليه السلام)-এর বাহিনীকে আসতে দেখে পিপীলিকার সর্দার শীঘ্র বাসস্থানে প্রবেশের নির্দেশ দিল যাতে বাহিনীর পদপিষ্ট হতে না হয়।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সৈন্য একত্রিত হলো যাদের মধ্যে মানুষ, জ্বিন, পাখী ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁর নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তারপর জ্বিন। পাখী তাঁর মাথার উপর থাকতো। গরমের সময় তারা তাঁকে ছায়া দিতো। সবাই নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার জন্যে যে জায়গা নির্ধারিত ছিল সে সেই জায়গাতেই থাকতো। এই সেনাবাহিনীকে নিয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ) চলতে রয়েছেন। একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁদেরকে গমন করতে হলো যেখানে পিপীলিকার সেনাবাহিনী ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সেনাবাহিনীকে দেখে একটি পিপীলিকা অন্যান্য পিপীলিকাকে বললোঃ "তোমরা নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান (আঃ) ও তার সেনাবাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।"

হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ঐ পিপীলিকাটির নাম ছিল হারস। সে বানু শায়সানের গোত্রভুক্ত ছিল। সে আবার খোঁড়া ছিল। সে অন্যান্য পিপীলিকার ব্যাপারে ভয় করলো যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ঘোড়াগুলো তাদের ক্ষুরের দ্বারা পিপীলিকাগুলোকে পিষে ফেলবে।

পিপীলিকাটির এ কথা শুনে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর হাসি আসলো এবং তৎক্ষণাৎ তিনি দু'আ করলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্যে। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ এই যে, আপনি আমাকে পাখী ও জীব-জন্তুর ভাষা শিখিয়েছেন ইত্যাদি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনার ইনআম এই যে, তাঁরা মুমিন ও মুসলমান হয়েছেন ইত্যাদি। আর আমাকে তাওফীক দিন যাতে আমি সৎ কার্য করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন।

তাফসীরকারদের উক্তি রয়েছে যে, এই উপত্যকাটি সিরিয়ায় অবস্থিত ছিল। কেউ কেউ অন্য জায়গাতে বলেছেন। এই পিপীলিকাটি মাছির মত দুই পালক বিশিষ্ট ছিল। অন্য উক্তিও রয়েছে। নাওফ বাক্কালী (রঃ) বলেন যে, পিপীলিকাটি নেকড়ে বাঘের মত ছিল। খুব সম্ভব, আসলে শব্দ লিখে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত সুলাইমান (আঃ) জীব-জন্তুর ভাষা বুঝতে পারতেন বলে ঐ পিপীলিকাটির কথা তিনি বুঝে নেন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর হাসি এসে যায়।

আবুস সাদীক নাজী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) বৃষ্টির পানি চাওয়ার জন্যে বের হন। তিনি দেখতে পান যে, একটি পিপীলিকা উল্টোভাবে শুয়ে পা আকাশের দিকে উঠিয়ে দু'আ করতে রয়েছেঃ “হে আল্লাহ! আমরাও আপনার সৃষ্টজীব। বৃষ্টির পানির আমরাও মুখাপেক্ষী। যদি আপনি বৃষ্টি বর্ষণ না করেন তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।” পিপীলিকাকে এভাবে দু'আ করতে দেখে নিজের লোকেদের মধ্যে ঘোষণা করে দেনঃ “চল, ফিরে যাই। অন্য কারো দুআর বরকতে তোমাদেরকে বৃষ্টির পানি পান করানো হবে।” (এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “কোন এক নবীকে একটি পিপীলিকায় কামড়িয়ে নেয়। তিনি তখন পিপীলিকাসমূহের গর্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐ নবীর নিকট অহী করেনঃ “একটি পিপীলিকায় তোমাকে কেটেছে বলে আমার তাসবীহ পাঠকারী পিপীলিকার বিরাট দলকে তুমি ধ্বংস করে দিলে? প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা থাকলে যেটা তোমাকে কেটেছে ওর থেকেই প্রতিশোধ নিতে?” (এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে)

পর্ব ৩৯: সুলাইমান আঃ ও হুদহুদ পাখি

🔶সূরা নামলঃ আয়াত ২৯-৩১

হুদহুদ পাখির ঘটনা: আল্লাহ তা'আলার হুকুমে পক্ষীকুল সুলাইমান আঃ এর আনুগত্য লাভ করে। একদিন পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত করেন ও তাদের খোঁজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, হুদহুদ পাখিটি নেই। তিনি যখন হুদহুদ পাখিকে দেখতে পেলেন না তখন সবাইকে সম্বোধন করে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কী হল যে, আমি হুদহুদ পাখিকে দেখতে পাচ্ছি না? (অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি অন্যের দিকে সম্পৃক্ত না করে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা জ্ঞানী লোকের পরিচয়) তখন সুলাইমান রাগান্বিত হয়ে অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার নির্দেশ দিলেন এবং উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে দিলেন। অন্যথায় তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে নতুবা জবাই করা হবে বলে হুশিয়ার করলেন। তার কিছুক্ষণ পরই হুদহুদ পাখি এসে হাজির হল এবং সুলাইমানকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এমন বিষয়ে সংবাদ নিয়ে এসেছি যে বিষয়ে আপনি অবগত নন। এ কথা বলেই সে তার আনীত নতুন সংবাদের রিপোর্ট পেশ করল। হুদহুদ পাখি দ্বারা এ কথা বলানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সংবাদ দিচ্ছেন যে, নাবীগণ গায়েবের খবর জানেন না। তাঁরা কেবল ততটুকুই জানেন যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ওয়াহী মারফত জানান।

উল্লেখ্য যে, হুদহুদ এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম। যা পক্ষীকুলের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে কম। দুনিয়াতে এত পাখি থাকতে হুদহুদ পাখির খোঁজ নেয়ার কারণ সম্পর্কে নও মুসলিম ইয়াহূদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (رحمه الله) -কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: সুলাইমান (عليه السلام) তাঁর বাহিনী নিয়ে সে সময় এমন এক অঞ্চলে ছিলেন যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি ওপর থেকে দেখতে পায় (কুরতুবী)।

রাণী বিলকীসের ঘটনার সার সংক্ষেপ:

সুলাইমান (عليه السلام)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামান তথা 'সাবা' রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলকীস বিনতুস সারাহ বিন হাদাহিদ বিন শারাহীল। তিনি ছিলেন সাম বিন নূহ (عليه السلام)-এর ১৮তম অধস্তন বংশধর। তাঁর ঊর্ধ্বতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল 'সাবা' (কুরতুবী)। সম্ভবতঃ তাঁর নামেই 'সাবা' সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক জীবনোপকরণ দিয়েছিলেন এবং নাবীগণের মাধ্যমে এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তানের চক্রে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয় এবং 'সূর্য পূজারী' হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর প্লাবণের আযাব প্রেরণ করেন এবং ধ্বংস করে দেন। সূরা সাবার ১৫-১৭ নং আয়াতে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হুদহুদ পাখি নতুন সংবাদ দিল যে, আমি এক মহিলাকে দেখলাম যে, সে সাবাবাসীর ওপর রাজত্ব করছে। তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার এক বিরাট সিংহাসন রয়েছে। আমি তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করছে। শয়তান তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বাধা প্রদান করেছে যার ফলে তারা পথভ্রষ্ট।

তখন সুলালমান (عليه السلام) বললেন: আমি বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করব, দেখব তুমি সত্য বলছো না মিথ্যা বলছো। এ রাজ্য সম্পর্কে সুলাইমান (عليه السلام)-এর অজানাটা বিস্ময়কর কিছু নয়। ইউসুফ (عليه السلام)-কে বাড়ির অনতিদূরে কূপে নিক্ষেপ করা হল অথচ ইয়া'কূব (عليه السلام) জানলেন না। আয়িশাহ (رضي الله عنها) এর গলার হার হারিয়ে গেল অথচ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে পারলেন না। যাই হোক সুলাইমান (عليه السلام) হুদহুদ পাখিকে একটি চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি চিঠি দিয়ে একটু দূরে সরে পড়বে এবং তারা কী মতামত প্রকাশ করে তা শুনে আসবে।

বিলকীস যখন চিঠি পেল তখন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, হে পরিষদবর্গ! আমাকে একটি মহিমান্বিত পত্র দেয়া হয়েছে। এটি হল সুলাইমান (عليه السلام)-এর পক্ষ থেকে। আর তাতে রয়েছেন পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি। অতঃপর এতে বলা হয়েছে, তোমরা অহমিকা বশে আমাকে অমান্য কর না; বরং আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট উপস্থিত হও। তখন বিলকীস তার পারিষদবর্গকে এ বিষয়ে অভিমত জানাতে বললেন। তখন পারিষদবর্গ তাদের শক্তি, সাহস, ক্ষমতা ও প্রস্তুতির কথা ব্যক্ত করে বলল; তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি আপনার হাতেই। তখন বিলকীস বলল: যখন রাজা-বাদশাহ কোন দেশে আক্রমণ করে তখন ঐ দেশকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান লোকদেরকে অপদস্ত করে আর এরাও এরূপই করবে।

তখন বিলকীস সুলাইমান (عليه السلام)-এর নিকট দূতের মাধ্যমে উপঢৌকন পাঠাল যাতে তাদের মন-মানসিকতা জানতে পারে। যখন বিলকিসের দূতেরা উপঢৌকন নিয়ে সুলাইমান (عليه السلام)-এর নিকট আসল তখন সুলাইমান (عليه السلام) তা ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে এমন বাহিনীর মাধ্যমে যাদের মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা ওদের নেই। বরং সেখান থেকে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে বের করবে। আর তখন তারা হবে অবনমিত।

অতঃপর সুলাইমান (عليه السلام) তার সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করলেন, বিলকীস ও তার সৈন্য দল আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দিতে পারবে? তখন এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার বৈঠক হতে ওঠার পূর্বে আমি তা আপনাকে এনে দেব। অন্য একজন যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। এরপর যখন সে তা নিয়ে আসল তখন সুলাইমান (عليه السلام) তাকে বললেন: তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও: দেখি সে

তা চিনতে পারে, নাকি চিনতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর যখন বিলকীস আসল তখন তাকে বলা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? তখন সে বলল, এটা যেন সেটাই। তাকে বলা হল, এ প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওর প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন তার মনে হল এ এক স্বচ্ছ জলাশয় এবং সে তার কাপড় টেনে হাটু পর্যন্ত তুলে ধরল।

তখন সুলাইমান (عليه السلام) তাকে বললেন: এ-তো স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ। তখন বিলকীস তার অপরাধের কথা বুঝতে পেরে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং বলল, আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

(الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ)

'কিতাবের জ্ঞান যার ছিল' দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ নিয়ে তাফসীরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হল, তিনি ছিলেন স্বয়ং সুলাইমান (عليه السلام)। কেননা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। তিনি এর দ্বারা উপস্থিত জিন ও মানুষ পরিষদবর্গকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা অন্যের মাধ্যমে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে থাকেন। মূলত গোটা ব্যাপারটাই ছিল মু'জিযাহ এবং রাণী বিলকীসকে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এতে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সুদূর ইয়ামান থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বিলকীস তার সিংহাসনের আগাম উপস্থিতি ও প্রাসাদের অনন্য কারুকার্য দেখে লজ্জিত হয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়ে যায়। এটাই ছিল সুলাইমান (عليه السلام)-এর প্রধান লক্ষ্য।

পর্ব ৪০: ইনশাআল্লাহ না বলার পরিনতি

🔶সূরা কাহফঃ আয়াত ২৩
🔶সূরা নামলঃ আয়াত ১৫-৪৪

🔶ইনশাআল্লাহ তা'আলা না বলার পরিনতিঃ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম এই যে, একবার সুলাইমান (عليه السلام) এ মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, রাত্রিতে আমি (আমার ৯০ বা ১০০) সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হব। যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটি করে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও পরে তারা আল্লাহ তা'আলার পথে ঘোড় সওয়ার হয়ে জিহাদ করবে। কিন্তু এ সময় তিনি ইনশাআল্লাহ তা'আলা (যদি আল্লাহ তা'আলা চান) বলতে ভুলে যান। নাবীর এ ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করলেন না। ফলে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু ভূমিষ্ট হয়। (সহীহ বুখারী হা: ২৮১৯) এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সুলাইমান বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হলেও এবং জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও সকল জীবজন্তু তাঁর হুকুমবরদার হলেও আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না।

তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন:

(وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَدًا ۙ اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ)

"কখনই তুমি কোন বিষয়ে বল না, "আমি সেটা আগামীকাল করব, 'আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে' এ কথা বলা ছাড়া" (সূরা কাহফ ১৮:২৩)

কুরায়েশরা নাযার ইবনু হারিস ও উকবা' ইবনু মুঈতকে মদীনার ইয়াহুদী আলেমদের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং তাদেরকে বলেঃ "তোমরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সামনে মুহাম্মদের সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের মতামত কি তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে।" এই দু'জন তখন মদীনার ইয়াহূদী আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাদের সামনে হযরত মুহাম্মদের সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থা ও গুণাবলী বর্ণনা করে, তারা এদেরকে বলেঃ "দেখো, আমরা তোমাদেরকে একটা মীমাংসাযুক্ত কথা বলছি।

তোমরা ফিরে গিয়ে তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন, তবে তিনি যে সত্য নবী এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন, তবে তার মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না। তখন তোমরা তার ব্যাপারে যা ইচ্ছা করতে পার।”

তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ “পূর্বযুগে যে যুবকগণ বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা বর্ণনা করুন তো? এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা তারপর তাকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করবে যিনি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছিলেন। আর তাকে তোমরা রুহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন, তবে তোমরা তাকে নবী বলে স্বীকার করে নিয়ে তার অনুসরণ করবে। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তবে জানবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী। সুতরাং যা ইচ্ছা তা-ই করবে।"

এরা দু'জন মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরায়েশদেরকে বলেঃ

"শেষ ফায়সালার কথা ইয়াহূদী আলেমগণ বলে দিয়েছেন। সুতরাং চল আমরা তাকে প্রশ্নগুলি করি।”

অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে আগমন করে এবং তাঁকে ঐ তিনটি প্রশ্ন করে। তিনি তাদেরকে বলেনঃ “তোমরা আগামী কাল এসো, আমি তোমাদের এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবো।” কিন্তু তিনি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ চান তো) বলতে ভুলে যান।

এরপর পনেরো দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর কাছে না কোন ওয়াহী আসে, না আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে মক্কাবাসী ফুলে ওঠে এবং পরস্পর বলাবলি করেঃ “দেখো, কালকের ওয়াদা ছিল, আর আজ পনেরো দিন কেটে গেল, তবুও সে জবাব দিতে পারলো না।" এতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিগুণ দুঃখে জর্জরিত হতে লাগলেন।

একে তো কুরায়েশদেরকে জবাব দিতে না পারায় তাদের কথা শুনতে হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ ওয়াহী আসা বন্ধ হয়েছে। এরপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং সূরায়ে কাহফ অবতীর্ণ হয়। এতেই ইনশা আল্লাহ না বলায় তাঁকে সতর্ক করা হয়, ঐ যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়, ঐ ভ্রমণকারীর বর্ণনা দেয়া হয় এবং রুহের ব্যাপারে জবাব দেয়া হয়।

পর্ব ৪১: অলৌকিক জন্ম

🔶সূরা মারইয়ামঃ আয়াত ২৪-২৬
🔶সূরা মারইয়ামঃ আয়াত ৩০-৩৩

১৬-৪০ নং আয়াতের তাফসীর:

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ঈসা (عليه السلام)-এর মা মারইয়াম (عليه السلام) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কুরআনে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

اَنْتَبَذَتْ এর আসল অর্থ: দূরে নিক্ষেপ করা। انتباذ এর অর্থ লোকালয় থেকে নিরালায় চলে আসা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে পরিবার ও লোকালয় থেকে আলাদা হয়ে বায়তুল মুকাদদাসের পূর্ব দিকে পর্দা টাঙ্গিয়ে নিরালায় অবস্থান নিলেন।

এমন সময় আল্লাহ জিবরীল (عليه السلام)-কে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে প্রেরণ করলেন। سَوِيًّا অর্থ পূর্ণাঙ্গ একজন পুরুষ, যিনি সুন্দর ও উত্তম অবয়বের অধিকারী। মারইয়াম (عليه السلام) তাকে মানুষ মনে করে ভয় পেয়ে গেলেন, হয়তো কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছে, তাই তিনি বললেন: তুমি যদি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তাহলে আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জিবরীল (عليه السلام) বললেন: আপনি যা মনে করেছেন তা নয়, আমি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন দূত। আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আপনাকে একটি পূতপবিত্র পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার পক্ষ থেকে এক সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হল মাসীহ, ঈসা ইবনু মারইয়াম। তিনি দুনিয়া এবং আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আলি-ইমরান ৩:৪৫)

মারইয়াম বললেন, কিভাবে আমার সন্তান হবে? অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ (বৈধ উপায়ে সহবাস) করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। জিবরীল (عليه السلام) বললেন: এভাবেই হবে। অর্থাৎ যদিও গর্ভ ধারণের জন্য পুরুষের সাথে মিলন হওয়া আবশ্যক, তবুও এভাবে হবে। আপনার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার।

পৃথিবীর মানুষকে চার পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে: ১. পিতা-মাতা ছাড়া, যেমন আদম (عليه السلام), ২. শুধু পুরুষ হতে যেমন হাওয়া (عليه السلام)-কে আদম থেকে, ৩. ঈসা (عليه السلام)-কে মা থেকে পিতা ছাড়া এবং ৪. পিতা-মাতার মাধ্যমে বাকী আদম সন্তান।

ঈসা (عليه السلام)-কে মানুষের একটি নিদর্শন বানাবেন যা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের ওপর প্রমাণ বহন করে। যেমন সূরা আম্বিয়ার ৯১ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

অতঃপর মারইয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন তিনি বললেন: হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। কেননা মানুষ সন্তান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কী জবাব দেব? সবাই জানে আমি বিবাহিতা নই, আমি একজন ইবাদতকারিণী, তাহলে সন্তান জন্ম নিল কিভাবে?

(نَسْيًا مَّنْسِيًّا)

অর্থ মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া, অর্থাৎ আমি মারইয়াম নামে দুনিয়াতে কোন নারী ছিলাম তা যদি মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম। এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে আওয়াজ দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ কর না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন।

سَرِيًّا অর্থ ছোট নদী বা ঝরনা। رُطَبًا جَنِيًّا অর্থ সিক্ত পরিপক্ক খেজুর। অর্থাৎ পায়ের নিচে ঝরনা দিলেন, খেজুর গাছে নাড়া দিলে সিক্ত পরিপক্ক খেজুর পড়ে যাবে, এসব কিছু মু'জিযাহ বা কারামতস্বরূপ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বললেন: খাও, পান কর আর সন্তান দেখে চোখ জুড়াও।

আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার জন্য সিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারো সাথে কোন কথাই বলব না।

অতঃপর মারইয়াম (عليه السلام) সন্তান প্রসবের পর শারীরিক সুস্থতা ফিরে আসলে সন্তানকে নিয়ে সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন। তারা বলল: হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভূত কাণ্ড করে বসেছ। হে হারূনের বোন! তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না। সম্প্রদায়ের এ ধরণের কথা শুনে মারইয়াম তার সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করল যে, এসব কথার জবাব সে দেবে। তারা বলল: এ কোলের শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?
(أُخْتَ هٰرُوْنَ)

এখানে হারুন বলতে মূসা (عليه السلام) এর ভাই হারূন নয়, বরং হারুন বলতে বানী ইসরাঈলের কোন একজন সৎ ব্যক্তি, মারইয়াম তার সহোদর বোন ছিলেন। (আযওয়ারুল বায়ান)

ঈসা (عليه السلام) তখন বলে উঠল, আমি আল্লাহ তা'আলার দাস। তিনি আমাকে কিতাব প্রদান করেছেন এবং আমাকে নাবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করার জন্য এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি। আমার প্রতি শান্তি ও শয়তানের সকল অনিষ্ট থেকে মুক্ত যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। এটাই হল মারইয়াম পুত্র ঈসা (عليه السلام), আর এটাই হল সত্য কথা (যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে) যে বিষয়ে লোকেরা বিতর্ক করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (যেমন খ্রিস্টানরা বলে থাকে ঈসা আল্লাহ তা'আলার পুত্র) তিনি এ ব্যাপারে মহান, পবিত্র।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"মারইয়ামের ছেলে 'ঈসা মসীহ তো আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণে ঈমান আন এবং বল না, 'তিন!' (তিনজন ইলাহ) নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ; তাঁর সন্তান হবে তিনি এটা হতে পবিত্র।" (সূরা নিসা ৪:১৭১)

আর তিনি যে সকল কার্যকলাপ করেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি এমন উপাস্য যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন বলেন, হও! এবং তা হয়ে যায়। যেমন পিতা ছাড়া ঈসা (عليه السلام)-এর জন্ম, সুতরাং সন্দেহ পোষণ করার কোন কিছুই নেই।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কোন সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী-পরিজন গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ঈসা (عليه السلام) আরো বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর এটাই হল সরল-সঠিক পথ। ঈসা (عليه السلام)-এর এ সকল কথা শুনেও একশ্রেণির লোকের বিশ্বাস হল না।

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ)

অর্থাৎ ইয়াহূদীরা ঈসা (عليه السلام)-এর ব্যাপারে বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে গেল; কেউ বাড়াবাড়ি করে বলল: তিনিই আল্লাহ, কেউ বলল: তিনি আল্লাহ তা'আলার সন্তান, কেউ

বলল: তিনি তিনজনের একজন (আল্লাহ, মারইয়াম ও ঈসা)। কেউ নাবী বলে আখ্যায়িত করে না, বরং বলে থাকে: তিনি জারজ সন্তান যেমন ইয়াহূদীরা। সব কথাই বাতিল, যারাই এসব কথা বলে তারাই কুফরী করেছে। এভাবে তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হয়ে গেল। সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য থাকবে ধ্বংস ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যেমন সূরা যুখরুফের ৬৩-৬৫ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

তাদের দলে দলে বিভক্ত হওয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করণার্থে বলেন দুনিয়াতে তারা সত্য কথা না শুনলেও, না দেখলেও কিয়ামতের দিন তারা চমৎকারভাবে শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা সবাই আমার নিকট আগমন করবে। আর তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

🔶 আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হাতে।
২. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে পিতা ছাড়াও সন্তান দান করতে পারেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা কোন স্ত্রী-পুত্র, পরিজন গ্রহণ করা থেকে পূতপবিত্র।
৪. আল্লাহ তা'আলা চাইলে কোলের শিশুকেও কথা বলাতে পারেন। যেমন ঈসা (عليه السلام)।
৫. ঈসা (عليه السلام) ছিলেন বরকতস্বরূপ।
৬. সকলকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে।
৭. ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করতে পারেন।
৮. মানুষের রিযিক নির্ধারণ করা থাকলেও তা অন্বেষণ করে নিতে হবে, যেমন মারইয়াম (عليه السلام)-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

পর্ব ৪২: দুনিয়ার অসংখ্য আবিষ্কার যার হাত ধরে

🔶সূরা মারইয়ামঃ আয়াত ৫৬-৫৮

আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ইদরীস (عليه السلام)-এর বর্ণনা দিচ্ছেন।

ইদরীস (عليه السلام) হলেন প্রথম মানব যাঁকে মু'জিযাহ হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি আল্লাহ তা'আলার ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন।

তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাক হিসেবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করেন।

ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র তৈরি করে কাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।

ইদরীস (عليه السلام) একজন বিখ্যাত নাবী। তিনি নূহ (عليه السلام) এর আগের নাবী, না-পরের নাবী এ নিয়ে মতভেদ পাওয়া যায়।

তবে অধিকাংশের মতে তিনি নূহ (عليه السلام) এর পরের নাবী। ইমাম কুরতুবী (عليه السلام) বলেন: তিনি যে নূহের পরের নাবী তার বড় প্রমাণ হল, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ১ম আসমানে আদম (عليه السلام) এর সাক্ষাত হয়, তিনি রাসূলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন:

'নেককার সন্তান ও নেককার নাবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ।' অতঃপর ৪র্থ আসমানে ইদরীস (عليه السلام)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি রাসূলকে বলেন:

'নেককার ভাই ও নেককার নাবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ।' কাযী ইয়ায বলেন: যদি ইদরীস (عليه السلام) নূহ (عليه السلام) এর আগের নাবী হতেন তাহলে তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'নেককার ভাই' না বলে 'নেককার সন্তান' বলে সম্ভাষণ জানাতেন। যেমন আদম, নূহ ও ইবরাহীম (عليه السلام) বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন, ফলে তিনি নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কুরআনে এ কথা বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা এ সকল নাবীদের কথা বর্ণনা করার পর বলছেন, এরাই হলেন সেই সকল নাবী, যাদেরকে নাবীগণের মধ্য হতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন:

“আর কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!” (সূরা নিসা ৪:৬৯)

পর্ব ৪৩: নদীর স্রোত থেকে মায়ের কোল পর্যন্ত

🔶সূরা কাসাসঃ আয়াত ৯
🔶সূরা ত্বহাঃ আয়াত ৩৯
🔶সূরা কাসাসঃ আয়াত ১০-১৩

তুমি এ (শিশু)কে সিন্দুকের মধ্যে রাখ। তারপর সিন্দুকটি দরিয়ায় ফেলে দাও। তারপর দরিয়া সে সিন্দুকটিকে তীরে নিয়ে ফেলে দেবে। তাকে তুলে নেবে আমার এক শত্রু এবং তারও শত্রু। আমি আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছিলাম আর এসব করেছিলাম এজন্য, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

কোন জ্যোতিষী ফির'আউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হবে, যার হাতে আপনার রাজত্বের অবসান হবে। তাই সে ফরমান জারি করল, এখন থেকে বনী ইসরাঈলে যত শিশু জন্ম নেবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। এ রকম পরিস্থিতির ভেতরই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। আইন অনুসারে ফির'আউনের লোকজন তো তাকে হত্যা করে ফেলবে। তাই স্বভাবতই তাঁর মা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা রদ করবে কে? তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে রক্ষা করার জন্য নিজ কুদরতের মহিমা দেখালেন। তাঁর মাকে ইলহামের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, শিশুকে একটি সিন্দুকের ভেতর রেখে নীল নদীতে ফেলে দাও।

আল্লাহ তাআলা যা বলেছিলেন তাই হল। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফির'আউনের রাজপ্রাসাদের কাছে এসে ঠেকল। ফির'আউনের কর্মচারীগণ সেটি তুলে দেখল ভেতরে একটি শিশু। তারা কালবিলম্ব না করে শিশুটিকে ফির'আউনের কাছে নিয়ে আসল। তার স্ত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শিশুটির প্রতি তার বড় মায়া ধরে গেল। তিনি তাকে পুত্র হিসেবে লালন-পালন করার জন্য ফির'আউনকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চেহারার ভেতর এমন আকর্ষণ দান করেছিলেন যে, যে-কেউ তাঁকে দেখত ভালোবেসে ফেলত। এ কারণেই ফির'আউনও তাঁকে নিজ প্রাসাদে রাখতে সম্মত হয়ে গেল।

এমনিতে তো প্রত্যেকেরই প্রতিপালন আল্লাহ তাআলাই করেন। তা সত্ত্বেও হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হবে', বলা হয়েছে তার লালন-পালনের বিশেষত্বের কারণে। সাধারণত লালন-পালনের দুনিয়াবী ব্যবস্থা হল, পিতা-মাতা নিজেদের খরচায় ও নিজেদের তত্ত্বাবধানে সন্তানের লালন-পালন করে। কিন্তু

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে সে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আল্লাহ তায়লা তাঁকে ব্যতিক্রমভাবে সরাসরি নিজ তত্বাবধানে রেখে তাঁর শত্রুর মাধ্যমে প্রতিপালন করিয়েছেন।

মূসা (عليه السلام)-কে নীল নদে ভাসিয়ে দিলে ভেসে ভেসে ফির‘আউনের প্রাসাদের কাছে চলে যায়, ফির‘আউনের পরিবার তাকে তুলে নিল এবং ফির‘আউনের স্ত্রী আসিয়া বললেন এ শিশু আমাদের নয়ণমনি হবে অতএব তাকে হত্যা করো না। এভাবে আপন গৃহে শত্রু লালিত পালিত হল কিন্তু তারা বুঝতেও পারল না।

(وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسٰي فٰرِغًا)

অর্থাৎ মূসা (عليه السلام)-কে হারিয়ে ফেলে মায়ের মন অস্থির। কিনা কী হয়, মূসা (عليه السلام) যে তার সন্তান এ কথা প্রকাশ করেই দিতেন যদি আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তর ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ না করে দিতেন, যাতে তার এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ফিরিয়ে দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে। فٰرِغًا অর্থ কেউ বলেছেন: দুনিয়ার সব কিছু থেকে তার মাতা চিন্তামুক্ত, কেবল চিন্তা একটাই মূসা। কেউ বলেছেন: সকল দুশ্চিন্তা থেকে তিনি মুক্ত কারণ তিনি জানেন আল্লাহ তা‘আলা তাকে ফেরত দেবেন, সে ডুবে যাবে না। তারপর মূসা (عليه السلام)-এর বোনকে তার মা বললেন সে যেন তাকে দূর থেকে দেখে দেখে রাখে, কোথা থেকে কোথায় যায়।

(وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ)

অর্থাৎ ফির‘আউনের বাড়িতে মূসা (عليه السلام)-কে নিয়ে যাওয়ার পর দুধ পান করাতে চাইলে কেউ দুধ পান করাতে পারে না। উদ্দেশ্য হল যাতে দুধ পান করানোর জন্য মূসার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হয়। যা আয়াতেই উল্লেখ রয়েছে।

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّه)

অর্থাৎ যখন শক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় পূর্ণ যৌবনে উপনিত হল তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে নবুওয়াত দিলেন। অধিকাংশদের ক্ষেত্রে এ পূর্ণতা চল্লিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় অধিকাংশ নাবীদেরকে এ বয়সে নবুওয়াত দেয়া হয়েছে যেমন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(عَلٰي حِيْنِ غَفْلَةٍ)

‘অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক’ হয় তা দুপুরের সময় যখন মানুষ বিশ্রাম নেয় অথবা অন্য কোন সময় যখন মানুষ বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হতে বিরত থাকে।

(هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ)

‘একজন তার নিজ দলের’ অর্থাৎ বানী-ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত, (وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ) ‘এবং অপর জন তার শত্রুদলের’ অর্থাৎ কিবতী বংশের।

(فَقَضٰي عَلَيْهِ)

অর্থাৎ মূসা (عليه السلام)-এর ঘুষিতে সে মারা যায়। মূসা (عليه السلام) তাকে মেরে ফেলার জন্য ঘুষি দেননি, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে আঘাতে মারা যায়। ফলে মূসা (عليه السلام) অনুতপ্ত হন এবং বলেন, নিশ্চয়ই এটা শয়তানের কাজ, তাই তিনি আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করে দেন।

(فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا)

মূসা (عليه السلام) খুব ভীত-শঙ্কিত অবস্থায় তথায় সকাল করলেন আর খুব খেয়াল করছেন যে, ফির‘আউনের পরিষদের কেউ জানতে পারে কি না; কারণ ফির‘আউন ভাল করেই জানে এ কাজ মূসা (عليه السلام) ছাড়া কেউ করার দুঃসাহস রাখে না। এমন সময় মূসা (عليه السلام) শুনতে পেলেন, যে বানী-ইসরাঈলের লোকটাকে গতকাল সাহায্য করেছিল সে আরেকজন কিবতীকে হত্যা করবে বলে চিৎকার করছে। তখন মূসা (عليه السلام) তাকে তিরস্কার করে আয়াতে উল্লিখিত কথা বললেন।

(فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا)

অর্থাৎ যখন লোকটি এরূপ চিৎকার করল তখন মূসা ইচ্ছা করলেন তাকে ধরে শাস্তি দেবেন। যখন লোকটি বুঝল তাকে মূসা (عليه السلام) মারবে তখন সে বলল: ‘হে মূসা! তুমি যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।’

(هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا)

অর্থাৎ সে বানী ইসরাঈলের লোকটি মূসা (عليه السلام) ও যে কিবতী লোকটিকে মূসা (عليه السلام) হত্যা করেছেন তাদের দুজনেরই শত্রু হয়ে গেল।

(وَجَاءَ رَجُلٌ) কেউ বলেছেন, লোকটির নাম হিজকিল; কেউ বলেছেন, শামউন।

(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ)

শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান। মাদইয়ান ইবনু ইবরাহীম (عليه السلام)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এ এলাকা ফির'আউনের ক্ষমতার বাইরে ছিল। মিশর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল।

মূসা (عليه السلام) ফির'আউন ও তার বাহিনীকে ভয় করে মিশর থেকে মাদইয়ানে চলে আসার ইচ্ছা করলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় মানুষকে যে বিষয়ে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে ভয় করা তাওয়াক্কুল ও ঈমানের পরিপন্থী নয়। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হত্যা করে ফেলবে এ ভয়ে তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেলেন। মূসা (عليه السلام) নিঃসম্বল অবস্থায় মিসর ত্যাগ করলেন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছু ছিল না এবং তিনি রাস্তাও চিনতেন না। আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে রওনা দিলেন এবং বললেন 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।'

(وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ) مَاءَ مَدْيَنَ

বলতে একটি কূপকে বুঝানো হয়েছে। অত্র এলাকাবাসীরা এখান থেকে তাদের জন্তুদের পানি পান করাতো। অর্থাৎ দু'জন মহিলা বলতে শু'আইব (عليه السلام)-এর কন্যাদ্বয়।

(قَالَ مَا خَطْبُكُمَا)

অর্থাৎ মূসা (عليه السلام) তাদের দাঁড়ানো দেখে বললেন; আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তারা বলল, পুরুষেরা পানি পান করিয়ে নিয়ে গেলে তারপর আমরা পানি পান করাই। পুরুষদের ভিড়ে পান করাতে পারি না। আমাদের বাবা বৃদ্ধ মানুষ তাই তিনি আসতে পারেন না।

🔶এ ঘটনা থেকে কয়েকটি শিক্ষাঃ

১. দুর্বলদের সাহায্য করা নাবী-রাসূলদের সুন্নত।
২. বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনে কথা বলায় দোষ নেই, যদি কোন ফেতনার আশঙ্কা না থাকে। এই প্রয়োজন কখনোই সহশিক্ষা, নারীদের চাকুরি করা, ঘর থেকে অহরহ বের হয়ে যাওয়া না। উল্লেখিত নারীরা কেন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন? তাদের বাবা বৃদ্ধ, ঘরে আর কেউ নেই কাজ করার। পার্থক্য বুঝতে পারছি তো আমরা? আমাদের নারীদের কি এমন পরিস্থিতি ঘর থেকে বের হওয়ার? ইমারজেন্সি কাকে বলে সেটার সংজ্ঞা আমরা ভুলতে বসেছি। একজন নারী যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তানের তীর তার উপর পড়ে। সে বরকত রহমত সব হারিয়ে ফেলে। তার দ্বারা নজরের হেফাজত করা সম্ভব হয় না। এর ফলে নামাজ টা ঠিক হয় না। নামাজ ঠিক করতে হলে এ সব বিষয় গুলো চলে আসে। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিন। আমিন।

৩. প্রয়োজনে নারীরাও বাইরে যেতে পারে তবে অবশ্যই শালীনতা বজায় রাখতে হবে। কেমন প্রয়োজন বিস্তারিত আগে বর্ননা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

(ثُمَّ تَوَلّٰيَ إِلَي الظِّلِّ)

অর্থাৎ মূসা (عليه السلام) অনাহারে ও ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নিলেন এবং এক আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের দূরবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দু'আ করার অন্যতম একটি আদব, আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেকে অতি তুচ্ছ ও নগন্য করে তুলে ধরা।

(تَمْشِيْ عَلَي اسْتِحْيَاءٍ)

অর্থাৎ কন্যাদ্বয় বাড়িতে ফিরে গিয়ে শু'আইব (عليه السلام)-কে ঘটনা খুলে বললে তিনি মূসা (عليه السلام)-কে আমন্ত্রণ জানিয়ে মেয়েকে পাঠান যেন তাকে ডেকে নিয়ে আসে। মেয়েটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল এবং পিতার আমন্ত্রণের কথা জানাল।

(إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ)

অর্থাৎ শু'আইব (عليه السلام)-এর এক কন্যা তার পিতাকে বলল: গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন কর্মচারীর প্রয়োজন আছে, তাহলে তাকেই নিযুক্ত করে দিন।

কারণ তার মাঝে আমরা দুটি গুণ লক্ষ্য করেছি। এক. সে শক্তিশালী, দুই. বিশ্বস্ত। আমরা পানি পান করাতে গিয়ে তার শক্তি এবং পথিমধ্যে আমাদেরকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তার বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

(قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ)

অর্থাৎ শু'আইব (عليه السلام) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে মূসা (عليه السلام)-এর সাথে বিবাহ দানের প্রস্তাব করলেন। এ থেকে জানা যায়, উপযুক্ত পাত্র পেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রের প্রস্তাবের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই প্রস্তাব দেয়া। যেমন উমার (رضي الله عنه) নিজ কন্যা হাফসা বিধবা হলে আবূ বকর ও উসমান (رضي الله عنهما) এর কাছে প্রস্তাব দেন। (কুরতুবী)

(فَلَمَّا قَضٰي مُوْسَي الْأَجَلَ)

অর্থাৎ যখন মূসা (عليه السلام) নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ করলেন তখন পরিবার নিয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

মূসা (عليه السلام) আট বছর কাজ করেছেন নাকি দশ বছর কাজ করেছেন? ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন: অধিক মেয়াদকাল পূর্ণ করেছিলেন। নাবীরা যা বলেন তা পূর্ণ করেন।

এ সম্পর্কে সূরা ত্বা-হা-র ৯ নং আয়াত থেকে ৯৩ নং আয়াতসহ আরো একাধিক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, তাঁর ইচ্ছার কোন প্রতিরোধক নেই।
২। মানুষ স্বভাবতই সন্তানের প্রতি দয়াপরায়ণ, বিশেষ করে যাদের সন্তান নেই তাদের আগ্রহ আরো বেশি।
৩। পুরুষ মহিলাদের পেছনে চলবে না, এতে পর্দা লংঘন হয়। বরং মহিলারা পুরুষের পেছনে পেছনে চলবে।
৪। কন্যার অভিভাবক কাউকে যোগ্য পাত্র মনে করলে সরাসরি প্রস্তাব দিতে পারবে।
৫। অহঙ্কার ও সীমালংঘন ধ্বংস ও পতনের মূল কারণ।

৬। কথা বলা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন যেমন মূসা (عليه السلام)-এর সাথে কথা বলেছেন।
৭। প্রত্যেক নাবী-রাসূলগণ সমসমায়িক ক্ষমতাসীনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেছেন।
৮। দ্বীনের কাজে অপরের সহযোগিতা নেয়া ও সহযোগিতা দেয়া উভয়টাই কল্যাণকর।

পর্ব ৪৪: জুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ

🔶সূরা কাহফঃ আয়াত ৮৬-৯৮

৮৩-৯৯ নং আয়াতের তাফসীর:

উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা বাদশা 'যুল-কারনাইন' এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যার সম্পর্কে ইয়াহূদীদের কথামত মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিল। সে দ্বিতীয় জিজ্ঞেসার উত্তর এটি। যুল-কারনাইন এর শাব্দিক অর্থ হল দু' শিংবিশিষ্ট। তাঁর নাম করণের কারণ হল তাঁর মাথায় প্রকৃতপক্ষে দুটি শিং ছিল। কিংবা তিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে সূর্যের শিং বা কিরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন: তাঁর মাথায় শিঙের মত চুলের দুটি ঝুটি ছিল। তার প্রকৃত নাম নিয়েও মতামত পাওয়া যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: তার নাম হল আব্দুল্লাহ বিন যহহাক বিন মা'আদ, আবার বলা হয়-আবদুল্লাহ বিন কিনান বিন আজাদ ইত্যাদি। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশা, সৎ মু'মিন ব্যক্তি ছিলেন। (আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/১০২-১০৬)

🔶সংক্ষিপ্ত ঘটনা:

'যুল-কারনাইন' একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীতে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছিলেন এবং তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে, তুমি যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করতে পারবে। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রকার সাজ-সরঞ্জাম দান করা হয়েছিল।

একদা একটি পথ ধরে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে এক পর্যায়ে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌছে গেলেন। অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তে, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না। সেখানে তিনি দেখলেন যে, সূর্য কর্দমাক্ত গরম পানিতে অস্ত যাচ্ছে এবং তিনি সেখানে একটি সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত লাভ করলেন। আর তারা ছিল কুফরী আকীদা পোষণকারী সম্প্রদায়। তখন আল্লাহ তা'আলা যুল-কারনাইনকে বললেন: হে যুল-কারনাইন! তুমি চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার।

তখন যুল-কারনাইন তাদেরকে বললেন, যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়েও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আর যে ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে তাদের জন্য থাকবে কল্যাণ ও শান্তি। আর তাদের প্রতি নম্র ব্যবহার করা হবে।

অতঃপর তিনি অন্য একটি পথ ধরে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন সূর্যোদয় স্থলে অর্থাৎ পূর্বপ্রান্তে। সেখানে গিয়ে একটি সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত লাভ করলেন যাদের জন্য সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষা করার মত কোন অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়নি। আর এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

অতঃপর অন্য একটি পথ ধরে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক পর্যায়ে দু' পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে একটি সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত হল যারা তার কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না, তারা তাঁকে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এর কষ্ট দেয়ার কথা জানাল এবং তারা যে জমিনে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে সে কথাও জানাল আর তাকে কর দিতে চাইল এ শর্তে যে, সে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এবং ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী করে দেবে যাতে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ তাদেরকে আর কষ্ট দিতে না পারে ও জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে।

তাদের এ দাবী শুনে যুল-কারনাইন তাদের থেকে কর নিতে রাজি হননি বরং এ প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য তাদের সাহায্য কামনা করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তারা যেন লৌহপিণ্ডসমূহ নিয়ে আসে। লৌহপিণ্ডসমূহ দু' পর্বতের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানে রাখার পর যখন তা দু' পর্বতের সমান হল তখন তাদেরকে বললেন, হাঁপর গরম করার জন্য। অবশেষে যখন তা আগুনে উত্তপ্ত হয়ে গলে গেল তখন তাদেরকে তামা নিয়ে আসার জন্য বললেন এবং যুল-কারনাইন ঐ গলিত তামা ঐ লোহার প্রাচীরের ওপর ঢেলে দিলেন। এরপর ইয়া'জূজ ও মা'জূজ আর এ প্রাচীর ছেদ করতে পারেনি। এ ইয়া'জূজ ও মা'জূজ এখনো ঐ প্রাচীরে বন্দী অবস্থায় রয়েছে। তারা প্রাচীর ভাঙ্গতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যখন বাস্তবায়িত হয়ে যাবে তখন তারা এ প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলবে এবং পৃথিবীতে এসে পূর্বের মতই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

(قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, কুরআন ذكره সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে مِّنْهُ ذِكْرًا বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন যুল-কারনাইন এর আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণনা করবে না বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করবে।

سبب এর প্রকৃত অর্থ মাধ্যম, উপকরণ, যার দ্বারা লক্ষ্য অর্জন করা যায়। এখানে অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন কিছু মাধ্যম ও উপকরণ দান করেছেন যার দ্বারা তিনি দেশসমূহ জয় করেছেন। শত্রুদের অহংকার মাটিতে মিশিয়ে দেন এবং অত্যাচারী বাদশাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেন।

(أَتْبَعَ سَبَبًا) অর্থাৎ তাঁকে যে সকল উপকরণ দান করা হয়েছিল তা তিনি কাজে লাগান।

عين অর্থ ঝরনা বা সমুদ্র, حمئة অর্থ কর্দম বা কাদা। অর্থাৎ যুল-কারনাইন দেশের পর দেশ জয় করে যখন পশ্চিম প্রান্তে শেষ জনপদে পৌঁছে গেলেন। সেখানে কাদাময় পানির ঝরণা বা সমুদ্র ছিল যেটা নিচে থেকে কালো মনে হচ্ছিল। তার মনে হল যেন সূর্য ঐ পানিতে অস্ত যাচ্ছে। সমুদ্র-তীর থেকে দূরে সূর্যাস্ত স্থলে পানি ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। সেখানে যারা সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করবে তাদের মনে হবে যে সূর্য সমুদ্রেই অস্ত যাচ্ছে অথচ সূর্য মহাকাশে স্বস্থানেই অবস্থান করে।

(قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ)

'আমি বললাম, 'হে যুল-কারনাইন!' আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি নাবী ছিলেন।

(بَيْنَ السَّدَّيْنِ)

যে বস্তু কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে যায় তাকে سد বলা হয়। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক আর প্রাকৃতিক হোক। এখানে السَّدَّيْنِ বলতে দু' পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়া'জূজ মা'জূজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমন চালাত। যুলকারনাইন এ গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زبر শব্দটি زبرة এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বুঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করেছেন।

قطرا শব্দের অর্থ ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরানো তামা, আলকাতরার প্রলেপ দেয়া। ق এর হরকত পরিবর্তনের কারণে অর্থেরও পরিবর্তন হয়। এখানে গলিত তামা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ লোহার পাতকে খুব গরম করে এর ওপর গলিত তামা ঢেলে দেয়ায় সে পাহাড়ী রাস্তার মাঝের প্রাচীর এত মজুবত হয়েছিল যে, ইয়া'জূজ-মা'জূজের পক্ষে তা ভেঙ্গে আসা অসম্ভব হয়ে গেল।

🔶ইয়া'জূজ ও মা'জূজের বিবরণ:

ইয়া'জূজ ও মা'জূজ মূলত মানুষ। তারা আদম ও হাওয়ারই সন্তান। সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ইয়া'জূজ ও মা'জূজ হচ্ছে আদম (عليه السلام)-এর সন্তান। তাদেরকে যদি সাধারণ মানব সমাজে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা ওদের স্বাভাবিক জীবন যাপন বিনষ্ট করে দেবে। তাদের কেউ মরবে না যতক্ষণ না তার সন্তান-সন্ততি এক হাজার বা তার বেশিতে পৌঁছে। (মিনহাতুল মা'বূদ ফী তারবীবি মুসনাদিত তায়ালিসী ২/২১৯.)

তাদের গঠন প্রকৃতি: তাদের গঠন বর্ণনা দিয়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, তাদেরকে দেখতে মোঘল তুর্কীদের মতো মনে হবে। তাদের চোখ হবে ছোট। নাক হবে ছোট ও চ্যাপটা। চুল হবে লাল-সাদা মিশ্রিত হলুদ বর্ণের। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশবিশিষ্ট। (নিহায়া/আল ফিতান ওয়াল মালাহিম ১/১৫৩.)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইবনু হারমালাহ থেকে তিনি তাঁর খালা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর খালা বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খুৎবায় বলেন, তোমরা বলছ যে, কোন শত্রু নেই, অথচ তোমরা ইয়া’জূজ ও মা’জূজ আসা পর্যন্ত শত্রুর মোকাবেলা করেই যাবে। যাদের চেহারা হবে প্রশস্ত। চোখ হবে ছোট, চুল হবে লাল-সাদা মিশ্রিত হলুদ বর্ণের। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে দ্রুত নিচে পদার্পন করবে। তাদের চেহারা যেন চামড়া মোড়ানো ঢালের ন্যায় তথা চওড়া ও ঝুলে পড়া গণ্ডদেশবিশিষ্ট। (আহমাদ হা: ২২৩৩১.)

ইয়াজূজ ও মা’জূজের আবির্ভাবের প্রমাণসমূহ:

শেষ যুগে ইয়া’জূজ ও মা’জূজের আবির্ভাব কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। তাদের আবির্ভাবের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় প্রমাণ রয়েছে। যেমন উক্ত আয়াতগুলোতে রয়েছে।

ইয়া’জূজ ও মা’জূজ সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অনেক, যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে চলে যাবে।

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইসরা তথা মিরাজ হয় সে রাতে তিনি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (عليه السلام)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁরা সবাই তখন পরস্পর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

তাঁরা উক্ত আলোচনার জন্য ঈসা (عليه السلام) কে আবেদন করলে তিনি দাজ্জালের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করার পর বলেন: এরপর মানুষ তাদের নিজ নিজ শহরে চলে যাবে। তখন হঠাৎ তাদের সম্মুখীন হবে ইয়া’জূজ ও মা’জূজ। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে দ্রুত অবতরণ করবে।

তারা কোন পানির পাশ দিয়ে যেতে না যেতেই তা পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে এবং কোন বস্তুর পাশ দিয়ে যেতে না যেতেই তা ধ্বংস করে দেবে। তখন মানুষেরা আমার নিকট আশ্রয় নিলে আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করব। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মেরে ফেলবেন। তখন পুরো পৃথিবী তাদের দুর্গন্ধে গন্ধময় হয়ে যাবে।

পুনরায় তারা আবারো আমার নিকট আশ্রয় নেবে। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করলে আকাশ ভারী বৃষ্টি বর্ষণ করবে। অতঃপর বৃষ্টির পানি তাদের শরীরগুলোকে স্থল ভাগ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করবে। (আহমাদ ৪/১৮৯-১৯০, হাকিম ৪/৪৮৮-৪৮৯)

ইয়া'জূজ মা'জূজের প্রাচীর:

যুল-কারনাইন বাদশা উক্ত প্রাচীর নির্মাণ করেন। যাতে ইয়া'জূজ-মা'জূজ ও তাদের প্রতিবেশির মাঝে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় যারা যুল-কারনাইনের কাছে সাহায্য কামনা করছিল। যেমন আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

তবে উক্ত প্রাচীরের সঠিক স্থান এখনো কেউ নির্ণয় করতে পারেনি। কতক রাজা-বাদশা ও ঐতিহাসিকগণ সে স্থানের পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল আব্বাসীয় খলীফা ওয়াসিক (মৃত্যু ২৩২ হি:) কতক আমীরদেরকে সৈন্যদলসহ সে প্রাচীর দেখার জন্য প্রেরণ করেছেন যাতে তার কাছে সে প্রাচীরের বর্ণনা দিতে পারে। তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পৌঁছল এমনকি সে প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তারা দেখতে পেলো, সে প্রাচীরটি লোহা ও পিতল দিয়ে নির্মিত।

তারা আরো উল্লেখ করলেন যে, সেখানে একটি বিরাট দরজা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে বড় বড় কয়েকটি তালা রয়েছে। তারা আরো দেখতে পেলেন, একটি দুর্গে দুধ ও মধুর অবশিষ্টাংশ রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী বাদশার পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত রয়েছে, যিনি সুউচ্চ ও সুঠাম দেহের অধিকারী যা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ও তার সমান হবে না। তারপর তারা দেশে ফিরে আসলেন, তাদের ভ্রমণ ৬০ দিনের অধিক ছিল এবং তারা আরো অনেক ভয়ংকর ও আশ্চর্যজনক জিনিস দেখলেন।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) এ ঘটনা তার স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তবে তার কোন সনদ উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'আলাই তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভাল জানেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর ৫/১৯৩.)

অনেকে মনে করেন ইয়া'জূজ ও মা'জূজের আর্বিভাব হয়ে গেছে। মূলত তাদের আর্বিভাব এখনো হয়নি। কিয়ামতের আলামতস্বরূপ যে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ আগমন করবে তারা শেষ যুগে আসবে। কারণ সহীহ হাদীস প্রমাণ করে তাদের আগমন ঈসা (عليه السلام)-এর অবতরণের পর হবে। তিনিই তাদের প্রতি বদদু'আ করবেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করবেন। তারপর তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করবেন এবং মানুষ ও জমিনকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের প্রামাণিক স্বীকৃতি পেলাম। কারণ তিনি কুরাইশদের তৃতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন আল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর দ্বারা জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে।
২. প্রকৃত বিষয় জানার জন্য জ্ঞানীরা উপকরণ গ্রহণ করতে পারেন।
৩. শাসকদের উচিত ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহ তা'আলার বিধানানুযায়ী পরিচালনা করা।
৪. যে সকল বাদশা সারা পৃথিবী শাসন করেছেন তাদের মধ্যে যুল-কারনাইন অন্যতম।
৫. শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয়া শরীয়তসম্মত।
৬. ইয়া'জূজ ও মা'জূজের অস্তিত্ব রয়েছে, এখনো তারা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ।
৭. ইয়া'জূজ ও মা'জূজের আর্বিভাব কিয়ামতের আলামত, তারা প্রাচীর থেকে বের হয়ে দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে।

পর্ব ৪৫: কিয়ামতের আলামত ও ইয়াজুজ-মাজুজ

🔶সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৯৬

৯৫-৯৭ নং আয়াতের তাফসীর:

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যে জনপদবাসী দুনিয়া থেকে চলে গেছে বা যাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষে দুনিয়াতে আসা অসম্ভব। অর্থাৎ তারা আর তাওবাহ করার সুযোগ পাবে না। কেননা মৃত্যুর পর আমল করার কোন পথ খোলা থাকবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফির-মুশরিকদেরকে সতর্ক করছেন যে, ইয়া'জূজ-মা'জূজের বের হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। ইয়া'জূজ-মা'জূজ হল আদম সন্তানের দুটি গোত্র। (তাফসীর সা'দী)

এলাকাবাসী যখন অভিযোগ করল যে, তারা জমিনে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করছে তখন বাদশা যুল-কারনাইন সীসা ঢালা প্রাচীর দিয়ে তাদেরকে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

শেষ যুগে ঈসা (عليه السلام)-এর সময়ে তারা সে প্রাচীর ভেঙ্গে বের হয়ে আসবে। তারা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে যে, প্রতিটি উঁচু জায়গা হতে ছুটে আসছে মনে হবে। তাদের অনিষ্ট ও অত্যাচারে মুসলিমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। এমনকি ঈসা (عليه السلام) মুসলিমদের নিয়ে তুর পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবেন।

অতঃপর ঈসা (عليه السلام)-এর অভিশাপে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের শবদেহের দুর্গন্ধে জমিন দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এক জাতীয় পাখি প্রেরণ করবেন, যারা তাদের লাশগুলো তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। তারপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ হবে যাতে সারা পৃথিবী পরিস্কার হয়ে যাবে। (বিস্তারিত ইবনু কাসীর)

ইয়া'জূজ-মা'জূজ বের হওয়ার পর কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতি অতি নিকটে এসে পড়বে। আর যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তখন কাফিররা আফসোস করবে এবং বলবে, আমাদের জন্য দুর্ভোগ, আমরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম আর আমরা সীমা লঙ্ঘনকারী ছিলাম। কিন্তু তখন আর তাদেরকে কোন সুযোগ দেয়া হবে না।

🔶আয়াতের শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. দুনিয়াতে যাদেরকে পাপের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তাদের পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ নেই।
২. ইয়া'জূজ-মা'জূজ এর আবির্ভাব কিয়ামতের আলামত।
৩. ঈসা (عليه السلام) ইয়া'জূজ মা'জূজদেরকে দমন করবেন।

পর্ব ৪৬: অসাধারণ মৃত্যু

🔶সূরা সাবাঃ আয়াত ১৪

বায়তুল মুক্কাদ্দাস নির্মাণ ও সুলাইমান (عليه السلام)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা:

সুলাইমান (عليه السلام)-এর তিন নং মু'জিযায় উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা জিন জাতিকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করতেন তখন সে কাজ তাঁর সামনে জিনের দ্বারা করিয়ে নিতেন।

এ সুযোগে তিনি তাদের দ্বারা বাইতুল মুক্কাদ্দাস পুনঃনির্মাণের কাজ করিয়ে নিলেন। মূলত বায়তুল মুক্কাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম (عليه السلام)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কা'বা গৃহের ৪০ বছর পর। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ইয়া'কূব (عليه السلام) তা পুনর্নির্মাণ করেন।

প্রায় হাজার বছর পর দাঊদ (عليه السلام) তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলাইমান (عليه السلام)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও অবশিষ্ট থেকে যায়। এমন সময় সুলাইমান (عليه السلام)-এর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে। এ কাজগুলো অবাধ্যপ্রবণ জিনদের ওপর ন্যস্ত ছিল। তারা সুলাইমান (عليه السلام)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

তখন সুলাইমান (عليه السلام) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন।

যাতে বাইরে থেকে ভেতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হল।

আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পঁচলো না, খসলো না বা পড়েও গেল না। জিনেরা ভয়ে চলে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল।

এভাবে কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কিছু উইপোকা লাঠি খেয়ে ফেলার কারণে তা ভেঙ্গে পড়লে তিনি দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যান। তখন জিনেরা বুঝতে পারল সুলাইমান (عليه السلام) অনেক আগেই মারা গেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: জিনেরা যদি গায়েবের খবর জানত তাহলে তারা এ শাস্তিমূলক নির্মাণ কাজ করত না। অতএব জানা গেল জিনেরাও গায়েবের খবর জানে না। এ বিষয়ে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। কোন নাবী-রাসূল, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতাদেরও এ জ্ঞান নেই।

পর্ব ৪৭: হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত

🔶সূরা কদরঃ আয়াত ১-৫

মুসনাদে আহমদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন রমযান মাসের দশ দিন বাকী থাকতো তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তহবন্দ বেঁধে নিতেন এবং স্ত্রীদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকতেন।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, রমযানের শেষ দশ রাতে লায়লাতুল কদরকে সমান গুরুত্বের সাথে তালাশ করতে হবে। কোন রাতকে কোন রাত্রের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, সব সময়েই তো দূআর আধিক্য মুসতাহাব, তবে রমযান মাসে দু'আ আরো বেশী করে করতে হবে, বিশেষ করে রমযানের শেষ দশকে এবং বেজোড় রাত্রে।

🔸 নিম্নের দু'আটি খুব বেশী পাঠ করতে হবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন!"

ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে আবী হাতিম (রঃ) এই সূরার তাফসীর প্রসঙ্গে একটি বিস্ময়কর রিওয়াইয়াত আনয়ন করেছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, সপ্তম আকাশের শেষ সীমায় জান্নাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা, যা দুনিয়া ও আখেরাতের দূরত্বের উপর অবস্থিত। এর উচ্চতা জান্নাতে এবং এর শিকড় ও শাখা প্রশাখাগুলো কুরসীর নিচে প্রসারিত। তাতে এতো ফেরেশতা অবস্থান করেন যে, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা আল্লাহপাক ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি কোন চুল পরিমাণও জায়গা নেই যেখানে ফেরেশতা নেই। ঐ বৃক্ষের মধ্যভাগে হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবস্থান করেন।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে ডাক দিয়ে বলা হয়, হে জিবরাঈল (আঃ) কদরের রাত্রিতে সমস্ত ফেরেশতাকে নিয়ে পৃথিবীতে চলে যাও।"

এই ফেরেশতাদের সবারই অন্তর স্নেহ ও দয়ায় ভরপুর। প্রত্যেক মুমিনের জন্যে তাঁদের মনে অনুগ্রহের প্রেরণা রয়েছে। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই কদরের রাত্রিতে এসব ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে নেমে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং সব জায়গায় সিজদায় পড়ে যান। তাঁরা সকল ঈমানদার নারী পুরুষের জন্যে দু'আ করেন।

কিন্তু তারা গীর্জায় মন্দিরে, অগ্নি পূজার জায়গায়, মূর্তি পূজার জায়গায়, আবর্জনা ফেলার জায়গায়, নেশা খোরের অবস্থান স্থলে,নেশাজাত দ্রব্যাদি রাখার জায়গায়, মূর্তি রাখার জায়গায়, গান বাজনার সাজ সরঞ্জাম রাখার জায়গায় এবং প্রস্রাব পায়খানার জায়গায় গমন করেন না।

বাকি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা ঈমানদার নারীপুরুষদের জন্য দু'আ করে থাকেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) সকল ঈমানদারের সাথে করমর্দন করেন। তাঁর কর মর্দনের সময় মুমিন ব্যক্তির শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়, মন নরম হয় এবং চোখে অশ্রু ধারা নেমে আসে। এসব নিদর্শন দেখা দিলে বুঝতে হবে তার হাত হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর হাতের মধ্যে রয়েছে।

◆ হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ঐ রাত্রে যে ব্যক্তি তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে, তার প্রথমবারের পাঠের সাথে সাথেই সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, দ্বিতীয়বার পড়ার সাথে সাথেই আগুন থেকে সে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তৃতীয়বারের পাঠের সাথে সাথেই জান্নাতে প্রবেশ সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেনঃ হে আবু ইসহাক (রঃ) যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাসের সাথে এ কালেমা উচ্চারণ করে তার কি হয়? জবাবে তিনি বলেনঃ সত্য বিশ্বাসীর মুখ হতেই তো এ কালেমা উচ্চারিত হবে।

যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! লায়লাতুল কাদর কাফির ও মুনাফিকদের উপর এতো ভারী বোধ হয় যে, যেন তাদের পিঠে পাহাড় পতিত হয়েছে। ফজর পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে রাত্রি কাটিয়ে দেন। তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে উঠে যান এবং অনেক উপরে উঠে স্বীয় পালক ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেই বিশেষ দুটি সবুজ পালক প্রসারিত করেন যা অন্য কোন সময় প্রসারিত করেন না।

এর ফলে সূর্যের কিরণ মলিন ও স্তিমিত হয়ে যায়। তারপর তিনি সমস্ত ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান। সব ফেরেশতা উপরে উঠে গেলে তাদের নূর এবং জিবরাঈল (আঃ)-এর পালকের নুর মিলিত হয়ে সূর্যের কিরণকে নিষ্প্রভ করে দেয়। ঐ দিন সূর্য অবাক হয়ে যায়। সমস্ত ফেরেশতা সে দিন আকাশ ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানের ঈমানদার নারী পুরুষের জন্য রহমত কামনা করে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।

তারা ঐ সব লোকের জন্যেও দু'আ করেন যারা সৎ নিয়তে রোযা রাখে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী রমযান মাসেও আল্লাহর ইবাদত করার মনোভাব পোষণ করে। সন্ধ্যায় সবাই প্রথম আসমানে পৌঁছে যান। সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতারা এসে তখন পৃথিবীতে অবস্থানকারী

ঈমানদারকে অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের কন্যা অমুক, বলে বলে খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেনঃ তাকে আমরা গত বছর ইবাদতে লিপ্ত দেখে ছিলাম, কিন্তু এবার সে বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আবার অমুককে গত বছর বিদআতে লিপ্ত দেখেছিলাম, কিন্তু এবার তাকে ইবাদতে লিপ্ত দেখে এসেছি।

প্রশ্নকারী ফেরেশতারা তখন শেষোক্ত ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত, রহমতের দুআ করেন। ফেরেশতারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাদেরকে আরো জানান যে, তারা অমুক অমুককে আল্লাহর যিকির করতে দেখেছেন, অমুক অমুককে রুকূ'তে, অমুক অমুককে সিজদায় পেয়েছেন। এবং অমুক অমুককে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছেন।

একরাত একদিন প্রথম আসমানে কাটিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন। সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমনি করে তাঁরা নিজেদের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছেন।

🔸 সিদরাতুল মুনতাহা তাদেরকে বলেঃ আমার মধ্যে অবস্থানকারী হিসেবে তোমাদের প্রতি আমার দাবী রয়েছে। আল্লাহকে যারা ভালবাসে আমিও তাদেরকে ভালবাসি। আমাকে তাদের অবস্থার কথা একটু শোনাও, তাদের নাম শোনাও।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেনঃ ফেরেশতারা তখন আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের নামও পিতার নাম জানাতে শুরু করেন। তারপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে সম্বোধন করে বলেঃ তোমার মধ্যে অবস্থানকারীরা তোমাকে যে সব খবর শুনিয়েছে সে সব আমাকেও একটু শোনাও।

🔸 তখন সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাতকে সব কথা শুনিয়ে দেয়। শোনার পর জান্নাত বলেঃ অমুক পুরুষ ও নারীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! অতি শীঘ্রই তাদেরকে আমার সাথে মিলিত করুন।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) সর্বপ্রথম নিজের জায়গায় পৌঁছে যান। তাঁর উপর তখন ইলহাম হয় এবং তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার অমুক অমুক বান্দাকে সিজদারত অবস্থায় দেখেছি। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন বলেনঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দেন। তখন ফেরেশতারা পরস্পর বলাবলি করেন যে, অমুক অমুক নারী পুরুষের উপর আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত হয়েছে।

তারপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ হে আল্লাহ গত বছর আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে সুন্নাতের উপর আমলকারী এবং আপনার ইবাদতকারী হিসেবে দেখেছি কিন্তু এবার সে বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এবং আপনার বিধিবিধানের অবাধ্যতা করেছে।

তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ হে জিবরাঈল (আঃ)! সে যদি মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বেও তাওবা করে নেয় তাহলে আমি তাকে মাফ করে দিবো। হযরত জিবরাঈল। (আঃ) তখন হঠাৎ করে বলেনঃ হে আল্লাহ আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা। আপনি সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার সৃষ্ট জীবের উপর সবচেয়ে বড় মেহেরবান। বান্দা তার নিজের উপর যেরূপ মেহেরবানী করে থাকে আপনার মেহেরবানী তাদের প্রতি তার চেয়েও অধিক।

ঐ সময় আরশ এবং ওর চার পাশের পর্দাসমূহ এবং আকাশ ও ওর মধ্যস্থিত সবকিছুই কেঁপে ওঠে বলেঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ "করুণাময় আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা" হযরত কাব (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পূর্ণ করে রমযানের পরেও পাপমুক্ত জীবন যাপনের মনোভাব পোষণ করে সে বিনা প্রশ্নে ও বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

পর্ব ৪৮: কারুনের পরিনতি

🔶সূরা কাসাসঃ আয়াত ৭৬-৮২

আলোচ্য আয়াতগুলোতে কারুনের গর্ব অহঙ্কার ও তার শেষ পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

কারুন ছিল মূসা (عليه السلام)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত। কাতাদাহ বলেন: সে ছিল মূসা (عليه السلام)-এর চাচাত ভাই। এছাড়াও আরো অনেক উক্তি রয়েছে (কুরতুবী)।

সে ধন-সম্পদের নেশায় মানুষের প্রতি জুলুম করত। সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বলেন: কারুন ছিল বিত্তশালী। ফির'আউন তাকে বানী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। কারুন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বানী ইসরাঈলদের কাছে অহঙ্কার করত। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করত।

তার সম্পদ এত বেশি পরিমাণ ছিল যে, সম্পদের চাবি বহন করতে একটি শক্তিশালী দলের কষ্টসাধ্য হয়ে যেত। তার এ গর্ব অহঙ্কার দেখে তার সম্প্রদায়ের সৎ লোকেরা বলেছিল, অহঙ্কার কর না। আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আর তুমি অহঙ্কারবশে মানুষকে অবহেলা কর না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে বিচরণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে ভালোবাসেন না।" (সূরা লুকমান ৩১:১৮)

বরং এ সব গর্ব অহঙ্কার ভুলে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যা দান করেছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। এর মানে এটি নয় যে, তুমি দুনিয়াকে ভুলে যাও, সব কিছু আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করে দাও। বরং তুমি দুনিয়াতে ভাল নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হও ও তোমার সম্পদ দ্বারা উপকৃত হও, তবে যেন তা দীনের ওপর প্রাধান্য না পায়।

বরং দুনিয়া অর্জনের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর। আল্লাহ তা'আলা যেমন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তেমনি তুমিও তার সৃষ্টি জীবের প্রতি অনুগ্রহ কর। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। তাদের এ সকল উপদেশ বাণী শুনে কারুন বলল,

আমি এ সম্পদ আমার জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। এটা মূলত আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতকে অস্বীকার করা, সে স্বীকার করতে চায় না এগুলো আল্লাহ তা'আলার দান, তার প্রতি অনুগ্রহ

করা হয়েছে। বরং সে বলছে, আমার জ্ঞান দ্বারা তা উপার্জন করেছি। এরূপ বলা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের সাথে কুফরী করা।

সুতরাং বলতে হবে এসবই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তিনি আমাকে দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তা নিয়ে নিতে পারেন। তাই আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ার্থে তার হক আদায় করতে হবে এবং উপযুক্ত অংশ ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে, অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করি আমার পক্ষ থেকে তখন সে বলে: আমাকে এটা দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের বিনিময়ে।” (সূরা যুমার ৩৯:৪৯)

কারুন ভুলে গিয়েছে যে, তার পূর্বে আরো বহু শক্তিশালী জনগোষ্ঠিকে তাদের এ সকল গর্ব অহঙ্কারের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত তারও অশুভ পরিণতি হল।

অতঃপর সে একদা গর্ব অহঙ্কারবশত জাঁকজমক পোশাক পরিধান করে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গিয়েছিল। তখন যারা দুনিয়া কামনা করত তারা বলল, যদি আমাদেরকে কারুনের মত ধন-সম্পদ দেয়া হত। আর যারা ছিল ঈমানদার তারা বলেছিল, তার নিকট যা আছে তা অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার নিকট যা আছে তা অধিক উত্তম।

আর তা প্রাপ্ত হবে যারা ঈমান আনে, সৎ আমল করে এবং ধৈর্য ধারণ করে তারাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কল্পনাও করেনি। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৭৯)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কারুন ও তার প্রাসাদকে তার গর্ব অহঙ্কারের কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দিলেন। যা থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারেনি। তার এ অবস্থা দেখে গতকাল যারা তার মত হবার কামনা করেছিল তারা অনুতপ্ত হল।

সুতরাং আমাদের উচিত কারুনের মত না হয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা, তাঁর দেয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা এবং সম্পদের হক আদায় করা।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সম্পদ একটি নেয়ামত, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন, তাই তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

২. কোন নেয়ামত পেয়ে গর্ব-অহঙ্কার করা যাবে না।
৩. পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ-লালসায় আখিরাত ভুলে যাওয়া যাবে না।
৪. মানুষের সাথে নম্র-ভদ্র ব্যবহার করতে হবে।
৫. ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা যাবে না।
৬. শুধু আখিরাতের আশায় দুনিয়ার প্রাপ্য বা অংশ গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত।

পর্ব ৪৯: অলৌকিক ঝড়ো হাওয়া

🔶সূরা আহযাবঃ আয়াত ৯-১১

৫ম হিজরীতে মুসলিম ও মক্কার কুরাইশসহ মদীনার ইয়াহুদী আর আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে আহযাব অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তাদের মোকাবেলা করা ছিল খুবই কঠিন।

এ কঠিন মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা যে গায়েবী মদদ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করার জন্য মু'মিনদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আয়াতে প্রথমত 'جنود' বলতে শত্রুবাহনীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যখন শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার উপক্রম হয়েছিল তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর গায়েবী মদদ দ্বারা মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ তা'আলার সে সময় যে নেয়ামতসমূহ দিয়েছিলেন তা হলঃ

১. বাতাস বা ঝড়। এর দ্বারা ঐ প্রবল হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা তুফানরূপে এসে শত্রুদের তাঁবু উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, পশুর দল রশি ছিঁড়ে পালিয়েছিল, হাড়ি-পাতিল উল্টে গিয়েছিল এবং তারা সকলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এ ঝড় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমাকে পূবালী হাওয়া দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আ'দ জাতিকে পশ্চিমা হওয়া দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ১০৩৫, সহীহ মুসলিম হা: ৯০০)

২. দ্বিতীয় 'جنود' বা সৈন্য দ্বারা ফেরেশতাদের বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। তারা শত্রুদের মনে এমন ভয় ও ত্রাস সঞ্চার করে দিয়েছে যে, তারা (শত্রু বাহিনী) সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছিল।

🔶আহযাব যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা:

ইয়াহূদী গোত্র বানু নাযীর; যাদেরকে বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারা খায়বারে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তারা মক্কার কাফিরদেরকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার জন্য তৈরী করল। অনুরূপ গাতফান, নাজদের গোত্রসহ অন্যান্য গোত্রগুলোকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করল।

সুতরাং ইয়াহূদীরা অনায়াসে ইসলাম ও মুসলিমদের সকল শত্রুদেরকে একত্রিত করে মদীনায় আক্রমণ করতে সাহস পেল।

মক্কার মুশরিকদের কমান্ডার ছিল আবূ সুফিয়ান। সে উহূদ পর্বতের আশেপাশে শিবির স্থাপন করে প্রায় পুরো মদীনা পরিবেষ্টন করে নিল। তাদের সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। আর মুসলিমগণ ছিলেন মাত্র তিন হাজার। এ ছাড়াও মদীনার দক্ষিণ দিকে ইয়াহূদীদের তৃতীয় গোত্র বানু কুরাইযা বাস করত; যাদের সাথে তখনও মুসলিদের চুক্তি ছিল এবং তারা মুসলিমদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু বানু নাযীরের ইয়াহূদী সর্দার হুয়াই বিন আখত্বাব মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ফুসলিয়ে নিজেদের সাথে করে নিল। এদিকে মুসলিম বাহিনী সর্বদিক দিয়ে শত্রু বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল।

সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শে পরিখা খনন করা হল। যার ফলে শত্রু বাহিনী মদীনার ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হল না। বরং মদীনার বাইরেই থাকতে বাধ্য হল। তখন মুসলিম বাহিনী তাদের এ পরিবেষ্টনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। প্রাণ কন্ঠাগত হয়ে পড়েছিল এবং তারা এ বিপদের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে নানাবিধ কু-ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিল। ঠিক ঐ মুহূর্তেই মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বাহিনীকে গায়েবী সাহায্যস্বরূপ বাতাস ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খন্দকের দিকে আগমন করলেন তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, শীতের সকালে আনসার ও মুহাজিরগণ পরিখা খনন করছেন। তাদের নিকট এমন কোন দাস নেই যে, তাদের পরিবর্তে দাসগণ ঐ কাজ করবে। তাদের কষ্ট এবং ক্ষুধার ভাব দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

হে আল্লাহ তা'আলা! পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, অতএব আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। আনসার ও মুহাজিররা প্রত্যুত্তরে বললেন:

আমরা সেই ব্যক্তি যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হস্তে বাইয়াত করেছি যে, যতদিন জীবিত থাকব ততদিন জিহাদ করব। (সহীহ বুখারী হা: ২৮৩৪)

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে বিপদ-আপদের মাধ্যমে ঈমান পরীক্ষা করেন।

২. মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য করা কর্তব্য।
৩. সংখ্যা বেশি হলেই যে বিজয়ী হওয়া যাবে এমনটি মনে করা ঠিক নয়।
৪. পূবালী বাতাস রহমতস্বরূপ আর পশ্চিমা বাতাস হল আযাবস্বরূপ।

পর্ব ৫০: সাবা সম্প্রদায়ে বন্যা

🔶সূরা সাবাঃ আয়াত ১৫-১৭

সাবা গোত্র ইয়ামনে বসবাস করতো। বিলকীসও এ গোত্রেরই নারী ছিল। এরা বড় নিয়ামত ও শান্তির মধ্যে ছিল। বড়ই সুখ-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করছিল। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল আসলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দিলেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন। তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের কথা বুঝালেন। কিছু দিন পর্যন্ত তারা এভাবেই চললো।

কিন্তু পরে যখন তারা বিরুদ্ধাচরণ করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং আল্লাহর আহকামকে উপেক্ষা করলো তখন তাদের উপর ভীষণ বন্যা নেমে এলো। সারা দেশ, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। এগুলোর বিবরণ হলো নিম্নরূপঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, সাবা কোন স্ত্রীলোকের নাম না পুরুষ লোকের নাম, না কোন জায়গার নাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “সে একজন পুরুষ লোক ছিল, যার দশটি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামনে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং চারজন ছিল সিরিয়ায়। যে ছয়জন ইয়ামনে বসবাস করছিল তাদের নাম হলোঃ মুশ্হাজ, কিনদাহ, ইদ, আশআরী, আনমার এবং হুমায়ের। যারা সিরিয়ায় ছিল তাদের নাম হলো ও লাখাম, জুযাম, আমেলাহ এবং গাসসান।" (এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, সাবার দশ পুত্র ছিল, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকৃত বা ঔরষজাত পুত্র নয়। কেননা, তাদের কেউ কেউ দুই দুই বা তিন তিন পুরুষের পরের সন্তানও ছিল। যেমন নসব নামার কিতাবগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে সিরিয়া ও ইয়ামনে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল সেটাও বন্যার পরের কথা। কেউ কেউ সেখানে থেকে গেল; আবার কেউ কেউ সেখান হতে এদিক ওদিক চলে গেল।

দেয়ালের ঘটনা এই যে, তার দুই দিকে পাহাড় ছিল। সেখান থেকে ঝরণা বেরিয়ে শহরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। এ জন্যেই শহরের এদিকে-ওদিকে অনেক নদী-নালা ছিল।

তাদের বাদশাহদের মধ্যে কোন এক বাদশাহ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থলে একটি শক্ত বাঁধ বেঁধে দিয়েছিল। এ বাঁধের কারণে পানি এদিক-ওদিক চলে যেতো আর এ কারণেই সুন্দর একটি নদী প্রবাহিত হতো। ঐ নদীর দুই দিকে তারা বাগান ও চাষাবাদের জমি তৈরী

করেছিল। পানির কারণে সেখানকার মাটি খুবই উর্বর হয়ে উঠেছিল। সব সময় এটা তরু-তাজা থাকতো।

এমন কি হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন স্ত্রী লোক ডালি নিয়ে গেলে কিছু দূর যেতে না যেতেই ডালিটি ফলে ভর্তি হয়ে যেতো। গাছ হতে যে ফলগুলো আপনা আপনিই পড়তো ওগুলো এতো বেশী হতো যে, হাত দ্বারা ভেঙ্গে দেয়ার কোন প্রয়োজনই হতো না। এ দেয়ালটি মারাবে অবস্থিত ছিল। ওটা সানআ' হতে তিন মনযিল দূরে ছিল। এটা সাদ্দে মারিব নামে খ্যাত ছিল।

আল্লাহর ফজল ও করমে সেখানকার আবহাওয়া এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ছিল যে, তথায় মশা, মাছি এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় ছিলই না। এটা এ জন্যেই ছিল যে, যেন তথাকার লোক আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেয় এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদত করে। এগুলোই ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন যার বর্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

পাহাড়ের মাঝে ছিল গ্রাম। গ্রামের এদিকে-ওদিকে ফল-ফুল সুশোভিত বাগান ছিল এবং ছিল নহর ও শস্যক্ষেত্র। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযক ভোগ কর এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক।

কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে গেল। তারা সূর্য পূজায় মেতে উঠলো। যেমন হুদহূদ এসে হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে খবর দিলোঃ

অর্থাৎ "আমি আপনার কাছে সাবা হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সব কিছু হতে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে।

শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভনীয় করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না।"(২৭:২২-২৪)

বর্ণিত আছে যে, বারোজন অথবা তেরোজন নবী তাদের কাছে এসেছিলেন। অবশেষে তাদের দুষ্কর্মের ফল ফলতে শুরু করলো। তারা যে বাঁধটি বেঁধে রেখেছিল সেটা ইঁদুরে ভিতর হতে কেটে ফাঁপা করে দিলো। বর্ষার সময় সেটা ভেঙ্গে গেল। পানি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এরই সাথে সাথে নদীর পানি, ঝরণার পানি, বর্ষার পানি, নালার পানি সব একত্রিত ও মিলিত হয়ে গেল। তাদের ঘর-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সবই ধ্বংস হয়ে গেল। তারা এখন হাত কামড়াতে লাগলো। তাদের সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

আরো বিপদ দেখা দিলো তাদের বাগানে কোন ফলবান বৃক্ষ জন্মে না। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাদেরকে যে সুন্দর দু'টি উদ্যান দিয়েছিলেন, ও দু'টিকে পরিবর্তন করে দিয়ে তিনি এমন দু'টি উদ্যান দিলেন যাতে উৎপন্ন হয় শুধু বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউগাছ এবং কুল গাছ। এটা ছিল তাদের কুফরী, শিরক, হঠকারিতা ও অহংকারের প্রতিফল যে, তারা আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে হারিয়ে ফেললো এবং তার গযবে জড়িয়ে পড়লো। আল্লাহ তা'আলা কৃতঘ্ন ছাড়া অন্য কাউকেও এমন শাস্তি দেন না।

হযরত আবু যাথীরা (রঃ) বলেন, পাপসমূহের বিনিময় এটাই হয় যে, ইবাদতে অলসতা আসে, আয়-উপার্জন কমে যায়, অভাব-অনটন বেড়ে যায়, সবকিছুর স্বাদ উঠে যায়, কোন শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, বরং সেখানে অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় এবং সমস্ত আশা নৈরাশ্যে পরিণত হয়।

পর্ব ৫১: চারজন নারী

🔶সূরা তাহরীমঃ আয়াত ১০-১২

আল্লাহ তা'আলা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কঠোরতা অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করছেন। এতে দাওয়াত, উত্তম উপদেশ, তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করা ও সশস্ত্র জিহাদ সব কিছু শামিল। (তাফসীর সা'দী)।

তারপর আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মু'মিনদের জন্য দুটি উদারহণ পেশ করছেন। প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য উদাহরণ পেশ করছেন দুজন প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা দুজন নাবীর স্ত্রীদের দ্বারা। তারা বড় বড় দুজন নাবীর স্ত্রী, কিন্তু তা সত্বেও ঈমান না থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে রেহাই পাবে না। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা কাফির সম্প্রদায়কে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তোমরা নিজেদেরকে যত বড় দাবী কর আর যত বড় নেক লোকদের নেতৃত্বাধীন থাকো না কেন ঈমান না আনলে কোন বাহাদুরী কাজে আসবে না।

فَخَانَتَاهُمَا এখানে খেয়ানত দ্বারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তা নয়। কারণ নাবীদের স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত। এটা রাসূলদের সম্মানার্থে। বরং তাদের খেয়ানত ছিল দীনের ব্যাপারে। নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী লোকদের বলে বেড়াতো যে, সে (আমার স্বামী নূহ) একজন পাগল। আর লূত (আঃ)-এর স্ত্রী নিজ বাড়িতে আগত মেহমানদের ব্যাপারে জাতিকে অবগত করিয়ে দিত যাতে তারা তাদের সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়। (ইবনু কাসীর)

কেউ বলেছেন : এরা উভয়েই তাদের জাতির লোকদের মাঝে নিজ নিজ স্বামীর চুগলি করে বেড়াত। তারপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য উদাহরণ পেশ করছেন ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও মারইয়াম (আঃ) দ্বারা। ফির'আউন ছিল তৎকালীন একজন ক্ষমতাধর কাফির বাদশা। এতদসত্বেও আসিয়া আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং শরয়ী বিধি বিধান যথাযথ পালন করেছে, যার কারণে তার স্বামীর কুফরী তার ঈমানকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি।

অনুরূপভাবে মারইয়াম (আঃ) নিজের সতীত্ব হেফাযত করেছিলেন আর আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। ফলে তাকে বিনা স্বামীতে সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তিনি সে পরীক্ষায় ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মু'মিন নর ও নারীদের বুঝাতে চাচ্ছেন যে, প্রতিকূল পরিবেশেও যারা ঈমানের ওপর অটল থাকে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমিনে চারটি দাগ টানলেন এবং বললেন : তোমরা কি জান এটা কী? সাহাবীগণ বললেন : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) বললেন : জান্নাতীদের শ্রেষ্ঠ মহিলা হলেন খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ, মারইয়াম বিনতু ইমরান ও আসিয়া (ফির'আউনের স্ত্রী)। (আহমাদ হা. ২৬৬৮, সনদ সহীহ)।

এরূপ তাদের ফযীলতের আরেকটি সহীহ হাদীস রয়েছে যার আলোচনা সূরা আলি ইমরানের ৪২ নম্বর আয়াতে করা হয়েছে।

সুতরাং কাফির নারীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত তাদের পক্ষে স্বামীদের আনুগত্য না করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা উচিত এবং মু'মিন নারীদের উচিত স্বামী যতই আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কাজে জড়িত করার চেষ্টা করুক তারা তাতে লিপ্ত না হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়কে সর্বদা প্রাধান্য দেবে।

📍 চারজন নারী হলেনঃ

১)হযরত নূহ (আঃ) এর স্ত্রী।
২)হযরত লূত (আঃ) এর স্ত্রী।
৩)হযরত আছিয়া (রাঃ)
৪)হযরত মারইয়াম (রাঃ)

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। তবে স্থান ও কাল ভেদে এ বিধান ভিন্ন হয়।
২. ঈমান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন সদামল গ্রহণযোগ্য হবে না, সে যে কেউ হোক না কেন।
৩. প্রতিকূল পরিবেশে ঈমান ধরে রাখার ফযীলত জানলাম।
৪. চারজন মহিলার ফযীলত জানতে পারলাম।
৫. মারইয়াম (আঃ)-এর সতিত্ব সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি নিজের সতীত্ব সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিনা স্বামীতে ঈসা (আঃ)-কে সন্তান হিসাবে দান করেছেন।

পর্ব ৫২: একজন ঈমানদার বালক

🔶সূরা বুরুজঃ আয়াত ৪-৭

আসহাবুল উখদূদের সংক্ষিপ্ত কাহিনী:

অতীতকালে এক বাদশার এক জাদুকর ও গণক ছিল। যখন সে গণক বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হলো তখন সে বাদশাকে বলল, আমাকে একটি বুদ্ধিমান বালক দিন যাকে আমি এ বিদ্যা শিক্ষা দেব। সুতরাং বাদশা সে রকম একজন বুদ্ধিমান বালক খোঁজ করে তার কাছে সমর্পণ করলেন।

ঐ বালকের পথে এক পাদরিরও ঘর ছিল। বালকটি পথে আসা যাওয়ার সময় সে পাদরির নিকট গিয়ে বসত এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। এভাবে তার আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকে। একদা এ বালকটির যাওয়ার পথে এক বৃহদাকার জন্তু (বাঘ অথবা সাপ) বসে ছিল যে মানুষের আসা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল।

বালকটি চিন্তা করল, আজকে আমি পরীক্ষা করব যে জাদুকর সত্য, না পাদরী। সে একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ তা'আলা! যদি পাদরীর আমল তোমার কাছে জাদুকরের আমল থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় হয়, তাহলে এ জন্তুকে মেরে ফেল, যাতে মানুষ চলাচল করতে পারে। এ বলে বালকটি পাথর ছুড়লে জন্তুটি মারা গেল। এবার বালকটি পাদরীর নিকট গিয়ে সব খুলে বলল।

পাদরী বললেন : হে বৎস! এবার দেখছি তুমি পূর্ণ দক্ষতায় পৌঁছে গেছো। এবার তোমার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কিন্তু এ পরীক্ষা অবস্থায় আমার নাম তুমি প্রকাশ করবে না। এ বালকটি জন্মান্ধ ও ধবল প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও করত; তবে তা আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাসের শর্ত রেখেই করত।

বালকটি এ শর্তানুযায়ী বাদশার এক সহচরের অন্ধ চক্ষুকে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে ভাল করে দেন। বালকটি বলত যে, আপনি যদি ঈমান আনেন তাহলে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করব; তিনি আরোগ্য দান করবেন। সুতরাং সে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি রোগীকে আরোগ্য দান করতেন। এ খবর বাদশার নিকট গেল, সে বড় উদ্বিগ্ন হলো। কিছু সংখ্যক ঈমানদারকে সে হত্যাও করে ফেললো। আর এ বালকটির ব্যাপারে তিনি কয়েকটি লোককে ডেকে বললো যে, এ বালকটিকে উঁচু পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে নীচে ফেলে দাও।

বালকটি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলে পাহাড় কাঁপতে লাগল। সে ছাড়া সকলেই পাহাড় থেকে পড়ে গেল। বাদশা তখন বালকটিকে অপর কিছু লোকের কাছে সমর্পণ করে

বললো, একে একটি নৌকায় চড়িয়ে সমুদ্রের মাঝে নিক্ষেপ কর। সেখানেও বালকটি বেঁচে গেল।

এবার বালকটি বাদশাকে বলল : যদি আপনি আমাকে মারতে চান তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি হলো একটি খোলা মাঠে লোকদেরকে সমবেত করে "বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম" বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন। দেখবেন আমি মারা গেছি। বাদশা তাই করলো। ফলে বালকটি মৃত্যুবরণ করল। সে ঘটনাস্থলেই লোকেরা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল যে, আমরা এ বালকটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

বাদশা আরো অধিক উদ্বিগ্ন হলো। অতএব সে তাদের জন্য গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালাতে আদেশ করলো। অতঃপর হুকুম দিলো যে, যে ব্যক্তি ঈমান হতে ফিরে না আসবে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ কর। এভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরা আসতে থাকল এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল।

পরিশেষে একটি মহিলার পালা এল, যার সঙ্গে তার বাচ্চাও ছিল। সে একটু পশ্চাদপদ হলো। কিন্তু বাচ্চাটি বলে উঠল, আম্মাজান! ধৈর্য ধরুন। আপনি সত্যের ওপরে আছেন। সুতরাং সেও আগুনে পুড়ে শহীদ হয়ে গেল। (সহীহ মুসলিম, যুহদ অধ্যায়, আসহাবে উখদূদ পরিচ্ছেদ।)

- এখানে আসহাবুল উখদূদের ঘটনাটি থেকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরা হলো:

* আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস: এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো আল্লাহর প্রতি গভীর ও অবিচল আস্থা। বালকটি বারবার কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে, কিন্তু প্রতিবারই সে আল্লাহর ওপর ভরসা করেছে। তার বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল যে সে জানত, আল্লাহ চাইলে তাকে রক্ষা করবেন।

* ঈমানের জন্য আত্মত্যাগ: ঈমানদাররা নিজেদের বিশ্বাস ত্যাগ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করেছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের ঈমানের ওপর অটল থাকা কত জরুরি।

* অন্যকে আল্লাহর পথে ডাকা: বালকটি শুধু নিজে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, বরং সে মানুষকেও আল্লাহর দিকে ডেকেছে। তার সৎ কাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

* আল্লাহর সাহায্য: গল্পের প্রতিটি ঘটনায় আমরা দেখি, যখনই বালকটি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছে, আল্লাহ তাকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া বা

সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার মতো বিপদ থেকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের সবসময় সাহায্য করেন।

* শহীদের মর্যাদা: আগুনে পুড়ে শহীদ হওয়া ঈমানদাররা আসলে নিজেদের জীবনের মাধ্যমে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাদের এই আত্মত্যাগ অন্য মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। ছোট শিশুটিও তার মায়ের মনে সাহস জুগিয়েছে, যা প্রমাণ করে ঈমানের শক্তি বয়স বা পরিস্থিতি মানে না।

পর্ব ৫৩ বাগানে অগ্নিকাণ্ড

🔶সূরা ক্বালামঃ আয়াত ২৯

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে আল্লাহ তা'আলা একজন বাগানের মালিকের সন্তানদের ঘটনা উল্লেখ করছেন। কৃপণতার জন্য যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি দিয়েছেন তেমন মক্কাবাসী কাফিরদেরও শাস্তি প্রদান করেছেন।

🔶ঘটনার সারসংক্ষেপ : বাগানের মালিক ইয়ামানের একটি গ্রাম জরওয়ান (ضروان) এর অধিবাসী। তা সানআ থেকে ৬ মাইল দূরে। আবার বলা হয় তারা হাবশাবাসী। এ বাগানের মালিক আহলে কিতাব ছিলেন। তিনি বাগান থেকে যা পেতেন তার এক ভাগ নিজ পরিবারের সারা বছরের খরচ হিসাবে রাখতেন, আরেক ভাগ পরবর্তী বছর ফসল উৎপাদনের জন্য রাখতেন, অন্য ভাগ গরীব মিসকীনদের দান করতেন।

মালিক মারা গেলে তার সন্তানেরা নীতি বহির্ভূত কাজ করতে লাগল। বলল : আমাদের পিতা একজন বোকা লোক ছিলেন। আমরা গরীর মিসকীনদের কিছুই দেব না, সব জমা করব। তাই তাদের পরিকল্পনা ছিল : সকাল সকাল বাগানে চলে যাবে যাতে কোন মিসকীন না দেখে। তারা তাই করল, তারা সকাল সকাল রওনা দিল কিন্তু তাদের এসব কথাবার্তার পূর্বে ইনশা-আল্লাহ বলেনি। ফলে বাগানে যেয়ে দেখে সব ধ্বংস হয়ে গেছে।

তারা বলাবলি করতে লাগল : আমরা মনে হয় পথ ভুল করে এসেছি। তাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ছিল সে বলল : আমি কি বলিনি যে তোমরা ইনশা-আল্লাহ বলোনি। তারা মাহরুম হল। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বঞ্চিত করলেন। তাদের এ পরিণতির কারণ হচ্ছে : তারা ফসলের যাকাত তথা উশর আদায় করেনি।

📍তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।'

অর্থাৎ, এখন তারা বুঝতে পেরেছে যে, পিতা যে নিয়মে কাজ করেছেন তার বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা বড়ই ভুল করেছি। যার শাস্তি আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন।

এ থেকে এও বোঝা গেল যে, গোনাহ করার দৃঢ় সংকল্প করা ও তার প্রতি প্রাথমিক পদক্ষেপও গোনাহ করার মতই অপরাধ। এতে পাকড়াও হতে পারে। (যেমন হাদীসে এসেছে, দুই মুসলিম খুনাখুনি করলে খুনী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই দোযখে যাবে। কারণ নিহত ব্যক্তিরও তার সঙ্গীকে খুন করার দৃঢ় সংকল্প ছিল।) শুধুমাত্র সেই পাপ-ইচ্ছা ক্ষমার যোগ্য, যা মনের খেয়াল ও কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

পর্ব ৫৪ শাদ্দাদের জান্নাত

🔶সূরা ফজরঃ আয়াত ৬-১৩

আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী সনদবিহীন একটি বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যে, আদ এর দুই পুত্র ছিল, একজন শাদ্দাদ ও অপর জন শাদীদ। শাদীদের মৃত্যুর পর শাদ্দাদ রাজত্বের মালিক হয়। সে নয়শ বছর জীবিত ছিল। জান্নাতের কথা শুনে সে আদনের মরুভূমিতে তিনশ বছর ধরে বিশাল শহর নির্মাণ করে ও তাকে জান্নাত নামে নামকরণ করে। সেখানে সোনা-রূপা ও মনি মুক্তা ইত্যাদি দিয়ে বড় বড় অট্টালিকা তৈরি করে ও বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ রোপণ করে।

নির্মাণ শেষ হলে শাদ্দাদ তার দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁছার একদিন ও একরাতের পথ বাকী থাকতেই এক ভীষণ আসমানী বজ্রধ্বনি এসে সব ধ্বংস করে দেয়। (তাফসীর কুরতুবী)

তবে ইমাম ইবনু কাসীর (রহঃ) এ সম্পর্কে বলেন : এসবই ইসরাঈলী বর্ণনা যা তাদের কতক নাস্তিকগণ তৈরি করেছে, এর দ্বারা মূর্খ লোকদের জ্ঞানের পরিধি জানার জন্য। যাতে তারা তাদের সবকিছুকে বিশ্বাস করে নেয়। (ইবনু কাসীর) সুতরাং এসব কাহিনী মিথ্যা বানোয়াট এবং এর উদ্দেশ্য মানুষকে ধোঁকায় নিপতিত করা ছাড়া কিছুই নয়।

পর্ব ৫৫: হাতিবাহিনী ও পাখির ঝাঁক

🔶সূরা ফীলঃ আয়াত ১-৫

সূরাটি ইতিহাসের নিন্দিত আবরাহার হস্তীবাহিনী সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে বলে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্মের ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে ইয়ামানের খ্রিস্টান গভর্ণর আবরাহা প্রশিক্ষিণপ্রাপ্ত হস্তীবাহিনীসহ বিশাল সৈন্যদল নিয়ে কাবাগৃহ ধ্বংস করার জন্য এসেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা যে পক্ষীকুল তাদের দ্বারা ধ্বংস করেছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

🔶সংক্ষিপ্ত আকারে আবরাহার হস্তী বাহিনীর ঘটনা:

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের কথা। হাবশার বাদশার তরফ থেকে ইয়ামান দেশে আবরাহা গভর্নর ছিল। সে সান'আতে একটি খুব বড় গির্জা নির্মাণ করল। আর চেষ্টা করল, যাতে লোকেরা কাবা গৃহ ত্যাগ করে ইবাদত ও হাজ্জ উমরাহর জন্য এখানে আসে। এ কাজ মক্কাবাসী তথা অন্যান্য আরব গোত্রের জন্য অপছন্দনীয় ছিল।

অতএব তাদের মধ্যে একজন আবরাহার নির্মাণকৃত উপাসনালয়ে পায়খানা করে নোংরা করে দিল। আবরাহার নিকট খবর পৌঁছল যে, গীর্জাকে কেউ নোংরা ও অপবিত্র করে দিয়েছে। যার প্রতিক্রিয়ায় সে কাবা ঘরকে ধ্বংস করার দৃঢ় সংকল্প করল। সে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কার ওপর হামলা করার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিছু হাতীও তাদের সাথে ছিল। মক্কার নিকট পৌঁছে সৈন্যরা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের উটগুলো দখল করে নিল।

এ ব্যাপারে আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বললেন : উটগুলো ফিরিয়ে দাও। (আবরাহা বলল : এখন আমরা তোমাদের কাবা ধ্বংস করতে এসেছি, আর তুমি কেবল উট ছেড়ে দেওয়ার দাবী কর? তিনি বললেন : উটগুলো আমার, তাই আমি সেগুলোর হেফাযত চাই) যিনি কাবা ঘরের মালিক তিনিই তাঁর ঘর রক্ষা করবেন।

অতঃপর যখন এ সৈন্যদল "মুহাসসার" নামক উপত্যকার নিকট পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'আলা ছোলা অথবা মসুরীর দানা সমপরিমাণ কাঁকর দিয়ে পাখি প্রেরণ করলেন, যারা

ওপর থেকে সেই কাঁকর বর্ষণ করতে লাগল। যে সৈন্যের গায়ে এ কাঁকর লাগছিল তার গা থেকে মাংস খসে পড়ে গিয়েছিল এবং পরিশেষে মারা গিয়েছিল। সানআ পৌঁছতে পৌঁছতে খোদ আবরাহারও একই পরিণাম হয়েছিল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘর হেফাযত করলেন। (আয়সারুত তাফাসীর)

🔶সূরা হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইতিহাসে নিন্দিত আবরাহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তিবাহিনী সম্পর্কে জানলাম।
২. যারাই ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে তারাই ধ্বংসে নিপতিত হয়েছে।
৩. ইসলাম বিদ্বেষীরা যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করতে ইচ্ছা করলে নিমেসেই যে-কোন আযাব দ্বারা শেষ করে দিতে পারেন।

পর্ব ৫৬: জাদুর চিকিৎসা

🔶সূরা ফালাক,সূরা নাস

সূরা ফালাক ও সূরা নাস উভয় সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত শব্দ থেকে। ফালাক (الفلق) শব্দের অর্থ : প্রভাতকাল। আর নাস (النَّاس) অর্থ : মানুষ। এ দুই সূরাকে একত্রে معوذتان বা আশ্রয় প্রার্থনা করার দুই সূরা বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদুগ্রস্থ হওয়ার পর এ সূরাদ্বয় দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হলে আল্লাহ তা'আলার রহমতে তিনি সুস্থ হন, তাই এ নামেও এ সূরাদ্বয় পরিচিত।

শানে নুযূল: মা আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, মদীনার ইয়াহূদী গোত্র বনু যুরাইকের মিত্র লাবীদ বিন আসাম নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েকে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার ছিন্নচুল ও চিরুনীর ছিন্ন দাঁত চুরি করে এনে তাতে জাদু করে এবং মন্ত্র পাঠ করে চুলে ১১টি গিরা দেয়।

এর প্রভাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজ করলে ভুলে যেতেন ও ভাবতেন যে করেননি। অন্য বর্ণনা মতে ৪০ দিন বা ৬ মাস এভাবে থাকেন। এক রাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে, দু'জন লোক এসে একজন তাঁর মাথার কাছে অন্যজন পায়ের কাছে বসে। অতঃপর তারা বলে যে, বনু যুরাইকের খেজুর বাগানে যারওয়ান কূয়ার তলদেশে পাথরের নীচে চাপা দেয়া খেজুরের কাঁদির শুকনো খোসার মধ্যে ঐ জাদু করা চুল ও চিরুনীর দাঁত রয়েছে। ওটা তুলে এনে গিরা খুলে ফেলতে হবে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে আলী (রাঃ)-কে সেখানে পাঠান এবং যথারীতি তা তুলে আনা হয়। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাদ্বয় পড়ে ফুঁ দিয়ে গিরাগুলো খুলে ফেলেন এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান। (সহীহ বুখারী হা. ৫৭৬৫, ৫৭৬৬)

আয়িশাহ (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাদুকৃত চুল ও চিরুনীর দাঁত উদ্ধার হওয়ার পর সূরা ফালাক ও নাস নাযিল হয়। যার ১১টি আয়াতের প্রতিটি আয়াত পাঠের সাথে সাথে জাদুকৃত ১১টি চুলের গিরা পরপর খুলে যায়

এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালকা বোধ করেন ও সুস্থ হয়ে যান। (ইবনু কাসীর)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রতিশোধ নিতে বলা হলে তিনি বলেন : আল্লহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি অপছন্দ করি যে, মানুষের মাঝে খারাপ কিছু ছড়িয়ে দেওয়া হোক। (সহীহ বুখারী হা. ৬৩৯১)

গুরুত্ব: ওকবা বিন আমের আল যুহানী (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার কাছে এমন কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার অনুরূপ আর দেখা যায়নি। তাহলো সূরা ফালাক ও সূরা নাস। (সহীহ মুসলিম হা. ৮১৪) অন্য বর্ণনাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি জান আজ রাতে এমন কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার সদৃশ ইতোপূর্বে কখনই দেখা যায়নি। তাহলো সূরা ফালাক ও নাস। (সহীহ মুসলিম হা. ৮১৪)

ফযীলত: আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাতে যখন বিছানায় যেতেন তখন দু হাত একত্রিত করে ফুঁ দিতেন, অতঃপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতেন। তারপর যথাসম্ভব দু হাত দিয়ে শরীর মাসাহ করতেন। তিনি প্রথমে মাথা, মুখমন্ডল ও শরীরের সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করতেন। (সহীহ বুখারী হা. ৫০১৭)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন ও মানুষের চোখ লাগা হতে আশ্রয় চাইতেন কিন্তু যখন সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হলো তখন তিনি সব বাদ দিয়ে এ দু'টিই পড়তে থাকেন। (সূরা কালামের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

উকবা বিন আমের (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি সালাতের শেষে সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযী হা. ২৯০৩ আবূ দাঊদ হা. ১৫২, মিশকাত হা. ৯৬৯)

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুখে পড়তেন, তখন সূরা ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের দেহে হাত বুলাতেন। কিন্তু যখন ব্যাথা-যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে যেত তখন বরকতের আশায় আমি তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে দিতাম। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে : পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। (সহীহ বুখারী হা. ৫০৯২, সহীহ মুসলিম হা. ২১৯২)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করেছেন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

আমি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয়ে নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান হতে, বিষাক্ত কীট পতঙ্গ ও প্রত্যেক অনিষ্টকারীর চক্ষু হতে। (সহীহ বুখারী হা. ৩৩৭১)। এ ছাড়াও ঝাড়-ফুঁকের অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

কিন্তু যদি ঝাড় ফুঁক কুরআন বা সহীহ সুন্নাহ অনুপাতে না হয়ে অন্য কোন বানোয়াট শির্কী কথা দ্বারা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ হারাম। বিভিন্ন বালা-মসিবত থেকে বাঁচার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাবিজ ঝুলানো বা তাবিজ বাঁধা চাই তা কুরআন দ্বারা হোক আর অন্য কিছু হোক তা সম্পূর্ণ নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল। (আহমাদ হা. ১৭৪৫৮, সিলসিলা সহীহাহ হা. ৪৯২)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায় তাকে তার দিকেই সোপর্দ করে দেয়া হবে। (তিরমিযী হা. ২০৭২, মিশকাত হা. ৪৫৫৬, সনদ হাসান।)

তাই ঝাড়-ফুঁকের প্রয়োজন হলে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই করতে হবে।

হিংসা করা কবীরাহ গুনাহ ও মারাত্মক ব্যাধি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা হিংসা মানুষের সৎ আমল এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠ খেয়ে ফেলে। (আবূ দাঊদ হা. ৪৯০৩, সহীহ)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন : হিংসা হলো প্রথম পাপ, যা আসমানে করা হয় এবং প্রথম পাপ যা পৃথিবীতে করা হয়। যা আসমানে ইবলীস আদমের সাথে করেছিল। আর পৃথিবীতে কাবীল তার ছোট ভাই হাবীলের সাথে করেছিল। অতএব হিংসুক ব্যক্তি অভিশপ্ত, বহিস্কৃত ও প্রত্যাখ্যাত। (তাফসীর কুরতুবী)

তাই হিংসাকারীর অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ তা'আলা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

📍হিংসা থেকে বাঁচার উপায় হল বেশি বেশি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া। এজন্য নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সে-সব ভাইদের ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" (সূরা হাশর ৫৯ : ১০)

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সূরা ফালাক ও নাসের অন্যান্য নাম জানলাম।
২. এ দুটি সূরার গুরুত্ব ও ফযীলত জানলাম।
৩. জাদুটোনা ও তাবীজ-কবচ শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ।
৪. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক হলে বৈধ, অন্যথায় তা অবৈধ।
৫. জাদুর প্রভাব রয়েছে যার প্রমাণ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে।
৬. ইয়াহূদীরা ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন চক্রান্ত ও অপকৌশল অবলম্বন করে আসছে যা আজও বিদ্যামান।
৭. হিংসা একটি বড় গুনাহ এবং মারাত্মক ব্যাধি যা মানুষের সৎ আমল বিনষ্ট করে দেয়।

পর্ব ৫৭: কুরআনের ভবিষ্যৎবাণী

🔶সূরা রূমঃ আয়াত ২-৩
🔶সূরা ফজরঃ আয়াত ৭
🔶সূরা ইউনুসঃ আয়াত ৯০-৯২

১)পারস্যের উপর রোমানদের বিজয়ঃ

কয়েক বছরের মধ্যেই*। পূর্বের ও পরের সব ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে।

* بضع سنين তিন থেকে দশ বছর। এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, অনধিক নয় বছরের মধ্যে রোমানরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করবে। ৬২৩-২৪ খৃ এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। আর সে বছরই বদর যুদ্ধে মুসলিমরা মুশরিকদেরকে পরাজিত করে।

২)ইরাম শহর এর রহস্যঃ

সূরা আল ফজর, আয়াত নং ৭ এখানে ইরাম নামক একটি শহরের ধ্বংস এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ইরাম নামক কোন শহর এর নাম পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্য ঐতিহাসিক ও তাফসিরকারকগণ ঐ শহরটির সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারতেন না।

ইরাম শহরের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া গেছে এবলা ট্যাবলেটে, যা আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তারিখযুক্ত। ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ ওমানে একটি বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

৩)ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণঃ

ফেরাউন ডুবে মারা গেছে আর মৃত্যুর পরও তার শরীর অক্ষত রাখা হবে, পরবর্তী সীমালংঘনকারীদের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে।আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি

নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে।

এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে। এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। [সূরা ইউনুস (৯০-৯২)]

১৮৯৮ সালে এক ফেরাউনের লাশ উদ্ধার হয়। ধারনা করা হয় এটিই কুরআনে বর্ণিত সেই ফিরআউন। লাশটি বর্তমানে মিশরের কায়রোতে দ্যা রয়েল মমী হলে একটি কাঁচের সিন্দুকের মধ্যে রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২০২ সেন্টিমিটার। ৩১১৬ বছর পানির নীচে থাকা সত্ত্বেও তার লাশে কোন পঁচন ধরে নি।

পর্ব ৫৮: আদম (আঃ) এর সৃষ্টি

🔶সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ৫৯
🔶সূরা হিজরঃ আয়াত ২৬
🔶সূরা নিসাঃ আয়াত ১
🔶সূরা ইনসানঃ আয়াত ২

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন صَلْصَالٍ বা এমন শুকনো মাটি হতে যাতে কোন কিছু দ্বারা আঘাত করলে আওয়াজ হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন- صلصال দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা মাটি। এখানে মানুষ বলতে আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। যাঁর প্রথমত মাটি থেকে আকার তৈরি করা হয় অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাতে 'রূহ' ফুঁকে দেন। অতঃপর আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাড় হতে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং তাদের উভয়ের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

"মানুষকে (আদমকে) তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি হতে, আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি শিখা হতে।" (সূরা আর রহমান: ৫৫:১৪-১৫)

অর্থাৎ মানুষ হল মাটির তৈরি জাতি আর জিন হল আগুনের তৈরি জাতি।

صَلْصَالٍ হল এমন মাটি যা শুকিয়ে গেলে তাতে ঠনঠন শব্দ হয়।

(حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ)

হল এমন মাটি যা দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তার রং ও গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে। جن অর্থ ঢাকা, জিনেরা যেহেতু মানুষের চোখের আড়ালে থাকে তাই তাদেরকে الْجَآنَّ বা জিন বলা হয়। السَّمُوْمِ বলা হয় আগুন যার কোন ধোঁয়া নেই। مِنْ قَبْلُ বলতে মানুষের পূর্বে, অর্থাৎ মানুষের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা প্রখর আগুন থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে এসেছে:

ফেরেশতাদেরকে নূর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে শিখাযুক্ত আগুন হতে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদের সামনে বর্ণনা করা হল। (সহীহ বুখারী হা: ২৯৯৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদমের সৃষ্টি সমাপ্ত করার পর সকল ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন তাকে সিজদা করার জন্য। সকল ফেরেশতা সিজদা করেছে শুধুমাত্র ইবলীস তাকে সিজদা করেনি। এখানে সিজদা মূলত ইবাদত করার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইবলীস সে অহংকার করল, সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং যুক্তি পেশ করল যে, আমাকে আগুন দ্বারা তৈরি করা হয়েছে আর আদমকে মাটি দ্বারা, আগুনের কাজ ওপরে উঠা আর মাটির কাজ নিচে অবস্থান করা। সুতরাং আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।

আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে যে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন তার এই অবাধ্য হওয়ার কারণে তাকে সেই জান্নাত থেকে বের করে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

((قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ))

"তিনি বললেন: 'এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহঙ্কার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আ'রাফ ৭:১৩) এবং আল্লাহ তা'আলা তার ওপর অভিশম্পাত করলেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

((وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ إِلٰي يَوْمِ الدِّيْنِ))

"এবং তোমার প্রতি আমার অভিশাপ ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত।" (সূরা স্ব-দ ৩৮:৭৮)

ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে যখন বহিষ্কৃত হল তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে সে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন আয়ুর অবকাশ দেয়ার জন্য প্রার্থনা করল। আল্লাহ তা'আলা তাকে الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ বা কিয়ামত পর্যন্ত জীবন আয়ুর অবকাশ দিলেন। ইবলীস শপথ করে বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে জন্য আমাকে বিপথগামী করেছেন সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

((قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ))

“সে বলল: তোমার ইযযতের শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবই।” (সূরা স্ব-দ ৩৮:৮২)

কিভাবে পথভ্রষ্ট করবে তা অন্যত্র বলা হয়েছে, সে মানুষের কাছে পাপ কাজসমূহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও চাকচিক্যময় করে তুলে ধরবে। ফলে মানুষ তাতে লিপ্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলার সৎ বান্দাদের ওপর তার কোনই কর্তৃত্ব থাকবেনা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হবে না। বরং উদ্দেশ্য হল তারা এমন কোন পাপ করবে না, যার পর তারা লজ্জিত হবে না বা তাওবা করবে না। কারণ সে পাপই মানুষের ধ্বংসের কারণ হয় যার পর মানুষ অনুতপ্ত হয় না এবং তাওবাও করে না। মানুষ পাপ করতে পারে এটাই স্বাভাবিক, তবে পাপ কাজ করার পর তাওবা করলে তাকে পাকড়াও করা হবে না। কোন ব্যক্তির ভুলবশত পাপ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তার চেয়ে বেশি খুশি হন যেমন মরুভূমিতে কারো খাদ্য ও পানীয়সহ বাহন হারিয়ে যাওয়ার পর তা ফিরে পেলে খুশি হয়।

আর যারা ইবলীসের অনুসরণ করবে তারাই হবে বিভ্রান্ত। আর তারাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

পর্ব ৫৯: উত্থান থেকে পতন

🔶সূরা আরাফ ১১-২৫

এ আয়াতগুলো আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি, ফেরেশতা কর্তৃক তাকে সিজদাহ করানো, জান্নাতে বসবাস, শয়তানের কুমন্ত্রণায় নিষেধকৃত বিষয়ে লিপ্ত হওয়া, জান্নাত থেকে বহিস্কার, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ করা এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে শয়তানের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সবের অধিকাংশ বিষয় সূরা বাক্বারার শুরুতে (৩৪-৩৯ নং আয়াতে) আলোচনা করা হয়েছে।

"তিনি (আল্লাহ) বললেন: হে ইবলীস! আমি যাকে নিজের দু'হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদাহ করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীলদের একজন?" (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫)

'আমি তার অপেক্ষা উত্তম' অর্থাৎ শয়তান আদম (আঃ)-কে সিজদাহ না করার কারণ পেশ করল: আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি আগুন দ্বারা সৃষ্ট আর সে মাটি দ্বারা সৃষ্ট। আগুন মাটি থেকে উপরে থাকে। এটা ছিল শয়তানের হিংসা ও অহঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: সে ছিল অহঙ্কারী। অহঙ্কার হল সকল ধ্বংসের মূল। ইবলীস প্রথমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দা হওয়া সত্ত্বেও পরে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হল।

ইবলীস তার অহংকার এর কারনে এত মর্যাদা থাকার পরও এত ভয়ংকর পতন এর স্বীকার হলো যা তাকে দুনিয়া আখিরাতে বরবাদ করে দিলো।

'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' শয়তান বিতাড়িত হবার পর আল্লাহ তা'আলার কাছে কিয়ামত অবধি আয়ু চাইলে আল্লাহ তা'আলা তা মেনে নিলেন।

'অতঃপর আমি তাদের নিকট আসব তাদের সম্মুখ...' অর্থাৎ শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সামনে, পেছনে, ডান ও বাম দিক দিয়ে আসবে। কিন্তু ওপর দিক থেকে আসতে পারবে না। উপর থেকে আল্লাহর সাহায্য, রহমত, বরকত নাযিল হয়। আর মানুষের কাছে খারাপ অশ্লীল বেহায়াপনাপূর্ণ কাজগুলো চাকচিক্য করে তুলে ধরবে।

এ জন্যেই তো হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা কর- "হে আল্লাহ! কোন দিক থেকেই সে যেন আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং প্রার্থনায় বলতেন- "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি, দ্বীনের জন্যেও দুনিয়ার জন্যেও এবং পরিবার ও ধন-সম্পদের জন্যেও। হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মাফ করে দিন, ভয় থেকে আমাকে নিরাপদে রাখুন। আর সামনের দিক থেকেও আমাকে রক্ষা করুন, পিছনের দিক থেকেও রক্ষা করুন এবং ডান দিক থেকেও আমাকে হিফাযত করুন, বাম দিক থেকেও আমাকে হিফাযত করুন এবং উপর দিক থেকেও রক্ষা করুন! আর শয়তান নীচের দিক থেকে আমার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে, এ থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা নির্বাহের সব উপকরণ দিয়েছেন। এসত্ত্বেও মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধানমত চলে কিনা তা পরীক্ষার জন্য ইবলীসকে সুযোগ দিয়েছেন। যারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ বান্দা তারা আল্লাহ তা'আলার পথে অটল থাকবে, তারা মুক্তি পাবে। আর যারা ইবলীসের অনুসরণ করবে আল্লাহ তা'আলা ইবলীসসহ তাদেরকে জাহান্নামে দিবেন।

'সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল' অর্থাৎ শয়তান আদম (আঃ)-এর কাছে আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলল: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কল্যাণকামী। ঐ গাছের কাছে যেতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন এ কারণে, যাতে তোমরা ফেরেশতা না হয়ে যাও অথবা চিরস্থায়ী না হতে পার। কত বড় মিথ্যুক শয়তান। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হবার পর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম) উভয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

যে শয়তান আদম (আঃ)-এর সুখ সহ্য করতে পারেনি, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করেছে সে শয়তান আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা যেন কিছুতেই তার কথা শুনে সঠিক পথ না হারাই। এ সম্পর্কে আরো আলোচনা সূরা হিজর-এ এসেছে।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শয়তানের অহঙ্কারের কথা অবগত হলাম, অহংকারই ধ্বংসের মূল, এ অহংকারের কারণে মানুষ হক হতে বিচ্যুত ও বঞ্চিত হয়।

২. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, তার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা, সে ধোঁকা দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, তাই তার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

৩. শয়তানের চক্রান্তে পড়ে অন্যায় করলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবাহ করা উচিত, এটাই আদম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। আর তাওবাহ না করে অপরাধে অটল থাকা শয়তানের কাজ।

৪. মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থান হবে, সেখানে মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল দেয়া হবে তার প্রমাণ পেলাম।

৫. নগ্নতা শয়তানের প্রথম কাজ, সে নগ্নতার মাধ্যমে সমাজে বেহায়াপনা ছড়িয়ে দিতে চায়।

৬. সমাজে অশ্লীল-বেহায়াপনা ও ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শয়তান নারীদেরকে বড় ধরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

পর্ব ৬০: আল্লাহর খলিফা

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ৩০-৩৪

খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য আদম ও তাঁর বংশধর, শুধু আদম (আঃ) নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, তারা সেখানে বিবাদ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে?

এটা জানা কথা যে, আদম (আঃ) ফাসাদকারী নন এবং রক্তপাতকারীও নন। যেমন পূর্বের আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়। (আযওয়াউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭০)

আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদের কাছে খলীফা সৃষ্টির কথা বললেন তখন ফেরেশতাগণ বলল-

আপনি এমন ব্যক্তিদের সৃষ্টি করবেন যারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে, রক্তপাত ঘটাবে?

তাদের এ প্রশ্নের অর্থ এটা নয় যে, তারা গায়েব জানে। বরং তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হবে। এজন্য তারা ঐ মন্তব্য করেছিল।

অথবা খলীফা শব্দের অর্থ জেনেই তারা এটা বুঝেছিল যে, মানুষ হবে ন্যায়-অন্যায়ের ফায়সালাকারী, অনাচার প্রতিহতকারী, অবৈধ ও পাপ কাজের বাধাদানকারী; ফলে তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং রক্তপাত ঘটবে।

অথবা পূর্বে যারা পৃথিবীতে বসবাস করেছিল তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখেই তারা মানুষের ব্যাপারেও এ মন্তব্য করেছিল।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের এ আরয প্রতিবাদমূলক ছিল না এবং আদম (আঃ)-এর প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে বলেছিল তাও নয়। কারণ ফেরেশতাগণ এরূপ চরিত্র থেকে পবিত্র।

ফেরেশতাদের আনুগত্য সম্পর্কে কুরআনে এসেছে-

“তারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হন তাই করেন।”(সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৬)

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে তাদের সামনে বিষয়টি উত্থাপনের উদ্দেশ্য হল, শুধু এর হিকমত জানাবার ও এর রহস্য প্রকাশ করার, যা ছিল তাদের বোধশক্তির ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ তা‘আলা তো ভালভাবেই জানেন যে, এরা বিবাদ ও ঝগড়াটে হবে, কাজেই তারা আল্লাহ তা‘আলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খলীফাসৃষ্টি করার পিছনে আপনার হিকমাত কী? যদি ইবাদত-ই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা তো আপনার ইবাদত করছি, আপনার প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠে সর্বদা রত রয়েছি এবং আমরা ঝগড়া-বিবাদ হতেও পূতপবিত্র, তারপরও আল্লাহ তা‘আলার খলীফা সৃষ্টি করার পেছনে কী হিকমত রয়েছে?

আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আমি যা জানি তোমরা তা জান না। অর্থাৎ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই আমি জানি যা তোমরা জানো না। আমি জানি তাদের মধ্যে নাবী-রাসূল, সত্যবাদী, শহীদ, সৎ বান্দা ইত্যাদি হবে। তারা এমন ইবাদত করবে যা তারা ছাড়া অন্যরা করবে না। যেমন জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদত। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের নিকট দিনের ফেরেশতা ও রাতের ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে। অতঃপর তারা উভয় দল ফজর ও আসরের সময় একত্রিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা (দিনের) ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন্ অবস্থায় রেখে এসেছ? তারা বলে, আমরা যখন তাদের নিকট আগমন করেছি তখন তাদেরকে পেয়েছি সালাতরত অবস্থায় এবং আমরা যখন তাদেরকে রেখে এসেছি তখনও তাদেরকে পেয়েছি সালাতরত অবস্থায়। (সহীহ বুখারী হা: ৬৯৯২, ৭০৪৮)

আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে একমুষ্ঠি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, যে মাটি তিনি সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ হতে নিয়েছিলেন। তাই আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন বর্ণ ও প্রকৃতি অনুসারে হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ এ সকলের মধ্যবর্তী বর্ণের হয়ে থাকে। অনুরূপ কেউ কোমল, কেউ কঠোর এবং কেউ সৎ ও কেউ অসৎ প্রকৃতির হয়ে থাকে। (তিরমিযী, সিলসিলাতুস সহীহাহ হা: ১৬৩০)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করে বললেন, যাও ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে সালাম কর। আর তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয় তা শ্রবণ কর। এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম। তখন তিনি গিয়ে বললেন, السلام عليكم তারা উত্তরে বলল, السلام عليك ورحمة الله

তারা ورحمة الله অংশটি বেশি বলল। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা আদমের আকৃতিতে জান্নাতে যাবে এবং তার উচ্চতা হবে ষাট হাত। তখন হতে ক্রমান্বয়ে আদম সন্তানের উচ্চতা কমে আসছে। (সহীহ বুখারী হা: ৩৩২৬, মুসলিম হা: ৭৩৪২, মিশকাত হা: ৪৪২৩)

পর্ব ৬১: প্লেগরোগের আযাব

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ৫৮-৫৯

‘এ নগর’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল “বায়তুল মুকাদ্দাস”, এ বিষয়ে যদিও অনেক মতানৈক্য পাওয়া যায় তবে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১:২২৯)

“দরজা দিয়ে প্রবেশ কর” এখানে দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজা, যা বর্তমানে হিত্তার দরজা বলে পরিচিত।

বানী ইসরাঈলের ইয়াহূদিদেরকে আল্লাহ তা‘আলা “আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিন” একথা বলে বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজা দিয়ে সিজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতার বশীভূত হয়ে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ অমান্য করে। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যখন বানী ইসরাঈলকে বলা হল

তোমরা সিজদাবনত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তখন তারা তা পরিবর্তন করে জানুর ভরে অর্থাৎ দাম্ভিকভাবে এবং حِطَّةٌ (ক্ষমা প্রার্থনা) এর পরিবর্তে حبة في شعرة (যবের দানা) বলতে বলতে প্রবেশ করে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪৭৯, সহীহ মুসলিম হা: ৩০১৫)

رجز অর্থ শাস্তি, এ শাস্তি কী ছিল সে ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়: যেমন আল্লাহ তা‘আলার গযব কঠিন ঠাণ্ডাজনিত কুয়াশা অথবা প্লেগ রোগ। প্লেগ রোগের সমর্থন হাদীসে পাওয়া যায়।

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এ প্লেগ সে আযাব ও শাস্তির অংশ যা তোমাদের পূর্বে কোন জাতির ওপর নাযিল করা হয়েছিল। তোমাদের উপস্থিতিতে কোন স্থানে যদি এ প্লেগ মহামারী দেখা দেয়, তাহলে সেখান থেকে বের হবে না এবং কোন স্থানে যদি এ মহামারী হয়েছে বলে শোন তাহলে সেখানে প্রবেশও করবে না। (সহীহ মুসলিম হা: ২২১৮)

পর্ব ৬২: ৭০ জন মৃতের জীবিত হওয়া

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ৫৫-৫৬

হযরত মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলের সত্তরজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তূর পাহাড়ে যান এবং ঐ লোকগুলি আল্লাহর কথা শুনতে পায়, তখন তারা মূসা (আঃ) কে বলে যে, তারা আল্লাহকে সামনে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নের ফলে দেখতে দেখতেই তাদের উপর আকাশ হতে বিদ্যুৎ পড়ে যায় এবং এক ভয়াবহ উচ্চ শব্দ হয়, তার ফলে তারা সবাই মরে যায়।

এদিকে হযরত মূসা (আঃ) কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর নিকট আরজ করেনঃ "হে আল্লাহ্! আমি বানী ইসরাঈলকে কি উত্তর দেবো! এরা তো তাদের মধ্যে উত্তম ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিল। হে প্রভু! আপনার এরূপ করার ইচ্ছে থাকলে ইতিপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে মেরে ফেলতেন। হে আল্লাহ! অজ্ঞ লোকেদের অজ্ঞতার কারণে আমাকে ধরবেন না।

তার এ প্রার্থনা কবুল হয় এবং তাকে বলা হয় যে, এরাও বাছুর পূজকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের শাস্তি হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর গোত্রের নিকট আসেন এবং তাদেরকে বাছুর পূজতে দেখেন, তিনি তার ভাই হারুনকে (আঃ) ও সামেরীকে তিরস্কার করেন। অতঃপর বাছুরকে পুড়িয়ে ফেলেন এবং ওর ছাই নদীতে ভাসিয়ে দেন।

তারপর তাদের মধ্যে হতে উত্তম লোকদেরকে বেছে নেন। তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর। তাওবা করাবার জন্যে তিনি তাদেরকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যান। তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তাওবা কর, রোযা রাখ, পবিত্র হয়ে যাও এবং কাপড় পাক কর। যখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে নিয়ে তূরে সীনায় পৌছেন , তখন ঐলোকগুলো বলেঃ "হে নবী (আঃ)! আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাঁর কথা আমাদেরকেও শুনিয়ে দেন।

হযরত মূসা (আঃ) পাহাড়ের কাছে পৌছলে এক খণ্ড মেঘ এসে সারা পাহাড় ঢেকে নেয় এবং তিনি ওরই ভিতর ভিতর আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হয়ে যান। আল্লাহ পাকের কথা আরম্ভ হলে হযরত মূসার (আঃ) কপাল আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই সময় কেউ তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতো না। লোকেরা এগিয়ে গেলে তারা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সবাই সিজদায় পড়ে যায়। হযরত মূসার (আঃ) প্রার্থনার ফলে তাঁর সঙ্গীয় বানী ইসরাঈলও আল্লাহ তা'আলার কথা শুনতে থাকে। তার কথা শেষ হলে মেঘ সরে যায় এবং হযরত মূসা (আঃ) তাদের নিকট চলে আসেন।

তখন তারা তাকে বলেঃ “হে মূসা (আঃ)! আমরা কখনও ঈমান আনবো না যে পর্যন্ত আমরা আমাদের প্রভুকে আমাদের সামনে দেখতে পাই। এ ঔদ্ধত্যের ফলে। এক ভূমিকম্প আসে এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। এখন হযরত মূসা (আঃ) খাটি অন্তরে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন এবং বলেন যে, এর চেয়ে তো বরং এর পূর্বেই মরে যাওয়া ভাল ছিল। নির্বোধদের কার্যের জন্যে আল্লাহ পাক যেন তাকে ধ্বংস না করেন। ওরা তো বানী ইসরাঈলের মধ্যে উত্তম লোক ছিল। এখন তিনি একাই ফিরে গেলে তাদেরকে কি উত্তর দেবেন? কেই বা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে এবং কেই বা আর তাঁর উপর ঈমান আনবে? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেন তার তাওবা কবুল করেন ও তার প্রতি দয়া করেন।

হযরত মূসা (আঃ) এভাবে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং আল্লাহ ঐ মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করেন। এখন সবাই সম্মিলিতভাবে বানী ইসরাঈলের পক্ষ হতে তাওবা করতে আরম্ভ করে। তাদেরকে বলা হয় যে, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে, সেই পর্যন্ত তাদের তাওবা কবূল করা হবে না। সুদ্দী কাবীর (রঃ) বলেন যে, এটা বানী ইসরাঈলের পরস্পর রক্তারক্তির পরের ঘটনা। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, এ সম্বোধন সাধারণ হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা দ্বারা উদ্দেশ্য এই সত্তর ব্যক্তিই বটে।

পর্ব ৬৩: ঐতিহাসিক বিতর্ক

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ২৫৮

তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইবরাহীম বলল, 'আমার রব তিনিই' যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।

🔶ঘটনার প্রেক্ষাপটঃ

কুরআনুল কারীমের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল- পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও তাদের জাতির ঘটনা বর্ণনা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও ক্ষমতা, কুরআনের মু'জিযাহ, ঐতিহাসিক সত্যতা, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা ও মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় দিক বর্ণনা করা। এখানে ইবরাহীম (আঃ) ও নমরূদের মাঝে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে।

ইবরাহীম (আঃ) পশ্চিম ইরাকের বাসরার নিকটবর্তী 'বাবেল'শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তখন কালেডীয় (كلداني) জাতি বসবাস করত। তাদের একচ্ছত্র সম্রাট ছিল নমরূদ। সে তৎকালীন পৃথিবীতে অত্যন্ত উদ্ধত ও অহংকারী সম্রাট ছিল।

প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে 'উপাস্য' হবার দাবী করে। (তারীখুল আম্বিয়া পৃ:৬৮) এ বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ইবরাহীম (আঃ) জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, পিতাকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করেছেন, মূর্তি ভেঙ্গেছেন। শেষ পর্যায় এসে নমরূদ ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে এ বিতর্কে লিপ্ত হয়। নমরূদ ভেবেছিল ইবরাহীম তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে।

কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইবরাহীম (আঃ) বললেন: আমার রব তিনি যিনি জীবন-মৃত্যু দান করেন। তখন নমরূদ বলল: আমিও তো জীবন ও মৃত্যু দান করি। এ বলে সে দু'জন জীবন্ত লোক আনতে বলল। একজনকে মেরে ফেলল অন্যজনকে ছেড়ে দিল। আর বলল এই যে,

আমি যাকে ইচ্ছা জীবন ও মৃত্যু দেই। তারপর ইবরাহীম (আঃ) যখন সূর্যের উদয় ও অস্তের কথা বললেন, তখন সে কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

প্রমাণিত হলো যে, প্রকৃত রব হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। জাতির (সাধারণ) নেতারাই যেখানে পরাজয় মেনে নেয়নি সেখানে একচ্ছত্র সম্রাট কিভাবে পরাজয় মেনে নিতে পারে। তাই সে অহংকারে ফেটে ইবরাহীম (আঃ) কে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়, এমনকি নিক্ষেপও করা হয়। ইবরাহীম (আঃ)-এ অগ্নীপরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে সফলতা অর্জন করেন।

🔶আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও তাদের জাতির ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করছেন।
২. দাওয়াত কৌশল ও হিকমতের সাথে প্রদান করা উচিত।
৩. প্রত্যেক নাবী ও রাসূলের শত্রু ছিল, দীনের পথে থাকলে প্রত্যেক মু'মিনেরও থাকবে।
৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীদের সার্বিক সাহায্য করেন যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে করেছেন।
৫. জীবন-মৃত্যু, চন্দ্র-সূর্য সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

পর্ব ৬৪: হযরত আদম আঃ এর তওবা

🔶সূরা বাকারাহঃ আয়াত ৩৫-৩৯

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা কর্তৃক আদমকে সিজদাহ করার নির্দেশ দেয়ার পর আদমকে যে মর্যাদা দান করেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের জন্য জান্নাতকে বসবাসের স্থান করে দিলেন এবং সকল প্রকার ভোগ-সম্ভোগ দিলেন, তবে একটি গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

“হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছা খাও, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরা আ'রাফ ৭:১৯)

সে বৃক্ষের নাম কী বা সে বৃক্ষটি কী এ নিয়ে তাফসীরে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সঠিক কথা হল: তা জান্নাতের গাছগুলোর অন্যতম একটি গাছ। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

অতঃপর উভয়ে জান্নাতে বসবাসকালে শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা স্থায়ী হয়ে যাবে এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।”(সূরা আ'রাফ ৭:২০)

এমনকি শয়তান আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বলল, আমি তোমাদের কল্যাণকামী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল: আমি তো তোমাদের কল্যাণকারীদের একজন। এভাবে সে তাদের উভয়কে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল।”(সূরা আ'রাফ ৭:২১-২২)

এভাবে প্ররোচিত করে শয়তান জান্নাতের নেয়ামত থেকে তাদেরকে অপদস্থ ও অপমানিত করে বের করে দিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা উভয়কে সম্বোধন করে বললেন; "আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?"

আল্লাহ তা'আলা এরূপ অন্যত্র বলেন:

"তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন: 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?" (সূরা আ'রাফ ৭:২২)

তাদের এ অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ জারি করলেন:

"এবং আমি বললাম, নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্র"। আর পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্টকালের বসবাস ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে।"

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা আদমকে বললেন, আমি তোমাকে যে গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছি সে গাছের ফল খেতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল। সে বলল: হাওয়া আমাকে তা সুশোভিত করে দেখিয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: আমি তার শাস্তিস্বরূপ গর্ভধারণ বেদনা ও প্রসব বেদনা দিয়েছি। (দুররুল মানসুর, ১/১৩২, ফাতহুর কাদীর, ১১১, আল মাত্বালিব আল আলিয়া- কিতাবুল হায়েয। হাদীসটি মাওকুফ কিন্তু তার সনদ সহীহ)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আদমকে হিন্দুস্তানে পাঠানো হয়েছিল এবং হাওয়াকে জেদ্দায়। হাওয়া (আঃ)-কে আদম (আঃ) খুঁজতে খুঁজতে মুযদালিফায় একত্রিত হন। হাওয়া তাকে জড়িয়ে ধরল। এ জন্য মুযদালিফাকে মুযদালিফা বলা হয়।

🔶অতঃপর আদম ও হাওয়া তাদের অপরাধ বুঝতে পেরে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুশোচনা ও তাওবাহ করল। সে তাওবার বাক্যও আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে শিখে নিলেন।

"হে আমাদের প্রতিপালক**!** আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি**,** যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।**'(**সূরা আ'রাফ ৭**:**২৩**)**

কেউ এখানে একটি জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়ে বলেন যে, আদম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার আরশের ওপর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'লেখা দেখেন এবং মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওসীলা গ্রহণ করে দু'আ করেন; ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এটা ভিত্তিহীন বর্ণনা এবং কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী। এ ছাড়া এটা আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত তরীকারও বিপরীত। প্রত্যেক নাবী সব সময় সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছেন। অন্য কোন নাবী ও অলীর ওসীলা বা মাধ্যম ধরেননি। কাজেই নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-সহ সকল নাবীদের দু'আ করার নিয়ম এটাই ছিল যে, তাঁরা বিনা ওসীলা ও মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সরাসরি দু'আ করেছেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা উভয়ের তাওবাহ কবুল করে দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন। দুনিয়াতে আদম ও হাওয়াকে পাঠিয়ে বলে দিলেন- তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করবে তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং কোন দুশ্চিন্তাও নেই। অর্থাৎ পরকালে সকল প্রকার ভয় ও হতাশামুক্ত থাকবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।"(সূরা ত্বা-হা: ২০:১২৩)

যে ব্যক্তি আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করবে সে ব্যক্তি চারটি জিনিস থেকে মুক্ত থাকবে।

১. দুশ্চিন্তা, ২. ভয়-ভীতি, ৩. পথভ্রষ্টতা, ৪. দুর্ভাগ্য। (তাফসীরে সা'দী পৃঃ ২৭)

আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর বিষয়কে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা সকল আদম সন্তানকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন:

"হে বানী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে- যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম-হাওয়া) সে জান্নাত হতে বহিষ্কার করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।"(সূরা আ'রাফ ৭:২৭)

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলার নিকট আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের মর্যাদার কথা জানতে পারলাম।
২. আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হলে নেয়ামতের পরিবর্তে শাস্তি দেন।
৩. কোন বস্তুর নাম বা ধরণ কুরআনে উল্লেখ না হলে এবং হাদীসেও এর বিবরণ না আসলে তা নিয়ে অহেতুক আলোচনা করা শরীয়তসম্মত নয়।
৪. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, তার কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকা দরকার।
৫. কোন অপরাধ হয়ে গেলে তার ওপর অটল না থেকে বরং তা বর্জন করে অনুশোচিত হয়ে তাওবাহ করা ওয়াজিব।
৬. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত হিদায়াতের অনুসরণ করে চলবে সে দুশ্চিন্তা, ভয়-ভীতি, পথভ্রষ্টতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে।

পর্ব ৬৫: হযরত ঈসা আঃ এর হাওয়ারীদের গল্প

🔶সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ৫২-৫৪

যখন হযরত ঈসা (আঃ) তাদের একগুয়েমী ও বিবাদ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা হঠকারিতা হতে ফিরে আসবে না তখন তিনি বললেন, আল্লাহর উপর আমার আনুগত্য স্বীকারকারী কেউ আছে কি? আবার ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে, এমন কেউ আছে কি যে আল্লাহর সাথে আমার সাহায্যকারী হতে পারে? কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী যুক্তিযুক্ত। বাহ্যতঃ এটা জানা যাচ্ছে যে, তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে আহ্বানের কাজে কেউ আমার হাত শক্তকারী আছে কি?'

যেমন আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করার পূর্বে হজ্বের মৌসুমে বলেছিলেন, কুরাইশরা তো আমাকে আল্লাহর কালাম প্রচারের কার্যে বাধা দিচ্ছে, এমতাবস্থায় এ কার্যের জন্যে আমাকে জায়গা দিতে পারে এমন কেউ আছে কি?' মদীনাবাসী আনসারগণ এ সেবার কার্যে এগিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জায়গা দান করেন। তাঁরা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যও করেন এবং যখন তিনি তাদের নিকট গমন করেন তখন তারা পুরোপুরি তাঁর সহযোগিতা করেন এবং তাঁর প্রতি তুলনাবিহীন সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

দুনিয়ার সাথে মোকাবিলায় তারা নিজেদের বক্ষকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য ঢাল করেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিফাযতে, মঙ্গল কামনায় ও তার উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কাজে তাদের আপাদমস্তক নিমগ্ন থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ আহ্বানেও কতক বানী ইসরাঈল সাড়া দেয়, তার উপর ঈমান আনয়ন করে এবং তাকে পূর্ণভাবে সাহায্য করে।

আর তারা ঐ আলোকের অনুসরণ করে যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন, অর্থাৎ ইঞ্জীল।

এ লোকগুলো ধোপা ছিল এবং তাদের সাদা কাপড়ের কারণেই তাদেরকে হাওয়ারী' বলা হতো। কেউ কেউ বলেন যে, তারা শিকারী ছিল। তবে সঠিক কথা এই যে, সাহায্যকারীকে 'হাওয়ারী' বলা হয়।

যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ "আমার জন্যে স্বীয় বক্ষকে ঢাল করতে পারে এরূপ কেউ আছে কি?' এ শব্দ শুনামাত্রই যুবায়ের (রাঃ) প্রস্তুত হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বার একথাই বলেন, এবারেও হযরত যুবায়ের (রাঃ) অগ্রসর হন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক নবীরই 'হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে এবং আমার 'হাওয়ারী' হচ্ছে যুবায়ের (রাঃ)।

এ লোকগুলো তাদের প্রার্থনায় বলে, "হে আমাদের প্রভু! সাক্ষীগণের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ। হচ্ছে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের মধ্যে নাম লিখে নেয়া। এ তাফসীরের বর্ণনা সনদ হিসেবে খুবই উৎকৃষ্ট। অতঃপর বানী ইসরাঈলের ঐ অপবিত্র দলের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রাণের শত্রু ছিল। তারা তাকে হত্যা করার ও শূলে চড়াবার ইচ্ছে করেছিল।

সেই যুগের বাদশাহর কাছে তারা তাঁর দুর্নাম করতো। তারা বাদশাহকে বলতো, "এ লোকটি জনগণকে পথভ্রষ্ট করছে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছে, মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করছে। বরং তারা তাঁকে দুশ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, প্রতারক প্রভৃতি বলে অপবাদ দিয়েছিল এমনকি তাঁকে ব্যভিচারিণীর পুত্র বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি।

অবশেষে বাদশাহও তার জীবনের শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বলে, তাকে ধরে এনে ভীষণ শাস্তি প্রদান করতঃ ফাঁসি দিয়ে দাও।

অতঃপর তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সৈন্যগণ তাঁকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সে বাড়ী পরিবেষ্টন করে তার ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের হাত হতে বাঁচিয়ে নেন এবং তাঁকে ঐ ঘরের ছিদ্র দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন।

আর তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি লোককে তথায় নিক্ষেপ করেন, যে সে ঘরেই অবস্থান করছিল। ঐ লোকগুলো রাত্রির অন্ধকারে তাকেই হযরত ঈসা (আঃ) মনে করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে তারা কঠিন শাস্তি দেয় এবং তার মস্তকোপরি কাটার টুপি রেখে দিয়ে শূলে চড়িয়ে দেয়।

কুরআন ও হাদিসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ওই সময় তাঁর এক অনুসারীকে বা হাওয়ারীকে তাঁর মতো দেখতে করা হয়। ইহুদিরা সেই ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ.) মনে করে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। তবে, সেই হাওয়ারীর সুনির্দিষ্ট নাম সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে, সেই হাওয়ারী স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং অন্য

বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর এক শত্রুকে ঈসা (আ.)-এর মতো চেহারা দিয়েছিলেন। সকল বিষয় একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন।

এটাই ছিল তাদের সাথে মহান আল্লাহর কৌশল যে, তাদের ধারণায় তারা আল্লাহ তা'আলার নবী (আঃ)-কে ফাঁসি দিয়েছে, অথচ আল্লাহ পাক স্বীয় নবীকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ দুষ্কর্মের ফল তারা এই প্রাপ্ত হয়েছিল যে, চিরদিনের মত তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা মিথ্যা ও অন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। দুনিয়াতেও তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয় এবং পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

ওরই বর্ণনা এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা ষড়যন্ত্র করলে হবে কি? আল্লাহ তা'আলার কৌশলের কাছে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যাবে। তিনিই সবচেয়ে বড় কৌশলী।

পর্ব ৬৬: ইলিয়াস আঃ এর দুআ

🔶সূরা আনআমঃ আয়াত ৮৪-৮৬
🔶সূরা সফফাতঃ আয়াত ১২৩-১৩২

হযরত কাতাদা (রঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) বলেনঃ “বলা হয় যে, ইলিয়াস ছিল হযরত ইদরীস (আঃ)-এর নাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ইলিয়াসই ছিলেন ইদরীস (আঃ)। যহাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত হাকীল নবী (আঃ)-এর পরে তাঁকে বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈল ঐ সময় ‘বা'আল’ নামক মূর্তির পূজা করতো।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করতে নিষেধ করলেন। তাদের বাদশাহ তা কবুল করে নেয়। কিন্তু পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। অতঃপর তারা সবাই ভ্রান্ত পথেই রয়ে যায়। তাদের কেউই তার উপর ঈমান আনলো না। আল্লাহর নবী (আঃ) তাদের উপর বদ দুআ করেন।

ফলে তিন বছর ধরে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ তাকে। তখন তারা সবাই হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কাছে এসে বলেঃ “আপনি দুআ করুন! আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হলেই আমরা কসম করে বলছি যে, আমরা ঈমান আনয়ন করবো।” হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর দু'আর ফলে আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরীর উপরই অটল থেকে গেল।

তাদের এ আচরণ দেখে হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁকে যেন আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। হযরত ইয়াসা ইবনে উখতূব (আঃ) তাঁর নিকটই লালিত পালিত হয়েছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর এই দু'আর পর তাকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তিনি যেন অমুক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং সেখানে যে যানবাহন পাবেন তাতেই যেন আরোহণ করেন।

যথাস্থানে পৌঁছে তিনি নূরের একটি ঘোড়া দেখতে পান এবং তাতেই আরোহণ করেন। আল্লাহ তাকেও জ্যোতির্ময় করলেন এবং পাখা প্রদান করলেন। তিনি ফেরেশতাদের সাথে স্বীয় পাখার উপর ভর করে উড়তে লাগলেন। এই ভাবে একজন মানুষ আসমানী ও যমীনী

ফেরেশতায় পরিণত হয়ে গেলেন। (অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) আহলে কিতাব হতে এটা বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ)

মহান আল্লাহ বলেন যে, ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ "তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না যে, তাকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা কর?" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, بَعل অর্থ হলো 'রব' বা প্রতিপালক। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এটা ইয়ামনীদের ভাষা। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা ইযদ শানুআদের ভাষা। ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন:"আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা একটি মহিলার মূর্তির পূজা করতো। তার নাম ছিল বা'আল।

আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, ওটা একটা মূর্তি ছিল। শহরবাসীরা ওর পূজা করতো। ঐ শহরের নামও ছিল বাআলাক'। হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছে? অথচ আল্লাহ তো তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। একমাত্র তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।"

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্যে উপস্থিত করা হবে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।" তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আমি ইলিয়াস (আঃ)-এর জন্যে পরবর্তী লোকদের উত্তম প্রশংসা প্রচলিত রেখেছি যে, প্রত্যেক মুসলমান তার উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "এই ভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম।" এর তাফসীর পূর্বেই গত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।(তাফসীর ইবনে কাসীর)

পর্ব ৬৭: বদরের ময়দানে রহমতের বৃষ্টি

🔶সূরা আনফালঃ আয়াত ১১-১৪

স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তাস্বরূপ এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন, আর তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন।

🔶 হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেনঃ "উহুদের যুদ্ধের দিন আমারও তন্দ্রা এসেছিল এবং আমার হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল। আমি তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি জনগণকেও দেখছিলাম যে, তারা ঢাল মাথার উপর করে তন্দ্রায় ঢলে পড়ছে।" হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "বদরের দিন হযরত মিকদাদ (রাঃ) ছাড়া আর কারো কাছে সওয়ারী ছিল না। আমরা সবাই নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নীচে সকাল পর্যন্ত নামায পড়ছিলেন এবং আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করছিলেন।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যুদ্ধের দিন এই তন্দ্রা যেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল।

কিন্তু নামাযে এই তন্দ্রাই আবার শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তন্দ্রা মাথায় হয় এবং ঘুম অন্তরে হয়। আমি বলি উহুদের যুদ্ধে মুমিনদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। আর এ খবর তো খুবই সাধারণ ও প্রসিদ্ধ।

কিন্তু এখানে এই আয়াতে কারীমার সম্পর্ক রয়েছে বদরের ঘটনার সাথে। আর এ আয়াতটি এটা প্রমাণ করে যে, বদরের যুদ্ধেও মুমিনদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং কঠিন যুদ্ধের সময় এভাবে মুমিনদের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যেতো, যাতে তাদের অন্তর আল্লাহ তাআলার সাহায্যে প্রশান্ত ও নিরাপদ থাকে। আর মুমিনদের উপর এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা।

যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ "নিশ্চয়ই বর্তমান মুশকিলসমূহের সাথেই আসানী রয়েছে। এ জন্যেই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বদরের দিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে নির্মিত কুটিরে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর তন্দ্রা ছেয়ে যায়।

অতঃপর তিনি মুচকি হেসে তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে উঠেন এবং বলেনঃ “হে আবু বকর (রাঃ)! সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ দেখ, জিবরাঈল (আঃ) ধূলিমলিন বেশে রয়েছেন!” অতঃপর তিনি কুটির হতে বেরিয়ে আসলেন এবং পাঠ করলেনঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ অর্থাৎ “শত্রুদের পরাজয় ঘটেছে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করবে।” (৫৪:৪৫) ইরশাদ হচ্ছে- وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً অর্থাৎ “তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।”

আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদরে যেখানে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ করেছিলেন সেখানে মুশরিকরা বদর ময়দানের পানি দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমান ও পানির মাঝখানে তারা প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানরা দুর্বলতাপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। ঐ সময় শয়তান মুসলমানদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে দেয়।

সে তাদেরকে বলে- “তোমরা তো নিজেদেরকে বড়ই আল্লাহওয়ালা মনে করছো। আর তোমাদের মধ্যে স্বয়ং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান রয়েছেন। পানির উপর দখল তো মুশরিকদের রয়েছে। আর তোমরা পানি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রয়েছে যে, নাপাক অবস্থাতেই নামায আদায় করছো!”

তখন আল্লাহ তাআলা প্রচুর পানি বর্ষণ করলেন। মুসলমানরা পানি পান করলেন এবং পবিত্রতাও অর্জন করলেন। মহান আল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রণাও খাটো করে দিলেন। পানির কারণে মুসলমানদের দিকের বালু জমে শক্ত হয়ে গেল। ফলে জনগণের ও জীবজন্তুগুলোর চলাফেরার সুবিধা হলো।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) একদিকে পাঁচশ' ফেরেশতা নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুশরিক কুরায়েশরা যখন আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে তখন তারা বদর কূপের উপর এসে শিবির স্থাপন করে। আর মুসলমানরা পানি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। পিপাসায় তারা ছটফট করে। নামাযও তারা নাপাকী এবং হাদাসের অবস্থায় পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের খেয়াল চেপে বসে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাঠে পানি বইতে শুরু করে। মুসলমানেরা পানিতে পাত্র ভর্তি করে নেয় এবং জীবজন্তুগুলোকে পানি পান করায়। তাতে তারা গোসলও করে। এভাবে তারা পবিত্রতা লাভ করে। এর ফলে তাদের পা গুলো অটল ও স্থির থাকে।

(অনুরূপ বর্ণনা কাতাদা (রঃ) ও যহাক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে) মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্য ভাগে বালুকারাশি ছিল। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। কাজেই মুসলমানদের চলাফেরার সুবিধা হয়।(তাফসীর ইবনে কাসীর)

পর্ব ৬৮: আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস

🔶সূরা তওবাঃ আয়াত ৪০

যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেরেরা তাঁকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহায় ছিলেন; তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের কথা হেয় করেন। আর আল্লাহ্র কথাই সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় [১]।

[১] এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোনো মানুষের সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে সাহায্য করতে সক্ষম।

যেমন হিজরতের সময় করা হয়, যখন তার আপন গোত্র ও দেশবাসী তাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউ ছিলনা। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তার খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোনো মজবুত দুর্গ ছিল না। বরং তা এক গিরী গুহা, যার দ্বারপ্রান্তে পর্যন্ত পৌছেছিল তার শত্রুরা।

তখন গুহা সঙ্গী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তার বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিত।

শুধু যে নিজের তা নয়, বরং সফর সঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (অর্থাৎ তাঁর সাহায্য আমাদের সাথে রয়েছে।) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি গিরী গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমি কাফেরদের পদশব্দ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের কেউ যদি পা উচিয়ে দেখে তবে আমাদের দেখতে পাবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে দুজনের সাথে আল্লাহ তৃতীয়জন তাদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? [বুখারী ১৭৭], [তাছাড়া পুরো ঘটনাটির জন্য দেখুন, সীরাতে ইবন হিশাম]

পর্ব ৬৯: ফিরাউনের মৃতদেহ

🔶সূরা ইউনুসঃ আয়াত ৯০-৯২

এটা ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন বানী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌছে গিয়েছিল এবং ফিরআউন ও তার বাহিনী তাদের পিছনেই ছিল। উভয় দল এমন পর্যায়ে এসে পড়েছিল যে, তাদের মধ্যে প্রায় টক্কর লেগেই যাবে। মূসা (আঃ)-এর লোকেরা তাঁকে বারবার বলতে লাগলোঃ "এখন উপায় কি হবে?

ফিরআউনের দলবল থেকে আমরা কিরূপে বাঁচতে পারি? সম্মুখে নদী এবং পিছনে শত্রু!" মুসা (আঃ) বললেনঃ "আমাকে তো এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন নদীতে রাস্তা করে দেই। আমরা কখনো ধরা পড়বো না। আমার প্রতিপালকই আমার পরিচালক। যখন নৈরাশ্য শেষ সীমায় পৌছে গেল তখন মহান আল্লাহ নৈরাশ্যকে আশায় পরিবর্তিত করলেন। মূসা (আঃ)-কে তিনি হুকুম করলেনঃ "তোমার লাঠি দ্বারা নদীর পানিতে আঘাত কর।" মূসা (আঃ) তাই করলেন। তখন নদীর পানির প্রতিটি খণ্ড এক একটি উঁচু পাহাড়ের রূপ ধারণ করলো।

নদীতে বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। প্রত্যেক দলের জন্যে হয়ে গেল একটি করে রাস্তা। এভাবে বানী ইসরাঈল নদী পার হয়ে গেল। তাদের শেষ দলটিও যখন নদী পার হয়ে গেল, তখন ফিরআউনের লোক লশকর নদীর এপারে পৌছে গেছে।

ফিরআউনের এই সেনাবাহিনীতে শুধু এক লাখ কালো ঘোড়ার আরোহী ছিল। অন্যান্য রং এর অশ্বারোহী তো ছিলই। তার ভাগ্যে যা ঘটবার ছিল, তা ঘটে যাওয়ার সময় এসেই পড়েছিল।

মূসা (আঃ)-এর দুআ কবুল হয়ে গিয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ) একটি ঘোটকীর উপর সওয়ার ছিলেন। তিনি ফিরআউনের ঘোটকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করলেন। তাঁর ঘোটকীকে দেখে ফিরআউনের ঘোড়াটি চিহি চিহি শব্দ করে উঠলো। জিবরাঈল (আঃ) তাঁর ঘোটকীকে নদীতে নামিয়ে দিলেন এবং তা দেখে ঘোড়াটিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফিরআউন ওকে থামিয়ে রাখতে পারলো না। বাধ্য হয়ে তাকে নদীতে নামতেই হলো।

সে তখন তার বীরত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তার সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে বললোঃ "বানী ইসরাঈল আমাদের চেয়ে নদীর মধ্যে প্রবেশ করার বেশী হকদার নয়। সুতরাং তোমরা সবাই নদীতে প্রবেশ কর। রাস্তা তো বানানোই রয়েছে। তার এই উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শুনে তার সেনাবাহিনী নদীতে নেমে পড়লো।

মীকাঈল (আঃ) তাদের সবারই পিছনে ছিলেন এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরকে এভাবে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। সবাই যখন নদীর মধ্যে প্রবেশ করলো এবং বানী ইসরাঈল সব পার হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা নদীকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন।

এখন ফিরআউন এবং তার দলবলের কেউই বাঁচলো না। তরঙ্গ উঁচু নীচু হচ্ছিল এবং সেখানে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ফিরআউনের উপর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। ঐ সময় সে বলে উঠলোঃ "আমি এখন ঈমান আনছি।" কিন্তু বড়ই আফসোস যে, সে এমন সময় ঈমান আনলো, যখন ঈমান আনয়নে কোনই উপকার ছিল না।

আল্লাহ পাক বলেনঃ "সে যখন আমার আযাব আসতে দেখল, তখন বলে উঠলো- আমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং কুফর ও শিরক পরিহার করলাম। কিন্তু আমার শাস্তি দেখার পর ঈমান আনয়নে কোনই লাভ হয় না। আল্লাহ তা'আলার নীতি এটাই। কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।"

তাই ফিরআউনের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "তুমি এখন ঈমান আনছো? অথচ পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তুমি নাফরমানীই করছিলে এবং ফাসাদীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।" সে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছিল। সে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জনগণের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সুতরাং এখন তাকে মোটেই সাহায্য করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى -এ কথাটি স্বীয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বর্ণনা করেন। এটা ছিল ঐ গায়েবের কথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত যার খবর তিনি একমাত্র তাকেই দিয়েছিলেন।

এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ফিরআউন ঈমানের কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে তখনকার কথা জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেনঃ " হে আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমি নদীর কাদা নিয়ে ফিরআউনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এই ভয়ে যে, হয়তোবা আল্লাহর রহমত তাঁর গযবের উপর জয়লাভ করবে।"

(এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন) আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে। বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি যদি সেই সময় আমাকে দেখতেন, তবে দেখতে পেতেন যে, ঐ সময় আমি ফিরআউনের মুখের মধ্যে কাদা

ভরে দিচ্ছিলাম এই ভয়ে যে, আল্লাহর রহমত তাকে পেয়ে বসে, সুতরাং তিনি হয়তো তাকে ক্ষমা করে দেন।” (এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন)

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً অর্থাৎ “অতএব, আজ আমি তোমার মৃতদেহকে উদ্ধার করবো, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্যে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকো।” ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের কতকগুলো লোক ফিরআউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল।

তখন আল্লাহ তা'আলা দরিয়াকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ফিরআউনের পোশাক পরিহিত আত্মাহীন দেহকে যমীনের কোন টিলার উপর নিক্ষেপ করে, যাতে জনগণের কাছে ফিরআউনের মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ তারা যেন বুঝতে পারে যে, ওটা হচ্ছে ফিরআউনের আত্মাবিহীন দেহ।

পর্ব ৭০ নূহ আঃ এর নৌকা ১ম পর্ব

🔶সূরা হুদঃ আয়াত ৩৬-৩৯

আল্লাহ তাআ'লা খবর দিচ্ছেন যে, যখন নূহের (আঃ) কওম তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়নের জন্যে তাড়াহুড়া শুরু করলো তখন আল্লাহ তাআ'লা তাদের উপর বদ দুআ' করতে হযরত নূহের (আঃ) কাছে ওয়াহী করলেন।

তাই হযরত নূহ (আঃ) বললেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! কাফিরদের মধ্য হতে যমীনের উপর একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। হে আমার রব! আমি অপারগ হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে সাহায্য করুন।”

তখন আল্লাহ তাআ'লা হযরত নূহের (আঃ) কাছে ওয়াহী পাঠালেনঃ যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওম হতে আর কেউই ঈমান আনবে না, কাজেই তারা যা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করো না। আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর এবং আমার কাছে এই যালিমদের সম্পর্কে কোন কথা বলো না, তাদের সকলকেই ডুবিয়ে দেয়া হবে।

পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজনের মতে হযরত নূহকে (আঃ) নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন কাঠ কেটে তা শুকিয়ে নেন এবং ফেড়ে তক্তা তৈরি করেন। এতে একশ' বছর কেটে যায়। তারপর পূর্ণরূপে নৌকাটি নির্মাণে আরো এক শ' বছর অতিবাহিত হয়। একটি উক্তি এ- ও রয়েছে যে, নৌকাটি নির্মাণ করতে চল্লিশ বছর লেগেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রঃ) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নৌকাটি সেগুন কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত এবং প্রস্ত ছিল পঞ্চাশ হাত। ভিতর ও বাইরে আলকাতরা মাখানো হয়েছিল। নৌকাটি যাতে পানি ফেড়ে চলতে পারে তাতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হেয়ছিল। কাতাদা”র (রঃ) উক্তি এই যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল তিনশ' হাত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওর দৈর্ঘ্য ছিল বারো শ' হাত এবং প্রস্ত ছিল ছ'শ' হাত।

উক্তি এটাও আছে যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল দু'হাজার হাত এবং প্রস্ত ছিল একশ' হাত। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই রয়েছে।

নৌকাটির ভিতরের উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। তাতে তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেকটি তলা ছিল দশ হাত করে উঁচু। নীচের তলায় ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য জানোয়ার। মধ্য তলায় মানুষ

ছিল। আর উপরের তলায় ছিল পাখী। দরজা ছিল প্রশস্ত এবং উপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

হযরত নূহ (আঃ) নৌকাটি নির্মাণ কার্যে লেগে গেলেন। সুতরাং কাফিররা তাঁকে উপহাস করার একটা সূত্র খুঁজে পেলো। চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে তারা তাকে ঠাট্টা করতে থাকলো। কেননা, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করতো। আর তিনি যে তাদেরকে শাস্তির ভয়। দেখিয়েছিলেন তা তারা মোটেই বিশ্বাস করেনি।

তিনি তাদের বিদ্রূপের প্রতিবাদে শুধু এটুকুই বলেছিলেনঃ “আজ তোমরা আমাকে উপহাস করছে, কিন্তু জেনে রেখো যে, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছে তেমনই একদিন আমরাই তোমাদেরকে উপহাস করবো। সুতরাং তোমরা সত্বরই জানতে পারবে যে, কোন্ ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর অপমানজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং কার উপর চিরস্থায়ী শাস্তি এসে পড়ে যা কখনো দূর হবার নয়।”

পর্ব ৭১: নূহ আঃ এর নৌকা পর্ব ২

🔶সূরা হুদঃ আয়াত ৪০-৪৬
🔶সূরা কামারঃ আয়াত ১০-১২

যখন আল্লাহ তা'আলার আযাবের নির্দেশ চলে এল, সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ হতে পানি উৎগত হতে লাগল ওপর থেকেও মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল, এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা নূহ (عليه السلام)-কে বললেন যে, তিনি প্রত্যেক প্রাণী জোড়া তথা নর ও মাদী দু'টি করে তাঁর কিশতিতে যেন নিয়ে নেন যাতে বংশ বিস্তার করতে পারে এবং তাঁর পরিবারকেও তুলে নেন।

তবে তোমার পরিবারের মধ্যে যাদের ডুবে মরে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার পূর্ব নির্ধারিত তাকদীরে ছিল তাদেরকে তুলে নিয়ো না। অর্থাৎ তোমার পরিবারের যারা ঈমান আনেনি যেমন কিনআন, নূহ (عليه السلام)-এর স্ত্রী ওয়াইলা, এরা উভয়ে কাফির ছিল। তাদেরকে নৌকায় তোলা হয়নি। যেমন পরের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে। (وَمَنْ اٰمَنَ) অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও নৌকাতে তুলে নাও।

মূলত ঈমানদারদের সংখ্যা খুব কম ছিল। কেউ বলেছেন, কিশতিতে আরোহীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট (নারী পুরষ মিলে) ৮০ জন। কেউ বলেছেন, তার থেকেও কম। এদের মধ্যে নূহ (عليه السلام)-এর তিন পুত্র সাম, হাম ইয়াফেস ও তাদের স্ত্রীগণও ছিলেন। কারণ তারা মুসলিম ছিলেন। এদের মধ্যে কিনআনের স্ত্রীও ছিলেন, কিনআন ছিল কাফির কিন্তু স্ত্রী ছিলেন মুসলিম। (ইবনু কাসীর)

তখন নূহ (عليه السلام) তাঁর পুত্রকে ডেকে মুসলিম হয়ে নৌকায় আরোহণ করতে বললেন এবং কাফিরদের সাথে থেকে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সে অহংকারবশত নিষেধ অমান্য করল এবং বলল যে, পানি আসলে আমি পাহাড়ে উঠে যাব।

তার বিশ্বাস ছিল পানি পাহাড় সমান হবে না, পাহাড় সমান পানি কি আর হয়? এসব কথা-বার্তা চলাকালে একটি তরঙ্গ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল। আর সে নিমজ্জিত হয়ে গেল। যখন নূহ (عليه السلام)-এর সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা জমিকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর পানি চুষে নেয়ার জন্য এবং আকাশকে বললেন, সে যেন পানি বর্ষণ করা বন্ধ করে।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সাথে সাথে তারা তা বাস্তবায়ন করল এবং সমস্ত পানি জমিন মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দিল। এক পর্যায়ে নূহ (عليه السلام)-এর নৌকা জুদী পর্বতের ওপর এসে থামল। কেউ বলেছেন, এ জুদি পাহাড় ইরাকে মাওসেল নামক শহরের নিকটে অবস্থিত।

নূহ (عليه السلام) আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার ছেলের জন্য দু'আ করছিলেন এই ভেবে যে, তিনি মনে করেছিলেন সম্ভবত সে মুসলিম হয়ে যাবে। অথবা পুত্রের প্রতি পিতার যে মায়া ও ভালবাসা তা দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ তা'আলা! আমার পুত্র সে তো আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করলেন যে, না সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছিলেন দ্বীনের দিক দিয়ে। অর্থাৎ কোন অমুসলিম কোন মুসলিম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

(إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)

অর্থাৎ তার আমল ঠিক নেই। সে ঈমান আনেনি এবং সৎকর্ম করেনি। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে ঈমান ও সৎআমল না থাকলে কেউ নাবী পরিবারের হলেও নাজাত পাবে না। অথচ কিছু ভণ্ড ফকির ও পীরেরা বলে সঠিক ঈমান ও আমলের কোন প্রয়োজন নেই। শয়তান সব জায়গায় সিজদা করে অপবিত্র করে ফেলেছে, কোথাও সিজদা করার জায়াগা নেই।

(مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ)

এ কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে নাবী গায়েব জানেন না। কারণ তিনি গায়েব জানলে কাফির ছেলের জন্য আবেদন করতেন না। যাল ফলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজর পেশ করে ক্ষমা চাইলেন।

পর্ব ৭২: কুরআনে বর্ণিত বাহন

🔶সূরা নাহলঃ আয়াত ৫-৮

আল্লাহ তা'আলা যে সকল চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলো থেকে মানুষ বিভিন্ন উপকার লাভ করছে সে নেয়ামতের বিবরণ দিচ্ছেন। যেমন উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। সূরা আন'আমের ১৪৩ নং আয়াতে আট প্রকার জন্তুর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এসব জন্তু থেকে মানুষ বিভিন্ন উপকার নেয়; যেমন-১. লোম থেকে মোটা কাপড় তৈরি করে শীত নিবারক পোশাক বানায়। ২. গাভীর পেট থেকে স্বচ্ছ দুধ পাওয়া যায়, ৩. জবাই করে গোশত খাওয়া যায়, ৪. চামড়া দিয়ে জুতোসহ অনেক উপকার নেয়া হয়। ৫. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বোঝা বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়।

আগেকার দিনের প্রধান বাহন ছিল জন্তু, বিশেষ করে মরুর দেশে উট ছাড়া কোন বাহন ছিল না। সকল ধরণের বোঝা বহন ও সওয়ারী হিসেবে একমাত্র মাধ্যম ছিল এসব জন্তু। ৬. তাদের গোবর মানুষের জ্বালানী ও ক্ষেতের সার হিসেবে উপকারে আসে। ৭. গরু দিয়ে হাল চাষ করাসহ আরো অনেক উপকার চতুষ্পদ জন্তুতে আল্লাহ তা'আলা রেখে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে; তোমাদেরকে আমি পান করাই তাদের উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা হতে আহার কর, এবং তার পিঠে ও নৌযানে তোমাদেরকে আরোহন করানো হয়।" (সূরা মু'মিনুন ২৩:২১-২২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে তোমরা আরোহণ কর। যাতে তোমরা তাদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামত স্মরণ কর যখন তোমরা তার ওপর স্থির হয়ে বস; এবং বল পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করার। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।" (সূরা যুখরুফ ৪৩:১২-১৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।" (সূরা নাহল ১৬:৬৬)

হাদীসে এসেছে: রাসূলুল্লহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: একদা জনৈক ব্যক্তি তার একটি গরুকে পিঠে বোঝা বহন করিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গরু তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে: আমাকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের জন্য।

লোকটি বলল: সুবহানাল্লাহ, আশ্চর্যের বিষয়, গরু কথা বলছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন: এ কথা আমি, আবূ বকর ও উমার বিশ্বাস করি। (সহীহ বুখারী হা: ৫১৮৯, সহীহ মুসলিম হা: ২৪৪৮)

جَمَالٌ অর্থাৎ এসব জন্তু লালন পালন করা, এদের মালিক হওয়া মানুষের কাছে এক প্রকার সৌন্দর্য। تُرِيْحُوْنَ যখন সন্ধ্যায় চারণভূমি থেকে বাড়িতে নিয়ে এসো, تَسْرَحُوْنَ যখন সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার দয়া ও করুণা যে, তিনি এসব জন্তু মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। কোন বস্তুই অকল্যাণে সৃষ্টি করেননি এবং এগুলোকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন।

🔶 আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. চতুষ্পদ জন্তু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।
২. গরু চাষাবাদ ও গোশত খাওয়ার জন্য, বোঝা বহনের জন্য নয়।
৩. উট থেকে বোঝা বহন ও খাওয়া উভয় উপকার নেয়া যায়।
৪. এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

পর্ব ৭৩: মৌমাছি

🔶সূরা নাহলঃ আয়াত ৬৮-৬৯

এখানে وحي (ওয়াহী) শব্দটি শাব্দিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ওয়াহী শব্দটি শাব্দিক পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এখানে

الإلهام الغريزي للحيوان

বা প্রকৃতগত ইলহাম যা প্রাণীকে করা হয়। (মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন পৃ: ২৬)

অর্থাৎ এমন জ্ঞান-বুদ্ধি যা নিজ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রত্যেক জীবকে দেয়া হয়েছে। মৌমাছিদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটা বুঝিয়ে দিলেন যে, তারা যেন পাহাড়, গাছ এবং মানুষের বাড়ির ছাদে তাদের মৌচাক তৈরি করে নেয়। এ দুর্বল সৃষ্টজীবের ঘরটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়! ওটা কতই না মজবুত, কতই না সুন্দর ও কতই না কারুকার্যময়! এরা এমনভাবে চাক তৈরি করে যে, মাঝে কোথাও একটু ফাঁকা থাকে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিদেরকে আরো নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ফল, ফুল এবং ঘাসপাতা হতে রস আহরণ করে ও যেখানে ইচ্ছা সেখানেই গমনাগমন করে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় যেন সরাসরি নিজেদের মৌচাকে ফিরে আসে। উঁচু পাহাড়ের চূড়া হোক, মরু প্রান্তর হোক, বৃক্ষ হোক, লোকালয় হোক, জনশূন্য স্থান হোক ইত্যাদি যে স্থানেই হোক না কেন তারা পথ ভুলে না। যত দূরেই যাক না কেন, ফিরে আসার সময় পথ ভুল করে না। তারা ডানার মাধ্যমে মোম তৈরি করে এবং মুখ দ্বারা মধু জমা করে।

ذُلُلًا এর তাফসীর বশীভূত দ্বারাও করা হয়, এখানে সহজ অর্থ নেয়া হয়েছে অর্থাৎ মৌমাছিকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, তুমি তোমার রবের দেখানো পথে চলো, এটা তোমার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। তুমি যত দূরেই যাও পথ হারাবে না। বরং তোমার রব যে পথ দেখিয়েছেন সে জন্য তোমার কারণে দূরদূরান্ত থেকে ফিরে আসা সহজ।

(مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُه)

অর্থাৎ মধু সাদা, হলুদ ও লাল ইত্যাদি বিভিন্ন রঙ এর হয়ে থাকে ফল, ফুল ও মাটির রঙ এর ভিন্নতার কারণে। যেরূপ রঙের ফল বা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করবে মধু সে রঙ্গের মত হবে।

(فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ)

অর্থাৎ মধুতে বহু রোগের ঔষধ রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, সকল রোগের ঔষধ। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন: মধু অবশ্যই রোগের আরোগ্যদানকারী। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রাকৃতিক এক পানীয়। তবে বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য, সকল রোগের জন্য নয়। হাদীসে এসেছে নাবী মিষ্টি ও মধু পান করতেন। (সহীহ বুখারী হা: ৬৯৭২)

অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে আরোগ্য রয়েছে (১) শিংগা লাগানোতে, (২) মধুতে, (৩) আগুনের দ্বারা ছেঁকা দেয়াতে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দ্বারা ছেঁকা দেয়া হতে নিষেধ করছি। (সহীহ বুখারী হা: ৫৬৮৪)

হাদীসে একটি ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক পাতলা পায়খানার রোগীকে মধু খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু মধু খেয়ে তার রোগ আরো বেড়ে গেল। তিনি দ্বিতীয়বার মধু পান করতে বললেন যাতে রোগীর পুরাতন মল বেরিয়ে যায়। রোগীর বাড়ির লোকেরা ভাবল, রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার এক ভাই আবার নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এল। তখন তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা সত্য, তোমার ভায়ের পেট মিথ্যা। যাও, তাকে আবার মধু পান করাও। অতঃপর তৃতীয়বার মধু পান করালো ফলে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করল। (সহীহ বুখারী হা: ৫৬৮৪)

মৌমাছির আচরণ ও যোগাযোগের ওপর গবেষণার জন্য ১৯৭৩ সালে নোবেল পান ভন-ফ্রিচ। কোন নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পাওয়ার পর একটি মৌমাছি আবার মৌচাকে ফিরে যায় এবং মৌমাছি নৃত্য নামক আচরণের মাধ্যমে তার সহকর্মী মৌমাছিদেরকে সেখানে যাওয়ার সঠিক গতিপথ ও মানচিত্র বলে দেয়। অন্যান্য শ্রমিক মৌমাছিকে তথ্য দেয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের আচরণ আলোকচিত্র ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আগে মানুষ ভাবত কর্মী মৌমাছিরা পুরুষ এবং ঘরে ফিরে এসে তাদেরকে একটি রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়।

কিন্তু এটা সত্য নয়, কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা প্রমাণ করে শ্রমিক মৌমাছিরা স্ত্রী এবং তারা রাজা নয় বরং রাণী মৌমাছির কাছে জবাবদিহিতা করে। মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এ দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার মিল রয়েছে। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সেই হয় মৌমাছির শাসক।

আল্লাহ তা'আলা এসব বর্ণনা করার পর বলছেন: এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য। সুতরাং মানুষ যদি এ ছোট্ট প্রাণীকে নিয়ে চিন্তা করে তাহলে অনেক শিক্ষা অর্জন করতে পারবে।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মৌমাছি একটি ছোট্ট প্রাণী, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অনেক উপকার করে থাকেন।
২. মধুর অনেক উপকারিতা রয়েছে।
৩. তিনটি জিনিসের দ্বারা আরোগ্য লাভ করা যায়।
৪. মৌমাছির মধ্যে মানব জাতির অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

পর্ব ৭৪: আসমান ও জমিনের নূর

🔶সূরা নূরঃ আয়াত ৩৫

"আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর। তাঁর নূরের উপমা একটি তাকের মতই। তাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে। চিমনিটি উজ্বল তারকার মতই। প্রদীপটি বরকতময় যাইতূন গাছের তেল দ্বারা জ্বালানো হয়, যা পূর্ব দিকেরও নয় এবং পশ্চিম দিকেরও নয়। এর তেল যেন আলো বিকিরণ করে, যদিও তাতে আগুন স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন তাঁর নূরের দিকে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমাসমূহ উপস্থাপন করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"

আয়াতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আকামণ্ডলী ও জমিনের নূর বা আলো। এটি

الحسي والمعنوي

তথা ইন্দ্রিয়গত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে। আল্লাহ তা'আলা সত্বাগত নূর, তাঁর হিযাব নূর। তাঁর হিযাব যদি খুলে দেয়া হয় তাহলে সৃষ্টির যে পর্যন্ত তাঁর জ্যোতি যাবে ততদূর পুড়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম হা: ৭৯)

আল্লাহ তা'আলার কিতাব নূর, শরীয়ত নূর, মু'মিন বান্দাদের অন্তরের ঈমানও নূর।

যদি মু'মিনের অন্তরে এ নূর না থাকত তাহলে তাগুতের অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিত। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব আছে, যদি অস্তিত্ব না-ই থাকত তাহলে পৃথিবী ও আকাশে আলো থাকত না, আর পৃথিবী ও আকাশের কেউই সুপথপ্রাপ্ত হত না। মানুষ প্রদীপের আলো দ্বারা যেমন পথ চলাচল করে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার আলো দিয়ে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায় যা জান্নাতের দিকে চলে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও জমিনের আলো এ কথা সহীহ হাদীসের দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে সানায় পড়তেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

হে আল্লাহ তা'আলা! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। (সহীহ বুখারী হা: ৬৩১৭, সহীহ মুসলিম হা: ৭৬৯)

এরপর আল্লাহ তাঁর নূরের উপমা পেশ করেছেন, যে নূর হল মু'মিনের অন্তরে ঈমান ও কুরআনের নূর। আল্লাহ তা'আলার জ্যোতির উপমা হলন যেমন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে এবং তা রাখা আছে একটি কাঁচের আবরণের ভিতর। আর ওর মধ্যে এমন এক বরকতময় গাছের বিশেষ ধরনের তেল ভরা হয়েছে; যা বিনা দিয়াশলাই-এ নিজে নিজেই আলোকিত হওয়ার উপক্রম।

এভাবে সমস্ত আলো একটি তাকে জমা হয়েছে এবং তা আলোয় আলোময় হয়ে রয়েছে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত দলীল-প্রমাণের অবস্থা যা অতি স্পষ্ট এবং একটি অন্যের তুলনায় আরো উত্তম। যা আলোর ওপর আলো। যা প্রাচ্যের নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়। অর্থাৎ পূর্বের নয়, পশ্চিমেরও নয়। এর অর্থ হল ঐ বৃক্ষ এমন এক খোলা ময়দান ও বৃক্ষহীন প্রান্তরে বিদ্যমান যার ওপর সূর্যের আলো সব সময় পড়ে।

لنوره এখানে তাঁর নূর বলতে ইসলাম ও ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত পথে চলার সুযোগ করে দেন।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সমগ্র আকাশ-জমিন ও এদের মধ্যে যা কিছু আছে সকল কিছুর নূর বা জ্যোতি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।
২. আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব রয়েছে।
৩. যায়তুন বৃক্ষের ফযীলত সম্পর্কে জানা গেল।
৪. আল্লাহ তা'আলার নূরের একটি উপমা পাওয়া গেল।

পর্ব ৭৫: একজন জ্ঞানী ব্যক্তি

🔶সূরা লোকমানঃ আয়াত ১২

"আমি অবশ্যই লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেতো তা করে নিজের জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহতো অভাবমুক্ত, প্রশংসা।"

১২ নং আয়াতের তাফসীর:

এ আয়াতে লুকমান (عليه السلام) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে হিকমাত বা প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদাহ (رحمه الله) বলেন: লুকমান (عليه السلام)-কে প্রদত্ত হিকমত ছিল দীনের সঠিক বুঝ। তিনি নাবী ছিলেন না এবং তাঁর কাছে ওয়াহী করা হয়নি। ইবনু কাসীর (رحمه الله) বলেন: তাঁর হিকমতটা ছিল জ্ঞান, সঠিক বুঝ ও স্বপ্নের তাবীর। (ইবনু কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

একদা তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি এ জ্ঞান-বুদ্ধি কিভাবে অর্জন করলেন? তিনি উত্তরে বলেলেন: সদ্ব্যবহার করে, আমানত রক্ষা করে, বাজে কথা থেকে দূরে থেকে এবং নীরবতা অবলম্বন করে। তাঁর প্রজ্ঞা ও হিকমতপূর্ণ একটি ঘটনা সম্পর্কে এরকমও প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একজন দাস ছিলেন। একদা তাঁকে তাঁর মালিক বললেন: ছাগল জবেহ করে তার মধ্য হতে সর্বোৎকৃষ্ট দুই টুকরো গোশ্ত কেটে নিয়ে এস। সুতরাং তিনি জিভ ও হৃৎপিন্ড নিয়ে আসলেন। অন্য একদিন তাঁর মালিক তাঁকে ছাগল জবেহ করে তার মধ্য হতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু টুকরো গোশ্ত নিয়ে আসার আদেশ করলে তিনি পুনরায় জিভ ও হৃদপিন্ড নিয়ে আসলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বললেন: জিভ ও হৃদপিন্ড যদি ঠিক থাকে তাহলে তা সর্বোৎকৃষ্ট জীব। আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট জীব আর কিছু হতে পারে না। (ইবনু কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেহেতু হিকমত দান করেছেন সেজন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। কেননা যারা শুকরিয়া আদায় করে তারা মূলত তা নিজেদের কল্যাণের জন্যই করে। আর যদি কেউ অকৃতজ্ঞ হয় তাহলে অকৃতজ্ঞতার পরিণাম নিজের ওপরেই বর্তাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ)

“যে ব্যক্তি কুফরী করে, তারই ওপর পড়বে তার কুফরীর ফল। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে, তারা নিজেদেরই জন্য সুখের ঠিকানা করে নিচ্ছে।” (সূরা রুম ৩০:৪৪)

সুতরাং মানুষ যে কাজই করুক না কেন তার ভাল মন্দ ফলাফল নিজের ওপরই বর্তাবে। এতে আল্লাহ তা'আলার কোন লাভ বা ক্ষতি হবে না। কেননা আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। আর এটাও বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করা উচিত। লুকমান (عليه السلام) সম্পর্কে সালাফগণ দুটি মত প্রকাশ করেছেন, কেউ বলেছেন তিনি নাবী ছিলেন, আবার কেউ বলেছেন; তিনি শুধুমাত্র সৎ ব্যক্তি ছিলেন। অধিকাংশরাই দ্বিতীয় মত পোষণ করেছেন।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. লুকমান হাকীম ছিলেন একজন সৎ ব্যক্তি, তিনি নাবী ছিলেন না।
২. মানুষের কৃতকর্মের ফল তার নিজের ওপরই বর্তাবে। কেউ ভাল কাজ করলে তা তার আবার কেউ খারাপ কাজ করলে তাও তারই।
৩. আল্লাহ তা'আলা বান্দার সকল জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী।
৪. যারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে দেন।

পর্ব ৭৬: সুলাইমান আঃ এর রাজত্ব

🔶সূরা সাদঃ আয়াত ৩৫

"সুলাইমান বলল, 'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল।"

📍 ৩০-৪০ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী দাঊদ (আঃ)-এর সন্তান সুলাইমান (আঃ) ও তাঁকে প্রদত্ত মু'জিযাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ তা'আলা অভিমুখী। তাই সূরা নামলের ১৫-৪৪ নম্বর আয়াতের তাফসীরে দেখেছি তিনি এসব ক্ষমতা, জীব-জন্তুর ভাষা বুঝতে পারা ইত্যাদি নেয়ামত পেয়েও কোনরূপ গর্ব-অহঙ্কার করেননি বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার তাওফীক চেয়ে দু'আ করলেন যাতে তিনি সৎআমল করতে পারেন এবং তাকে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

صافناة বা صَافِنَاتٌ صافن -

এর মানে এমন অশ্বরাজি যা তিন পায়ে ভর করে দাঁড়ায়। جياد- جواد এর বহুবচন, অর্থ হল দ্রুতগামী অশ্বরাজি। অর্থাৎ সুলাইমান (আঃ)-এর সামনে জিহাদের জন্য পালিত উৎকৃষ্ট দ্রুতগামী অশ্বরাজি পরিদর্শনের জন্য পেশ করা হলো। بِالْعَشِيِّ যোহর বা আসর থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে বলা হয়, আমরা যাকে বিকাল বলে থাকি।

أَحْبَبْتُ (ভালবেসে ফেলেছি) এর অর্থ اثرت (প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছি) আর عن এখানে علي এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (এর দ্বিতীয় অর্থ হলো : আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে সম্পদ-প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি।) আর تَوَارَتْ এর স্ত্রী লিঙ্গ কর্তৃকারক হলো الشمس (সূর্য), যা আয়াতে পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু বাগধারায় তা অনুমেয়। সারমর্ম এই যে, অশ্বরাজি পরিদর্শন করতে গিয়ে সুলাইমান (আঃ) আসর সালাতের সময় অতিবাহিত করে ফেলেন অথবা তখন তিনি যে অযীফা পাঠ করতেন তা ছুটে যায়।

যার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং বলতে লাগলেন যে, আমি অশ্বরাজির মহব্বতে এমন মগ্ন হয়ে গেছি যে, সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং আমি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, সালাত বা অযীফা থেকে অমনোযোগী হয়ে থেকে গেলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি সমস্ত অশ্বরাজি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় কুরবানি করে দিয়েছিলেন। ইমাম শাওকানী ও ইবনু কাসীর (রহঃ)

এ তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অনেকে এ বর্ণনাকেও যুক্তিযুক্ত মনে করে না। তাই এসব থেকে বিরত থাকাই ভাল।

সিংহাসনের ওপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ প্রাপ্তির ঘটনা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ)

'সুলাইমান (আঃ)-কে আমি পরীক্ষা করেছিলাম।' এ পরীক্ষা কী ছিল, সিংহাসনে রাখা নিথর দেহটি কিসের ছিল? তা সিংহাসনে রাখার অর্থ কী? এসব বিবরণ কুরআন বা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান নেই। তবে কোন কোন মুফাসসির সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি ঘটনাকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন।

একবার সুলাইমান (আঃ) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, আজ রাতে আমি আমার (৯০ বা ১০০ জন) সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব যাতে প্রত্যেকের গর্ভে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করবে।

কিন্তু তিনি এ মনোভাব ব্যক্ত করে ইনশাআল্লাহ তা'আলা বলেননি। ফলে স্ত্রীদের মধ্যে কেবল একজন গর্ভবতী হলেন এবং তার গর্ভ থেকে একটি মৃত এবং অসম্পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ট হলো। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন : যদি সুলাইমান (আঃ) ইনশাআল্লাহু তা'আলা বলতেন তাহলে তার প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসতো। (সহীহ বুখারী হা. ৩৪২৪, সহীহ মুসলিম হা. ১৬৫৪)

ইনশাআল্লাহ তা'আলা না বলাই ছিল সুলাইমান (আঃ)-এর ফিতনা, আর সিংহাসনের ওপর নিক্ষিপ্ত দেহ হলো ঐ অসম্পূর্ণ বাচ্চা। তবে এ আয়াতের সাথে উক্ত হাদীসকে তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করা অনুমানভিত্তিক। হাদীসটি সহীহ বুখারীর, কিন্তু ইমাম বুখারী একবারও তা অত্র আয়াতের তাফসীরে নিয়ে আসেননি। অথচ জিহাদ, নাবীদের বর্ণনা, শপথসমূহ ইত্যাদি অধ্যায়ে বার বার নিয়ে এসেছেন। সুতরাং যদি উক্ত পরীক্ষা দ্বারা হাদীসে বর্ণিত ঘটনা উদ্দেশ্য হত তাহলে তিনি একবার হলেও নিয়ে আসতেন।

আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান (আঃ)-কে অনেক মু'জিযাহ তথা বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তন্মধ্যে বায়ু প্রবাহ, পক্ষীকুল ও জিন-শয়তানকে অনুগত করে দেয়া, পিপীলিকার ভাষা বুঝতে পারা ইত্যাদি সূরা সাবার ১২-১৪ নম্বর, নামলের ১৫-৪৪ নম্বর আয়াতে মোট পাঁচটি মু'জিযাহ উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত বাকী দুটি উল্লেখ করা হলঃ

আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন সাম্রাজ্য দান করেছিলেন যা পৃথিবীর আর কাউকে দান করেননি। যেমন ৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নাবীদের কোন দু'আ আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া হয় না।

সে হিসেবে সুলাইমান (আঃ)-এর এ দু'আটি আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই হয়েছিল। কেবল ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এ দু'আ করেননি বরং এর পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী বাস্তবায়ান করা এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

সহীহ হাদীসে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : একটি দুষ্ট জিন গতরাত্রে আমার ওপর বাড়াবাড়ি করেছিল সালাতে বাধা দেয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দান করেছিলেন তখন আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, মাসজিদের খুটির সাথে তাকে বেঁধে রাখি যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও। তখন আমার ভাই সুলাইমান যে দু'আ করেছিল সে কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি দু'আ করেছিলেন,

(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ)

"হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়।" (সহীহ বুখারী হা. ৪৮০৮, সহীহ মুসলিম হা. ৫৪১)

প্রাপ্ত অনুগ্রহরাজির হিসাব রাখা বা না রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্ব লাভের দু'আ কবুল করার পরে তার প্রতি বায়ু, জিন, পক্ষীকুল ও জীব-জন্তুকে অনুগত করে দেন। অতঃপর বলেন : 'এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব তুমি (তা থেকে) কাউকে দান কর কিংবা নিজের জন্য রেখে দাও, তজ্জন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।'

বস্তুত এটি ছিল সুলাইমান (আঃ)-এর আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত একপ্রকার সনদ। পৃথিবীর কোন ব্যক্তির জন্য সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ধরনের সত্যায়নপত্র নাযিল হয়েছে বলে জানা যায় না। অথচ এ মহান নাবী সম্পর্কে ইসলামের শত্রু ইয়াহূদ-খ্রিস্টানরা বাজে কথা রটনা করে থাকে।

পর্ব ৭৭: পর্বতমালার তসবিহ পাঠ

🔶সূরা আম্বিয়াঃ ৭৯

"অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমি পর্বতমালা ও পাখীদেরকে দাঊদের অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা দাঊদের সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করত। আর এসবকিছু আমিই করছিলাম।"

📍৭৮-৮২ নং আয়াতের তাফসীর:

আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা দাঊদ ও তাঁর ছেলে সুলাইমান (عليه السلام) সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে এসেছেন। বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী পিতা ও পুত্র তথা দাঊদ (عليه السلام) ও সুলাইমান (عليه السلام)। আল্লাহ তা'আলা উভয়কেই নবুওয়াত ও মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করার প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। বর্তমান ফিলিস্তীনসহ সমগ্র ইরাক ও শাম (সিরিয়া) এলাকায় তাঁদের রাজত্ব ছিল।

পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ছিলেন সর্বদা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ। দাঊদ (عليه السلام) হলেন আল্লাহ তা'আলার সে বান্দা যাকে খুশী হয়ে পিতা আদম (عليه السلام) স্বীয় বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে তাকে দান করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করেছিলেন এবং সেমতে দাঊদের বয়স ৬০ হতে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায়। (তিরমিযী, মিশকাত হা: ১১৮, হাসান সহীহ) তবে বিভিন্ন ঘটনার আলোকে জানা যায় দাঊদ (عليه السلام) থেকে সুলাইমান (عليه السلام)-এর বিচার ফায়সালার হেকমত বেশি ছিল। যেমন

📍মেষপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচার:

ঘটনাক্রমে তারা উভয়ে একটি শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে ফায়সালা করলেন। এ ফায়সালা ওয়াহীভিত্তিক ছিল। তবে সুলাইমান (عليه السلام)-এর কাছে এ ফায়সালার যে ওয়াহী নাযিল করা হয়ে ছিল তা দাঊদ (عليه السلام)-এর ওপর অবতীর্ণ ওয়াহীকে রহিত করে দিয়েছিল। কেউ বলেছেন, তা ওয়াহীভিত্তিক ছিল না বরং ইজতিহাদভিত্তিক ছিল। দাঊদ (عليه السلام) ইজতিহাদে সঠিক করতে পারেননি, তবে তাকে তিরস্কার করা হয়নি, সুলাইমান (عليه السلام) ইজতিহাদে সঠিক করেছিলেন এজন্য তার প্রশংসা করা হয়েছে।

ইমাম বাগাভী ইবনু আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক দাঊদ (عليه السلام)-এর নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল মেষপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্যক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক মেষপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার মেষপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। দাঊদ (عليه السلام) একজন নাবী হওয়ার সাথে সাথে একজন বাদশাহও ছিলেন।

তিনি ফায়সালা দিলেন, ক্ষেতের মালিক মেষগুলো নিয়ে যাবে যাতে তার ক্ষতিপূরণ হয়। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও মেষের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে তিনি এ ফায়সালা দিয়েছেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ (عليه السلام)-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলাইমান (عليه السلام)ঃ এর সাথে দেখা হয়। তিনি মোকাদ্দামার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল।

সুলাইমান (عليه السلام) এ ফায়সালার সাথে একমত হলেন না। তিনি পিতার কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, মেষের পাল ক্ষেতের মালিককে কিছু দিনের জন্য দিয়ে দেয়া হোক, সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হবে এবং ক্ষেত মেষের মালিকের হাতে তুলে দেয়া হোক। সে ক্ষেতের পরিচর্যা করে ঠিক করুক। যখন ক্ষেত পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে তখন ক্ষেতের মালিক মেষগুলো ফেরত দিবে আর মেষের মালিক ক্ষেত দিয়ে দিবে। প্রথম ফায়সালা থেকে দ্বিতীয়টি উত্তম, এতে কারো ক্ষতি হবে না, বরং প্রত্যেকেই স্ব-স্ব জিনিস ফিরে পাবে।

দাঊদ (عليه السلام) উপযুক্ত বিচার না করতে পারায় তাঁকে তিরস্কার করা হয়নি বরং প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান' এখান থেকেই বলা হয় মুজতাহিদ ভুল করলেও পাকড়াও করা হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যখন বিচারক বিচার করতে গিয়ে ইজতিহাদ করে, যদি ইজতিহাদ সঠিক হয় তাহলে দুটি নেকী পাবে, আর যদি ভুল করে তাহলে একটি নেকী পাবে। (সহীহ বুখারী হা: ৭৩৬২, সহীহ মুসলিম হা: ১৭১৬)

আর তাদের বিচারকার্য আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে হচ্ছিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা সুলাইমানকে এ বিষয়ের ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং উভয়কেই প্রজ্ঞা দান করেছিলেন।

যেমন হাদীসে এসেছে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দুজন মহিলা ছিল যাদের সাথে তাদের দু'জন পুত্র ছিল। একজনের শিশুকে বাঘে ধরে নিয়ে যায়। তখন মহিলা দু'জনেই একে অপরকে বলে: বাঘে

তোমার শিশুকে ধরে নিয়ে গেছে এবং যেটা আছে সেটা আমার সন্তান। অবশেষে তারা দাঊদ (عليه السلام)-এর নিকট মুকাদ্দামা পেশ করে। তখন

তিনি ফায়সালা দেন যে, শিশুটি বড় স্ত্রী লোকটির প্রাপ্য। অতঃপর তারা দু'জন বেরিয়ে আসে এবং সুলাইমান (عليه السلام)-এর কাছে ঘটনাটি খুলে বলে। সুলাইমান (عليه السلام) তাদেরকে বললেন: ছুরি নিয়ে এসো, এই শিশুকে কেটে দু'টুকরা করব। তখন ছোট স্ত্রী লোকটি বলল: আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর রহম করুন। এটি তার সন্তান, একে কাটবেন না। অতঃপর তিনি এটিকে ছোট মহিলার জন্য ফায়সালা করে দেন। (সহীহ বুখারী হা: ৩৪২৭, সহীহ মুসলিম হা: ১৩৪৪)

سَخَّرْ অর্থ নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেয়া। অর্থাৎ দাঊদ (عليه السلام)-এর সাথে পাহাড়-পর্বত ও পক্ষীকুল আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করত, যখন তাসবীহ পাঠ করতে বলত তখনই করত।

দাঊদ **(عليه السلام)** একজন ইবাদতগুজার বান্দা ছিলেন। তিনি বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করতেন এবং একদিন অন্তর সিয়াম পালন করতেন। তাঁর কন্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল; ফলে পাখি, পাহাড়-পর্বত এমনকি সাগরের মাছ তাঁর সুর শুনতে চলে আসতো এবং আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করত।

(وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ) অর্থাৎ দাঊদ (عليه السلام)-কে নবুওয়াত দেয়া, বিচার-ফায়সালা বুঝিয়ে দেয়া, পাখি ও পাহাড়কে তার অনুগত করে দেয়া এবং অন্যান্য মু'জিযাহ আমিই দান করেছিলাম, সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

(صَنْعَةَ لَبُوْسٍ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (عليه السلام)-এর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলেন, ফলে তিনি তা দিয়ে যুদ্ধের বর্ম তৈরি করতে পারতেন। পৃথিবীর বুকে তিনিই সর্বপ্রথম এ কাজ করেন, তারপর থেকে এ শিক্ষা শুরু হয়। দাঊদ (عليه السلام) সম্পর্কে সূরা সাবার ১০-১১ নং আয়াত ও সূরা স্ব-দ-এর ১৭-১৯ নং আয়াতে আরো আলোচনা রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি দাঊদ (عليه السلام)-এর জন্য যেমন পাহাড়, পাখি ইত্যাদি অনুগত করে দিয়েছিলেন, তেমনি বাতাসকে সুলাইমান (عليه السلام)-এর অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পরিষদবর্গসহ সিংহাসনে বসতেন এবং যেখানে ইচ্ছা করতেন এক মাসের পথ কয়েক ঘন্টায় পৌঁছে যেতেন। বাতাস তাঁর সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যেত।

(الْأَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا)

কল্যাণের দেশ বলতে সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে।

জিন-শয়তানরাও সুলাইমান (عليه السلام)-এর অনুগত ছিল, তারা তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা তুলে আনত। অনুরূপভাবে অন্যান্য নির্মাণ কাজ করত, যেমন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা (জিনেরা) সুলাইমানের জন্য সেসব বস্তু নির্মাণ করত যা তিনি ইচ্ছা করতেন, যেমন বড় বড় অট্টালিকা, মূর্তি, চৌবাচ্চার ন্যায় বড় পাত্র এবং চুল্লির ওপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বড় ডেগসমূহ। হে দাউদের ক্বাওম! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে খুব অল্পই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা ৩৪:১৩)

অর্থাৎ জিনদের মধ্যে যে অবাধ্যতা ও ফাসাদী স্বভাব ছিল, তা থেকে আল্লাহ সুলাইমান (عليه السلام)-কে রক্ষা করেছিলেন। ফলে তাঁর সম্মুখে তাদের অবাধ্য হওয়ার উপায় ছিল না।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়**:**

১. দাউদ ও সুলাইমান (عليه السلام)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের বিবরণ জানলাম।
২. বিচারক কোন বিষয়ে ফায়সালা করতে গিয়ে সঠিকতায় পৌঁছার জন্য ইজতিহাদ করার পরেও ভুল করলে একটি নেকী পাবেন।
৩. জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে ছেলে বাবার চেয়েও বড় হতে পারে।
৪. দাউদ (عليه السلام) সর্বপ্রথম পৃথিবীতে বর্ম তৈরি করেন।

পর্ব ৭৮: নূরানী সৃষ্টি

🔶সূরা ফাতিরঃ আয়াত ১

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।"

নামকরণ: "فاطر" ফাত্বির শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা, তৈরিকারী ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম একটি নাম হল ফাত্বির। অর্থাৎ তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, সব কিছু করেছেন। অত্র সূরার প্রথম আয়াতে উল্লেখিত فاطر (ফাত্বির) শব্দ থেকেই এ নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

অত্র সূরায় কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে:

(১) ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সংবাদ বাহক,
(২) আল্লাহ তা'আলা কিছু দিতে চাইলে বা বারণ করতে চাইলে তার প্রতিরোধক কেউ নেই,
(৩) আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য, শয়তানের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা এবং সে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে,
(৪) মানব সৃষ্টির উপাদান ও ধারাক্রম,
(৫) আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী এবং সব সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী,
(৬) আখিরাতে কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না,
(৭) কেবল আলেম সমাজ আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করেন,
(৮) মানুষ তার কর্মের জন্য দায়ী, সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ভঙ্গ করতঃ তাঁর সাথে শিরক করবে, অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে এবং রাসূলের অবাধ্য হবে তাদের কর্মের পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে ইত্যাদি।

১ নং আয়াতের তাফসীর: সূরার শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাদেরকে কয়েক ডানাবিশিষ্ট করে তৈরি করেছেন। ফেরেশ্তাদের কারো দু'টি পাখা, কারো তিনটি পাখা আবার কারো চারটি পাখা রয়েছে। আবার কারো এর চেয়েও বেশি রয়েছে।

যেমন সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি'রাজের রাত্রিতে জিব্রীল (عليه السلام)-কে দেখলেন। তার ছিল ছয়শত ডানা। প্রত্যেক দু' ডানার মাঝে ব্যবধান ছিল পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের ব্যবধানের সমপরিমাণ।" (সহীহ বুখারী হা: ৩২৩২,

সহীহ মুসলিম হা: ১৭৪) আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়**:**

১. সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা অন্য কেউ নয়।
২. ফেরেশ্তাদের পাখা বা ডানা আছে এ কথা জানতে পারলাম।

পর্ব ৭৯: ইব্রাহিম আঃ এর মেহমান

🔶সূরা যারিয়াতঃ ২৪-৩৭

ইবরাহীম (আঃ) ও লূত (আঃ) সমকালীন নাবী। তারা উভয়ে চাচাতো বা খালাতো ভাই। লূত (আঃ)-এর জাতি পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম সমকামিতায় লিপ্ত হয়। তাদেরকে লূত (আঃ) বার বার বারণ করার পরেও যখন বিরত থাকল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করলেন।

এ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বাড়ি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ (১) ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর সন্তান ইসহাকের সুসংবাদ দেয়ার জন্য, (২) লূত (আঃ)-এর অবাধ্য সম্প্রদায়ের ওপর আযাবের কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য।

ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আঃ)-এর বাড়িতে মেহমানের বেশে আগমন করলেন। তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে সালাম দিলে ইবরাহীম (আঃ) সালামের জবাব দিয়ে বললেন- (قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ) অর্থাৎ- আপনাদেরকে অপরিচিত মনে হচ্ছে। ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেননি যে, তারা ফেরেশতা।

ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের আপ্যায়ন করার জন্য চুপিসারে স্ত্রীর কাছে গিয়ে ভূনা করা একটি গরুর বাছুর নিয়ে এসে খেতে বললেন। কিন্তু তারা খাচ্ছে না। এ অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তারা বললেন : আপনি ভয় করবেন না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“সে যখন দেখল তাদের হাত তার দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। তারা বলল : ‘ভয় কর না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।’ আর তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল এবং সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইস্হাকের ও ইস্হাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম। (সূরা হূদ ১১ :৭০-৭১)

তারপর তারা ইবরাহীম (আঃ)-কে ইসহাক (আঃ)-এর সুসংবাদ দিলেন। ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী অবাক, আমি বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা, কিভাবে আমার সন্তান হবে। তারা বললেন : তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন।

তারপর ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে বললেন, তাহলে আপনাদের আসার উদ্দেশ্য কী? তখন ফেরেশতাগণ আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো বললেন।

‘এবং সেখানে একটি পরিবার (লূত এর পরিবার) ব্যতীত কোন মুসলিম আমি পাইনি।’ এ ঘরটি ছিল লূত (আঃ)-এর। সেখানে তাঁর দু'কন্যা এবং তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারী কিছু লোক ছিল। বলা হয় এরা মোট তেরজন ছিল। এদের মধ্যে লূত-এর স্ত্রী শামিল ছিল না। বরং সে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। (আয়সারুত্ তাফাসীর- অত্র আয়াতের তাফসীর)

এসব কিছুর মাঝে রয়েছে তাদের জন্য নিদর্শন যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি পাওয়া গেল। কারণ একজন উম্মি ব্যক্তির জন্য ওয়াহীর মাধ্যম ছাড়া এসব ঘটনা জানা সম্ভব না।
২. ইবরাহীম (আঃ)-অতিথিপরায়ণ ছিলেন, এমনকি অপরিচিত লোকদের ক্ষেত্রেও মেজবানের যথার্থ পরিচয় দিতেন।
৩. আল্লাহ তা'আলা যাকে যখন ইচ্ছা সন্তান দান করতে পারেন।
৪. লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় সর্বপ্রথম সমকামিতার অপরাধে লিপ্ত হয়, যার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।
৫. অপরিচিত লোক মেহমান হলে তাকে সম্মানের সাথে মেহমানদারী করা উচিত।

পর্ব ৮০: ঠাট্টা বিদ্রুপ

🔶সূরা হুজুরাতঃ আয়াত ১১

"হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।"

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে আছে যে, গর্ব-অহংকার হলো সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। আল্লাহ তা'আলা এর কারণ এই বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশী মর্যাদাবান। পুরুষকে এটা হতে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকে এটা হতে নিষেধ করছেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা একে অপরের দোষ অন্বেষণ করা এবং একে অপরকে দোষারোপ করা হারাম বলে ঘোষণা করছেন। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ অর্থাৎ "দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।" (১০৪:১) هُمَز হয় কাজ দ্বারা এবং لَمَز হয় কথা দ্বারা। অন্য একটি আয়াতে আছেঃ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ অর্থাৎ "পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরকে লাগিয়ে বেড়ায়।" (৬৮:১১) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের নফসকে হত্যা করো না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) এবং হযরত মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ "তোমরা একে অপরকে বিদ্রুপ করো না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। অর্থাৎ তার এমন উপাধী বের করো না যা শুনতে সে অপছন্দ করে।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এই হুকুম বানু সালমা গোত্রের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তথাকার

প্রত্যেকটি লোকের দু'টি বা তিনটি করে নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেও যখন কোন একটি নাম ধরে ডাকতেন তখন লোকেরা বলতোঃ "হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! এ নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা বড়ই গর্হিত কাজ। সুতরাং যারা এই ধরনের কাজ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম।

পর্ব ৮১: আসমান থেকে অবতীর্ণ হওয়া ধাতব পদার্থ

🔶সূরা হাদীদঃ আয়াত ২৫

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদন্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।"

২৫ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

بِالْبَيِّنٰتِ (প্রমাণসমূহ) অর্থাৎ মুজিযাহ, দলীল-প্রমাণাদি ও ঐসব আলামত যা রাসূলের সত্যতার প্রমাণ বহন করে তা দিয়ে রাসূল প্রেরণ করছি।

وَالْمِيْزَانَ (তুলাদণ্ড) বলতে ন্যায়নীতি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা লোকদের মাঝে সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল দাড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লা অবতীর্ণ করার অর্থ হল মানুষের মাঝে সঠিক ওজন প্রতিষ্ঠা করা।

(وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : এখানে انزال অর্থ সৃষ্টি করা, তৈরি করা। যেমন সূরা আন'আমের ১৪৩ নম্বর আয়াতে انزال দ্বারা সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষাবিদগণ বলেন : খনিজ থেকে লোহা বের করেছেন, অতঃপর ওয়াহীর মাধ্যমে তা তৈরির জ্ঞান দান করেছেন। (ইবনু কাসীর)

হাদীদ শব্দটি কুরআনে ৬ জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। সূরা ইসরার ৫০ নম্বর, সূরা কাহফের ৯৬ নম্বর, সূরা হাজ্জের ২১ নম্বর, সূরা সাবার ১০ নম্বর, সূরা ক্বাফের ২২ নম্বর এবং সূরা হাদীদের অত্র আয়াত। প্রত্যেকটিতেই লোহার উপকরন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তবে সূরা ক্বাফের আয়াতে প্রত্যক্ষ করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

অত্র আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন : যাদের কাছে প্রমাণ পৌঁছার পরেও সত্য গ্রহণে অবাধ্য হবে এবং সত্যের বিরোধিতা করবে তাদের প্রতিরোধক হিসাবে লোহা

দিয়েছেন। এজন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত পাওয়ার পর তের বছর মক্কায় অবস্থান করে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে সত্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারপর হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন এবং কেউ ইসলামের বিরোধিতা করলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের বিধান দিয়েছেন।

(وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)

অর্থাৎ মানুষের জীবন-যাপনে এর অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন লোহা দ্বারা কৃষি কাজের উপকরণ তৈরি করা, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত দা, চাকু ইত্যাদি তৈরি করা। যুদ্ধ-জিহাদের অস্ত্র তৈরি হয় এ লোহা দ্বারাই। (ইবনু কাসীর)

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. আল্লাহ লোহা অবতীর্ণ করেছেন মানুষের নানাবিধ উপকারের জন্য।

পর্ব ৮২: সাহাবীদের উদারতা

🔶সূরা হাশরঃ আয়াত ৯

"আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"

৮-১০ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

ফাঈ ও গনীমতের মাল সে সকল দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সহযোগিতা করার জন্য নিজেদের বাড়ি-ঘর, সহায় সম্পদ ছেড়ে হিজরত করে চলে এসেছে।

মুহাজিরদের আল্লাহ তা'আলা যে মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু দিতেন তাতে তাঁরা হিংসা করত না, আর মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করত না।

অর্থাৎ নিজেদের সকল প্রয়োজনের ওপর মুহাজিরদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিত। এমনকি নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকলেও মুহাজিরদেরকে খাওয়াতেন।

হাদীসে একটা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একদা একজন আনসারী সাহাবী এক মুহাজিরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে জানালে স্ত্রী বললেন : ঘরে তো কেবল ছেলেদের খাওয়ার মত সামান্য কিছু আছে। পরে উভয়ে পরামর্শ করলেন যে, ছেলেদেরকে আজ (ভুলিয়ে-ভালিয়ে) ক্ষুধার্ত রেখেই ঘুম পাড়িয়ে দাও এবং আমরা নিজেরাও কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে যাব। তবে মেহমানকে খাওয়ানোর সময় (ছল করে) বাতিটা নিভিয়ে দেবে, যাতে সে আমাদের ব্যাপারে জানতে না পারে যে, আমরা তার সাথে খাচ্ছি না। সকালে যখন এ সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন : মহান আল্লাহ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। (সহীহ বুখারী, সূরা হাশরের তাফসীর)

তাদের ত্যাগের একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত এও যে, একজন আনসারী সাহাবীর নিকট দুজন স্ত্রী ছিল। তিনি তার মুহাজির ভাইকে প্রস্তাব দিলেন যে, আমি তোমার জন্য আমার একজন স্ত্রীকে ত্বালাক দেব। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর তুমি তাকে বিবাহ করে নেবে। (সহীহ বুখারী, বিবাহ অধ্যায়)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক, কারণ কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদেরকে নিজেদের রক্তপাত করতে এবং হারামকে হালাল করে নিতে প্ররোচিত করেছিল। (সহীহ মুসলিম হা. ৬৭৪১)

অর্থাৎ যারা আনসার ও মুহাজিরদের পরে আগমন করে তারা নিজেদের জন্য ও সকল মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটা হল মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য।

আয়িশাহ (রাঃ) বলেন : তোমাদেরকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমরা তাদেরকে গালি দিচ্ছো। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : এ জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না তাদেরকে যতক্ষণ না তাদের পরবর্তীগণ পূর্ববর্তী লোকদের অভিসম্পাত করবে। (মুসান্নফ ইবনু আবি শায়বাহ ১৫/১২৫, মুখতাসার তাফসীর বাগাভী ৬/৯৪৩)

এ আয়াত প্রমাণ করছে সাহাবীদেরকে ভালবাসা ওয়াজিব। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন; যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন সাহাবীর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে অথবা অন্তরে কোন প্রকার হিংসা রাখবে তার জন্য মুসলিমদের ফাঈ মালে কোন হক নেই, তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন (কুরতুবী)।

সুতরাং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে বিদায় নিয়েছে তাদের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করব, কখনো তাদের ভুল বা অন্যায়ের কারণে অশালীন মন্তব্য ও বিদ্বেষমূলক কোন কথা বলব না। তাদের ভাল-মন্দ সকল কর্মের হিসাব আল্লাহ তা'আলার কাছে।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. আনসার ও মুহাজিরদের ফযীলত অবগত হলাম।
২. একজন মু'মিন অন্য মু'মিনকে ভালবাসবে, কোন হিংসা বিদ্বেষ রাখবে না-এটাই ঈমানের দাবী।
৩. নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ফযীলত অবগত হলাম।
৪. কৃপণতা নিন্দনীয়।

৫. সাহাবীদের গালি দেওয়া কুফরী কাজ, তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও সম্মানের সাথে স্মরণ ঈমানী দাবী।
৬. মুসলিমদের ঈমানী ভ্রাতৃত্ব রক্তের সম্পর্কের চেয়ে সুদৃঢ়।

◆ **"**হে পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ**!** আমি তোমার প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অকৃত্রিমভাবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ভালোবাসি। তুমি ভালো করেই জানো**,** তাঁদের প্রতি আমার এ ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমারই নিমিত্তে। তাই কিয়ামতের সেই ভয়ংকর দিনে আমাকে তাঁদের যেকোনো একজনের সাথে হাশর নসিব করো। **"** - ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

পর্ব ৮৩: আল্লাহর উপর ভরসা করা

🔶সূরা তালাকঃ আয়াত ২-৩

"এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিপদ আপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন এবং এমনভাবে রিযিক দেবেন যে, সে বুঝতেও পারবে না তা কোথা থেকে এসেছে। ইবনু আব্বাস প্রমুখ বলেন : এটা ত্বালাকের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুযোগ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশানুপাতে ত্বালাক দেবে ইদ্দতের মাঝে ফিরিয়ে নেয়ার একটি সুযোগ আল্লাহ তা'আলা করে দেবেন। তিনি আরো বলেন : দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন (কুরতুবী)।

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট' ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে আরোহী ছিলেন।

তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেব। তুমি আল্লাহ তা'আলাকে হেফাযত কর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হেফাযত করবেন, তুমি আল্লাহ তা'আলাকে হেফাযত কর সর্বত্র আল্লাহ তা'আলাকে পাবে।

যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহ তা'আলার কাছেই চাইবে, যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ! সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত হয় তোমার কোন উপকার করার জন্য তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না তবে আল্লাহ তা'আলা যেটুকু তাকদীরে লিখে রেখেছেন।

আর যদি সবাই একত্রিত হয় তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যেটুকু ক্ষতি তাকদীরে লিখে রেখেছেন। (তিরমিযী হা. ২৫১৬, সহীহ)

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে চাওয়া, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য চাওয়া।

পর্ব ৮৪: মিথ্যা প্রভুর উপাসনা

🔶সূরা নূহঃ আয়াত ২৩-২৪

"আর তারা বলে, ‘তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও নাসরকে’।"

২১-২৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

নূহ (আঃ) এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে এমনিভাবে সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াতী কাজ করলেন এ আশায় যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী বিরতিহীন দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনল না। তখন নূহ (আঃ) আল্লাহ তা‘আলার কাছে অভিযোগ করে বললেন : হে আল্লাহ তা‘আলা! তারা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং এমন মা‘বূদের অনুসরণ করছে যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার করতে পারে না। আর তারা হককে প্রতিহত করার জন্য সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র করছে।

নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় জাতির লোকেরা তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করল।

নূহ (আঃ)-এর যুগের লোকেরা যে সকল ব্যক্তিদের পূজা করত তারা সকলে সৎ বান্দা ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : নূহ (আঃ)-এর জাতির মাঝে যে প্রতিমার পূজা চালু ছিল পরবর্তীতে আরবের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

(ود) ওয়াদ “দাওমাতুল জান্দাল” নামক জায়গায় কালব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, (سُوَاعً) সূওয়া হল হুযায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং (يَغُوْثَ) ইয়াগুছ ছিল মুরাদ গোত্রের, পরবর্তীতে তা গাতীফ গোত্রের হয়ে যায়।

এর আস্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটবর্তী “জাওফ” নামক স্থানে। (يَعُوْقَ) ইয়াউক ছিল হামাদান গোত্রের মূর্তি, (نَسْرًا) নাসর ছিল যুলকালা গোত্রের হিময়ার শাখার মূর্তি। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম নাসর ছিল। তারা মারা গেলে শয়তান তাদের জাতির লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে আলোচনা করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পূন্যবান লোকদের নামেই এদের নামকরণ কর। তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি

স্থাপনকারী লোকেরা মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেলে লোকজন তাদের পূজা করা শুরু করে দেয়। (সহীহ বুখারী হা. ৪৯২০)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : তাই সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, তাদের মর্যাদা থেকে বেশি সম্মান প্রদর্শন করা ও শরীয়ত গর্হিত কাজ মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। সেজন্য তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় আমল করা আবশ্যক।

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামাহ (রাঃ) হাবশায় গীর্জা দেখলেন, সেগুলোকে মারিয়া বলা হয়। সেখানে অনেক ছবি, প্রতিকৃতি ও মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসব কথা বললে, তিনি বলেন : ঐ সমাজে যখন কোন সৎ লোক মারা যেত, তারা সেই সৎ লোকের কবরের ওপর মাসজিদ বানাতো এবং তাতে তাদের প্রতিকৃতি বানিয়ে রাখতো। এসব লোকেরা হল সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্ট। এরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি হিসাবে গণ্য হবে। (সহীহ বুখারী হা. ৪২৭, ৩৮৭৩, সহীহ মুসলিম হা. ৫২৮)

অর্থাৎ নূহ (আঃ)-এর জাতির নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনেক লোকদেরকে প্রতিমা পূজার দিকে দাওয়াত দিয়ে পথভ্রষ্ট করেছে।

সৃষ্টির সূচনালগ্ন অর্থাৎ আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময় ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে নাবীদেরকে পাঠালেন...।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যকার দশ যুগ বা প্রজন্মের সকলেই সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তারা ধর্মীয় বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়। ফলে তাদেরকে সত্য ধর্মের ওপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীস্বরূপ প্রেরণ করেন (তাবারী ২/৩৩৪)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) যা বলেছেন তার সত্যতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি হাদীসেও প্রমাণিত। তিনি বলেন : আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী দশ যুগ বা প্রজন্ম পর্যন্ত সবাই ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। (তাবারী ২/৩৩৪) এ ছাড়াও অনেক প্রমাণ রয়েছে যা প্রমাণ করে-আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ের লোকেরা তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

📍 সর্বপ্রথম যে জাতি শির্কে লিপ্ত হয় :

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু জারীর বলেন : এরা পাঁচজন আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ের সৎ মানুষ ছিলেন। তাদের অনুসরণকারী অনেক মানুষ ছিল। তারা মৃত্যু বরণ করার পর তাদের অনুসারীরা বলল : আমরা যদি তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করি তাহলে তা দেখে আমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী হতে পারব।

এটা মনে করে তারা তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করল। এদের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় প্রজন্মের জনগণের নিকট শয়তান এসে বলল : তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ এদের উপাসনা করত ও এদের ওসীলায় তারা বৃষ্টি কামনা করতো। এভাবে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তারা তাদের উপাসনা করতে আরম্ভ করে। (তাবারী ১২/২৯/৬২, এগাছাতুল লাহফান ২/১৬১)

আরবে শির্কের অনুপ্রবেশ :

আরবে বসবাসকারী সাধারণ লোকজন ইসমাঈল (আঃ)-এর দাওয়াত ও প্রচারের ফলে ইবরাহীম (আঃ) প্রচারিত দীনের অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই তারা ছিলেন আল্লাহ তা'আলার একত্বে বিশ্বাসী এবং তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করত। কিন্তু কালপ্রবাহে ক্রমান্বয়ে তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং খালেস দীনি শিক্ষার কোন কোন অংশ ভুলে যেতে থাকে।

এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও দীনে ইবরাহীমের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে। বনু খুযাআহ গোত্রের সরদার আমর বিন লুহাইকে ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতি তার গভীর অনুরাগের কারণে লোকজন তাকে শ্রদ্ধা করত এবং তার কথা অনুসরণ করত। এক পর্যায়ে সে ব্যক্তি শাম দেশে ভ্রমণ করে

এবং সেখানে মূর্তি পূজা দেখতে পায়। শাম দেশে বহু নাবী-রাসূলগণ এসেছেন। সেই হিসাবে লুহাই মূর্তি পূজাকে অধিকতর ভাল ও সত্য বলে ধারণা করে। তাই দেশে ফিরে আসার সময় সে হুবাল নামক একটি মূর্তি সাথে নিয়ে আসে এবং খানায়ে কাবার মধ্যে তা রেখে দিয়ে পূজা করা শুরু করে।

সাথে সাথে মক্কাবাসীকেও পূজা করার জন্য আহ্বান করে। মক্কাবাসী তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মূর্তি হোবলের পূজা করতে থাকে। কাল বিলম্ব না করে হিজাযবাসীও মক্কাবাসীর অনুসরণ করে মূর্তি পূজা করতে লাগল। এভাবে একত্ববাদী আরববাসী মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়। (আর রাহীকুল মাখতূম)

অর্থাৎ নূহ (আঃ) তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ্দুআ করেছেন, যেমন মূসা (আঃ) করেছিলেন :

"মূসা বলল : 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ, হে আমাদের প্রতিপালক! যার করণে তারা মানুষকে তোমার পথ হতে ভ্রষ্ট করছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও, তারা তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।" (সূরা ইউনুস ১০ : ৮৮)

সুতরাং যুগে যুগে সৎ ব্যক্তিদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকেই মূলত শিরকের আস্তানা গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও দেখা যায় যত মাযার, খানকা ইত্যাদি রয়েছে তার অধিকাংশ সৎ লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে।

আর কিছু আছে ভন্ড শয়তান যারা কোনদিন নামায রোযার ধার ধারত না; অথচ তাদের অনুসারীরা তাদের মৃত্যুর পর কবরের ওপর মাযার গড়ে তোলে। আর কিছু মাযার রয়েছে মূলত সেখানে কোন মৃত ব্যক্তিই নেই, রাতারাতি মাযারের মত গড়ে তুলে ব্যবসা করছে। আমাদের সবাইকে এ সমস্ত ধোঁকা থেকে সাবধান থাকতে হবে।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. মূর্তি পূজার সূচনা জানলাম।
২. প্রকৃত জ্ঞান না থাকলে মানুষ সহজেই পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।
৩. যুগে যুগে যারাই সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে।
৪. নাবীরা মুসতাজাবুত দাওয়াহ বা দু'আ করলে কবুল হত এমন ব্যক্তি ছিলেন।

পর্ব ৮৫: আল্লাহর সৈনিক

🔶সূরা আলাকঃ আয়াত ৯-১৯

এ আয়াতগুলোতে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সালাতের আদেশ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন আবূ জাহল তাঁকে সালাত আদায় করতে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে সালাত পড়লে ও সিজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিরুদ্ধাচরণ ও দুশমনী করা হতে এবং তাঁকে সালাত আদায়ে বাধা দেয়া হতে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ ধরে টান দেব।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা আবূ জাহল বলেছিল, যদি মুহাম্মাদ কাবার নিকট সালাত পড়া হতে বিরত না হয় তাহলে তাকে পদদলিত করব এবং দস্তুরমত লাঞ্ছিত করব। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি বললেন: সে যদি তা করত, তাহলে ফেরেশতা তাকে ধরে ফেলত। (সহীহ বুখারী হা. ৪৯৫৮)

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানলাম।
২. রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আল্লাহ তা‘আলা সরাসরি সাহায্য করেছেন।
৩. যখন মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে তখনই সে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্য হয়।
৪. আবূ জাহলের ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের কথা ও তার শেষ পরিণাম জানলাম। প্রত্যেক যে ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের পরিণতি আবূ জাহলের মত হবে।
৫. এ সূরার শেষ আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করা মুস্তাহাব।

পর্ব ৮৬: যেদিন জমিন সাক্ষ্য দিবে

🔶সূরা যিলযালঃ আয়াত ১-৮

কিয়ামতের পূর্বে জমিনে কম্পণ সৃষ্টি হবে সে সম্পর্কে সূরাতে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার! যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। (সূরা হাজ্ব ২২: ১-২)

সেদিন জমিন তার মধ্যস্থ সবকিছু তথা তার মধ্যে যত মৃত মানুষ, খনিজ ও প্রোথিত সম্পদ আছে সব বের করে দেবে। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জমিন তার কলিজার টুকরোগুলোকে উগরে দেবে এবং বাইরে নিক্ষেপ করবে। স্বর্ণ-রৌপ্য স্তুপের আকারে বাইরে বেরিয়ে পড়বে। হত্যাকারী সে সব দেখে বলবে: হায়! আমি এ সম্পদের জন্য অমুককে হত্যা করেছি, অথচ আজ এগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, কেউ যেন এগুলোর দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারকারী দুঃখ করে বলবে হায়! এ সম্পদের মোহে পড়ে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করিনি। চোর বলবে: হায়! এ সম্পদের জন্য আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এগুলো তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা ওগুলো হতে কিছুই গ্রহণ করবে না। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী হা. ২২০৮)

জমিনের এ অবস্থা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলবে জমিনের কী হল! কারণ ইতোপূর্বে তারা এমন অবস্থা দেখেনি।

অর্থাৎ জমিন তার ওপর মানুষ যা কিছু করেছে সব বলে দেবে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন এবং বললেন: তোমরা কি জান, জমিনের খবর কী? সবাই বলল: আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: জমিনের সংবাদ হলো: প্রত্যেক নর-নারী জমিনের ওপর যা কিছু করেছে সব কিছু বলে দেবে। জমিন বলবে : অমুক অমুক কাজ অমুক দিন করেছে। এটাই হলো জমিনের সংবাদ। (তিরমিযী হা. ৩৩৫৩ সহীহ।)

(أَوْحٰي لَهَا) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মাটিকে কথা বলার শক্তি দেবেন।

সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে। জড় পদার্থের কথা বলা, শব্দ ধরে রাখা এবং প্রয়োজনে তা শুনিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আজ বিজ্ঞানও তা প্রমাণ করেছে।

"আর যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করেছিল, তারা তো জান্নাতে আনন্দে থাকবে। আর যারা কুফরী করে এবং অবিশ্বাস করে আমার আয়াতসমূহকে ও আখিরাতের সাক্ষাতকে, তাদেরকেই 'আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।" (সূরা রূম ৩০: ১৪-১৬)

"প্রত্যেক মানুষ যা ভাল করেছে এবং খারাপ করেছে কিয়ামতের দিন সবই উপস্থিত পাবে। সে কামনা করবে তার ও তার অন্যায় কাজের মধ্যে যদি অনেক দূরত্ব থাকত!" (সূরা আলি ইমরান ৩: ৩০)

মূলত এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই আমাদের ভাল কাজে উৎসাহী ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কিয়ামতের পূর্বে ভূমিকম্প হবে যার ফলে সকল মৃত মানুষ ও ধন সম্পদ বের হয়ে আসবে।
২. মানুষ যা কিছু করছে সব ব্যাপারে জমিন সাক্ষ্য দেবে।
৩. মানুষ তার কৃত বিন্দু পরিমাণ ভালমন্দ আমলও দেখতে পাবে।

পর্ব ৮৭: হক ও বাতিল

🔶সূরা কাফিরুনঃ ১-৬

কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বললোঃ "এক বছর আপনি আমাদের মাবুদ প্রতিমাগুলোর ইবাদত করুন, পরবর্তী বছর আমরাও এক আল্লাহর ইবাদত করবো।" তাদের এই প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী (সঃ) কে আদেশ করছেনঃ তুমি বলে দাওঃ হে কাফিরগণ! না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি, না তোমরা আমার মাবুদের উপাসনা কর। আর না আমি তোমাদের উপাস্যদেরকে উপাসনা করবো, তোমরা আমার মাবুদের উপাসনা করবে। অর্থাৎ আমি শুধু আমার মাবুদের পছন্দনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরই উপাসনা করবো, তোমাদের পদ্ধতি তো তোমরা নির্ধারণ করে নিয়েছো।

🔶আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কাফির-মুশরিকদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ সূরা সে শিক্ষাই প্রদান করে।

২. বাতিলের সাথে কখনও আপোষ করা যাবে না।

৩. 'ধর্ম যার যার, অনুষ্ঠান সবার' একটি শিরকি ও কুফরী মতবাদ।

পর্ব ৮৮: আল্লাহর পরিচয়

🔶সূরা ইখলাসঃ আয়াত ১-৪

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, ইয়াহুদিরা বলতঃ আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়ের (আঃ)-এর উপাসনা করি।" আর খৃস্টানরা বলতোঃ "আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) ঈসার (আঃ) পূজা করি।" মাজুসীরা বলতোঃ "আমরা চন্দ্র সূর্যের উপাসনা করি।" আবার মুশরিকরা বলতোঃ আমরা মূর্তি পূজা করি।" আল্লাহ তা'আলা তখন এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি বলোঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর মত আর কেউই নেই। তার কোন উপদেষ্টা অথবা উযীর নেই। তিনি একমাত্র ইলাহ্ বা মাবুদ হওয়ার যোগ্য। নিজের গুণ বিশিষ্ট ও হিকমত সমৃদ্ধ কাজের মধ্যে তিনি একক ও বে-নযীর। তিনি সামাদ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী। সমস্ত মাখলুক, সমগ্র বিশ্বজাহান তার মুখাপেক্ষী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সামাদ তাকেই বলে যিনি নিজের নেতৃত্বে, নিজের মর্যাদায়, বৈশিষ্ট্যে, নিজের বুযর্গীতে, শ্রেষ্ঠত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, হিকমতে, বুদ্ধিমত্তায় সবারই চেয়ে অগ্রগণ্য। এই সব গুণ, শুধুমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি পূত পবিত্র মহান সত্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবারই উপর বিজয়ী, তিনি বেনিয়ায। সামাদ এর একটা অর্থ এও করা হয়েছে যে, 'সামাদ' হলেন তিনি যিনি সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকেন। যিনি চিরন্তন ও চিরবিদ্যমান। যার লয় ও ক্ষয় নেই এবং যিনি সব কিছু হিফাযতকারী। যার সত্তা অবিনশ্বর এবং অক্ষয়।

হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন যে, صَمَد সেই সত্তা যিনি কোন কিছু আহারও করেন না। এবং যার মধ্য হতে কোন কিছু বেরও হয় না। আর যিনি কাউকেও বের করেন না। অর্থাৎ তিনি কাউকেও জন্ম দেন না। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।

তাঁর পিতা মাতা নেই। এ তাফসীর খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে উপরোক্ত বর্ণনা উল্লিখিত রয়েছে। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী' থেকে বর্ণিত আছে যে, সামাদ এমন জিনিষকে বলা হয় যা অন্তঃসার শূন্য নয়, যার পেট নেই। শাবী (রঃ) বলেন যে, সামাদ' এর অর্থ হলো যিনি পানাহার করেন না।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আদম সন্তান আমাকে অবিশ্বাস করে, অথচ এটা তার জন্যে সমীচীন নয়। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ এটাও তার জন্যে সমীচীন ও সঙ্গত নয়। তারা আমাকে অবিশ্বাস করে বলে যে, আমি নাকি প্রথমে তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছি পরে আবার সেভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবো না।

অথচ দ্বিতীয়বারের সৃষ্টির চেয়ে প্রথমবারের সৃষ্টি তো সহজ ছিল না। যদি আমি প্রথমবারের সৃষ্টিতে সক্ষম হয়ে থাকি তবে দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিতে সক্ষম হবো না কেন?” আর সে আমাকে গালি দিয়ে বলে যে, আমার নাকি সন্তান রয়েছে, অথচ আমি একাকী, আমি অদ্বিতীয়, আমি অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। আমার কোন সন্তান সন্ততি নেই। আমার পিতা মাতা নেই, এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই।”

রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম
আরবি:
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

যা কিছু উত্তম কল্যানকর সব একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আল্লাহ পাক ভুল ত্রুটি মাফ করুন। আল্লাহ পাক আমাকে আগে টিকে থাকার তৌফিক দিন। যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে মেনে চলার তৌফিক দিন। আল্লাহ সবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে কবুল করুন। আমিন। আস্তাওদিউল্লাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।